উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

দূরশিক্ষা অধিকার

স্নাতকোত্তর বাংলা

চতুর্থ সেমেস্টার

ঐচ্ছিকপত্র – ৪০৪

ছোটগল্প

পর্যায় – ক

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL

Postal Address:

The Registrar,

University of North Bengal,

Raja Rammohunpur,

P.O.-N.B.U., Dist-Darjeeling,

West Bengal, Pin-734013,

India.

Phone: (O) +91 0353-2776331/2699008

Fax: (0353) 2776313, 2699001

Email: regnbu@sancharnet.in ; regnbu@nbu.ac.in

Wesbsite: www.nbu.ac.in

First Published in 2019

All rights reserved. No Part of this book may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, without permission in writing from University of North Bengal. Any person who does any unauthorised act in relation to this book may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages.

This book is meant for educational and learning purpose. The authors of the book has/have taken all reasonable care to ensure that the contents of the book do not violate any existing copyright or other intellectual property rights of any person in any manner whatsoever. In the even the Authors has/ have been unable to track any source and if any copyright has been inadvertently infringed, please notify the publisher in writing for corrective action.

FOREWORD

The Self Learning Material (SLM) is written with the aim of providing simple and organized study content to all the learners. The SLMs are prepared on the framework of being mutually cohesive, internally consistent and structured as per the university's syllabi. It is a humble attempt to give glimpses of the various approaches and dimensions to the topic of study and to kindle the learner's interest to the subject

We have tried to put together information from various sources into this book that has been written in an engaging style with interesting and relevant examples. It introduces you to the insights of subject concepts and theories and presents them in a way that is easy to understand and comprehend.

We always believe in continuous improvement and would periodically update the content in the very interest of the learners. It may be added that despite enormous efforts and coordination, there is every possibility for some omission or inadequacy in few areas or topics, which would definitely be rectified in future.

We hope you enjoy learning from this book and the experience truly enrich your learning and help you to advance in your career and future endeavours

পর্যায়ভিত্তিক আলোচনা

পর্যায় – ক

একক ১ তিনসঙ্গী।

একক ২ ল্যাবরেটরি।

একক ৩ বাংলা ছোটগল্পে তারাশঙ্কর।

একক ৪ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত গল্প – জলসাঘর, তারিণী মাঝি, নারী ও নাগিনী, কালাপাহাড়।

একক ৫ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত গল্প – বেদেনী, ডাইনি, পৌষ লক্ষ্মী, অগ্রদানী ।

একক ৬ তারাশঙ্করের নির্বাচিত দুটি গল্প – পদ্মবউ, খাজাঞ্চিবাবু।

একক ৭ তারাশঙ্করের নির্বাচিত আরও তিনটি গল্প – ডাকহরকরার, ট্যারা, না।

পর্যায় – খ

একক ৮ কথা সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ।

একক ৯ নির্বাচিত গল্প – ফসিল, গোত্রান্তর, অযান্ত্রিক, পরশুরামের কুঠার, সুন্দরম।

একক ১০ নির্বাচিত গল্প - গরল অমিয় ভেল, কালাগুরু, বারবধূ, কাঞ্চনসংসর্গাৎ, মা হিংসী।

একক ১১ নরেন্দ্রনাথ মিত্র।

একক ১২ নরেন্দ্রনাথ মিত্রের রচনা পারদর্শিতা।

একক ১৩ নরেন্দ্রনাথ মিত্রের নির্বাচিত গল্প – চোর, রস, চড়াই-উৎরাই, অবতরণিকা।

একক ১৪ নরেন্দ্রনাথ মিত্রের নির্বাচিত গল্প – অভিনেত্রী, রানু যদি না হতো, হেডমাস্টার, হেডমাস্টার, পালঙ্ক।

ঐচ্ছিকপত্র – ৪০৪ ছোটগল্প

একক ১ তিনসঙ্গী - সাধারণ আলোচনা, শেষ পর্ব, রবিবার, শেষ কথা, প্রাকগাল্পিক কথনে নবীন মাধবের ব্রত পর্ব, ভোরের শুকতারা, অরণ্য প্রকৃতির মোহ

একক ২ ল্যাবরেটরি - শেষ পর্যায়ের কথা, নন্দকিশোরের গূঢ়ার্থ, মেট্রিয়ার্কি রেবতীর রক্তে, সোহিনী ও নীলা

একক ৩ বাংলা ছোটগল্পে তারাশঙ্কর - সাধারণ আলোচনা

একক ৪ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত গল্প – জলসাঘর, তারিণী মাঝি, নারী ও নাগিনী, কালাপাহাড় – জলসাঘরঃ নতুন ও পুরাতনের দ্বন্দ, তারিণী মাঝিঃ গল্পের জীবন জীবনের গল্প, নারী ও নাগিনীঃ বাসনার বিম্ম ত্রিভূজ, কালাপাহাড়।

একক ৫ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত গল্প – বেদেনী, ডাইনি, পৌষ লক্ষ্মী, অগ্রদানী- বেদেনীঃ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, কড়িমধ্যমের বিস্তারঃ ডাইনি, পৌষ লক্ষ্মীঃ ভিন্ন এক পাঠরীতি, অগ্রদানীঃ নিয়তির নির্মম অনিবার্যতা।

একক ৬ তারাশঙ্করের নির্বাচিত দুটি গল্প – পদ্মবউ, খাজাঞ্চিবাবু – পদ্মবউঃ পাঠকের দর্পণে, খাজাঞ্চিবাবুঃ হারিয়ে যাওয়া সময়ের মানুষ।

একক ৭ তারাশঙ্করের নির্বাচিত আরও তিনটি গল্প –

ডাকহরকরার, ট্যারা, না – ডাকহরকরারঃ একটি সমীক্ষা, ট্যারা,

নাঃ ক্ষমা সুন্দর প্রসন্নতা।

একক ১ তিনসঙ্গী

বিন্যাসক্রম

১.১ সাধারণ আলোচনা

১.২ শেষ পর্ব

১.৩ রবিবার

১.৪ শেষ কথা

১.৫ প্রাকগাল্পিক কথনে নবীন মাধবের ব্রত পর্ব

১.৬ ভোরের শুকতারা

১.৭ অরণ্য প্রকৃতির মোহ

১.৮ অনুশীলনী

১.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১.১ সাধারণ আলোচনা

রবীন্দ্র জীবনের অন্তিম লগ্নে প্রকাশিত সঙ্কলন ‘রবিবার’, ‘শেষকথা’, ‘ল্যাবরেটরি’এই তিনটি গল্প সংকলিত হয়েছে। সংকলনটির নাম ‘তিন-সঙ্গী’। রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে তার ‘তিনসঙ্গী’ গল্পসংকলনের সমালোচনার প্রসঙ্গে পরিমল গোস্বামী লিখেছেন— “আধুনিক বাংলা গল্পসাহিত্যের পটভূমি খুঁজতে গেলে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করা ছাড়া উপায় নেই।” এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে কবিদৃষ্টির পরিবর্তে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণদৃষ্টি, মুখ্য হয়ে উঠেছে। আলোচ্য গল্প সংকলনে রবীন্দ্রনাথ যে ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন, তা

আসলে কালপর্বের বিচারে বাংলা গল্পসাহিত্যে নবযুগের সূচনাকারী। রবীন্দ্র-অতিক্রমণের অব্যবহিত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বিশ শতকীয় বিনষ্টির ইতিহাসবৃন্তে বাংলা সাহিত্যে যে আধুনিক জীবন-যজ্ঞের যৌবনাগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের অন্তিম সৃষ্টিতেই তার পূর্ণতি সমর্পিত হল। রবীন্দ্রনাথের এই পর্বের গল্পে সমাজ সমস্যা, আদর্শ বৈষম্যমূলক মতবাদ, ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের অসামঞ্জস্য ও সংঘর্ষ যেন যুদ্ধোদ্যত সঙীনের ন্যায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। 'রবিবার' গল্পের অভীকের মধ্যে ভারসাম্যহীন জীবনযন্ত্রণার স্বেচ্ছাদগ্ধ উল্কামূর্তি, 'ল্যাবরেটরী'র সোহিনীর অভ্যন্তরে আত্মমথিত ব্যক্তিত্বের পরস্পরবিরোধী বৈপরীত্য আর 'শেষকথা' গল্পে সমন্বয়হীন ব্যক্তিবাসনার পরাভূত বিষন্ন করুণ সুর। রবীন্দ্রনাথের এই পর্যায়ের গল্পে আধুনিক মানুষ ব্যক্তিক মহিমাতেই অনাবৃত। 'রবিবার' গল্পে অভীকের ব্যক্তিকথা অনেক সময় রূঢ় ও বেদনাদায়ক,নিতান্ত বিষয়বস্তুর উপকরণের বিচারে অভীক অভিনব নয়, তার নাস্তিক্যের প্রসঙ্গ বিশ্লেষণে তার পরিবার ধর্মের কৌলিক আচার আচরণের বিস্তৃত বিবরণ অবান্তর দোষদুষ্ট হলেও সমাজ পরিবারের সমস্ত ঐতিহ্য বন্ধন থেকে স্বেচ্ছাবিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্বের বাহ্য, উগ্রতার মূলে যে সর্ব শূন্যতার বেদনা নিহিত—তা যথামূল্যে পরিস্ফুট হতো না যদি না গল্পকার তা যথাযথভাবে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করতেন। 'শেষকথা' গল্পের স্বপ্নবিষ্টতার সুরেও চরিত্র এবং ব্যক্তিত্বের পরিস্ফুটিন সংলক্ষ। আত্মখণ্ডিত আধুনিক মানুষের রূপ আলোচ্য গল্পে আছে—বিশেষভাবে যে মানুষ ঐতিহ্যবন্ধনহীন নিরূদ্বেগ, সেই মানুষের দুরনুভবনীয় রহস্য যন্ত্রণাবোধ বচনাতীত ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ যেন তার অস্তাচল গমনের অন্তিম রশ্মিতে সেই জিজ্ঞাসার স্বরূপ অনুসন্ধান করেছেন তারই গল্পে। সোহিনী চরিত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নাকি বলতেন—'সোহিনীকে সকলে হয়তো বুঝতে পারবে না, সে একেবারে এখনকার যুগের সাদায়-কালোয় মেশানো খাঁটি রিয়ালিজম্। অথচ তলায় তলায় অন্তঃসলিলার মত আইডিয়ালিজ হল সোহিনীর প্রকৃত স্বরূপ। এই আইডিয়ালিজম্ – এই বুঝি কবির চোখে ক্ষণ-উদ্ভাসিত হয়েছিল কল্লোল-চেতনার দিগন্তলীন সুদূর নীড়চ্ছায়া। আলোচ্য গল্পে 'ব্যক্তিত্বের তুঙ্গশিখরে একটি নারী এবং একটি পুরুষ উল্কার মতো জ্বলছে-সে জ্বালা আধুনিকতার উদ্ভ্রান্তিতে অগ্নিদগ্ধ। প্রথম

বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতাতে বিশ্বজোড়া যে শূন্যগর্ভতা সৃষ্টি হয়েছিল সেখানে চরিত্রনীতি, দাম্পত্য, গার্হস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ক, মূল্যচেতনার অন্তর্নিহিত পবিত্রতাবোধ সম্পূর্ণ তিরোহিত। সমাজ ঐতিহ্য, সংস্কার, ধর্মবুদ্ধির আরোপিত পুরাতন মূল্যবোধ যখন দিকে দিকে ভেঙে খান খান হয়ে গেল, তখন সর্বরিক্ত সর্ব-পরিচ্ছিন্ন বিশ শতকের এই উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিকতাকে বাঁধবে কোন দুর্মর সত্যের শক্তি—তারই সংকেত রইল নন্দকিশোর-সোহিনীর ব্রত সত্যসাধনের ঐক্যান্তিক সাধনায়। অন্ত্যিমকালের এই গল্পগুলি অনাগতকালে আশ্বাস সংকেত হয়েই এসেছে। তবে 'তিন সঙ্গী'র গল্পের অন্তর্নিহিত জীবনমূল্যবোধ যত অভিনব হোক না কেন সার্থক অভিব্যক্তির শিল্পরূপ এখানে ধরা পড়েছে কিনা তা বিতর্কিত। এই প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এর মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে—'পরামায়ুর শেষ বিন্দুতে সংলগ্ন লেখক যেন অতি দ্রুত বেগে আধুনিক যুগের বিশৃঙ্খলা ও মানস নৈরাজ্যের নাগাল ধরিতে চেষ্টা করিতেছেন। দীর্ঘ অনুশীলিত স্বভাব সুষমাকে ত্যাগ করিয়া অস্থির উৎকেন্দ্রিকতার অবলম্বনে সমকালীন যুগের ছন্দোহীন জীবনকে যেন তীক্ষ মননের সূচ্যগ্রে গাঁথিতে চাহিতেছেন'। কবি সম্ভবত জীবনের অন্তিম লগ্নে রুদ্ধশ্বাস অনিশ্চয়তার উপলব্ধি থেকে দ্রুত চলমান শৃঙ্খলাহীন জীবনকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। রবিবার' গল্পে অভীক ও বিভার প্রতিহত প্রণয় সম্পর্ক বিশ্লেষিত – অভীক কুলচারত্যাগী নাস্তিকতার প্রতীক আর বিভা ব্রাহ্মসমাজের আস্তিক্যবোধের প্রতি। অভীক বিভার প্রণয়ভিক্ষু কিন্তু বিভা ধর্মমতের পার্থক্যের জন্য প্রতি দানের বিমুখ। শেষকথা' গল্পের নায়ক যুগপ্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে বিজ্ঞানসাধনায় রত থাকলেও সৌন্দর্যলক্ষ্মীর প্রতি তার আর্কষণ অবৈজ্ঞানিক প্রেমিকের ন্যায় নিবিড় ও আবেগময়। 'ল্যাবরেটরী' গল্পে উৎকট চরিত্র স্বাতন্ত্র ও আচরণের অদ্ভুত খেয়ালচারিতার নিদর্শন যেন লক্ষ করা যায়। আধুনিক যুগের ব্যক্তিত্বের তীক্ষ-ধারালো রূপ। এবং পূর্বতন লৌকিক সংস্কার ও নীতিবোধকে হেলায় লঙঘন করার চিত্র আল্যেচ্য গল্পে রূপায়িত। রবীন্দ্রনাথের এই পর্বের সোহিনী যেন যুগের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে অসাধারণ বিচিত্র জীবনযাপনে রত। এই পর্বের গল্পগুলিতে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ দৃষ্টি, চরিত্র ও জীবনকল্পনার বৈচিত্র্য ও জটিলতার ফলে সামগ্রিক সংহতি অনেকক্ষেত্রে অনুপস্থিত বলে মনে হয়। সম্ভবত যুগগত গূঢ় জীবনযাত্রার

তাৎপর্য রূপায়ণের জন্যই ছোটগল্পের ভাবসুষমা ও আঙ্গিক পারিপাট্য ক্ষুন্ন হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের গল্পে মননশীলতার তীক্ষ্ণধার তরবারি যতখানি উজ্জ্বল, চরিত্র বিশ্লেষণের প্রস্তুতি ও শৃংখলা ঠিক ততখানি নেই বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। আসলে অন্তিম জীবনানুরাগের সূত্রে গল্পের শরীরে ব্যক্তি আত্মার দীর্ণ আর্তনাদ- এ যেন যুগলগ্নতারই প্রকাশ। আর এইখানেই রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতা। রবীন্দ্রনাথের সূচনা ও সমাপ্তি পর্বের গল্প সম্পর্কে ভূদেব চৌধুরী যথার্থই বলেছেন— 'রবীন্দ্রনাথের পল্লী জীবনানুভবের বৃন্তে প্রথম বাংলা ছাোটগল্পের জন্ম এবং মুক্তি – তার অন্তিমলগ্নের মননশীলতায় বৃন্তচ্যুত দিশাহারা আধুনিক জীবন শিল্পায়নে দ্বিতীয় পর্বের গল্প রচনার দুরদিগন্ত।'

১.২ শেষ পর্ব

তিনসঙ্গী সষ্টির প্রারম্ভে উদ্ভব হল স্বয়ম্ভূ পুরুষের। তিনি আঁখি মেললেন, দেখলেন চারিধার নীরব, নিস্তব্ধ। শূন্যতা মহাশূন্য সৃষ্টি করে। স্বয়ম্ভু পুরুষ নিজের অর্ধাংশ দিয়ে সৃষ্টি করলেন নারী, হলেন অর্ধনারীশ্বর। প্রকৃতি চঞ্চলা হলেন। বসন্ত জাগ্রত দ্বারে, সৃষ্টি চলল আপন গতিতে। কালজয়ী হল প্রেম।

একি শুধু পুরাণের কল্পনা? এরই মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে সৃষ্টির এক অনন্ত রহস্য। রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টির সেই রহস্যটিকে অনুধাবন করে বলেছেন যে, মানুষের spiritual life যতই উন্নত হচ্ছে, ততই worship of love বেশি করে গুরুত্ব পাচ্ছে। প্রেমের মহিমাময় বিকাশই তো চিন্ময় অনুভূতির গোড়ার কথা। যুগের কোন এক সময়ে মানুষ একথা একেবারেই যেন ভুলে গিয়েছিল। পুরুষ প্রাধান্য আগ্রাসী হয়ে মাতৃতন্ত্রের পৌরুষত্বের গ্লানিময় অধ্যায়টিকে ধ্বংস করার জন্যেই নারীকে উপভোগের সামগ্রী করে তুলল। ভুলে গেল যে এই নারীই একদিন যাযাবর পশুপালক পুরুষ সমাজকে স্থায়ী জনপদে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখিয়েছিল, কৃষির আবিষ্কার করেছিল। আগামী প্রজন্মের জন্ম ও পালনের দায়িত্ব নিয়ে সে নিজেকে গৃহাঙ্গণে অন্তরীণ করেছিল। বাইবেলে। নারী পাপরূপে বিবেচিত। প্রাচীন ইউরাোপে মনে করা হত যে নারীর আত্মা নেই, বোধ নেই, চিন্তা শক্তি নেই। পুরাণে নারীকে নরকের দ্বার বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কর্মবলে

বলীয়ান অসুরকুলের কর্মে বিঘ্ন ঘটাবার জন্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষী তাপসের তপস্যা ভঙ্গ করার জন্যে, পুরুষের সকল সাধনাকে পণ্ড করার জন্যে নারী শুধুই উর্বশী। তুলসী দাসের দোহায় আছে,

“দিনকা মোহিনী রাতকা বাঘিনী / পলক পলক লহু চোষে,

দুনিয়া সব বাউরা হোকে / ঘর ঘর বাঘিনী পোষে।”

নারীরূপী বাঘিনীকে বেঁধে রাখার জন্যে স্মৃতি বিধান দেয় যে, নারী বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর এবং বার্ধক্যে পুত্রের অধীন। নারীর কোন স্বাতন্ত্র নেই।

রবীন্দ্রনাথ এই অবিবেচনা প্রসূত ধর্মশাস্ত্রের বিধানকে কখনও মেনে নেননি। সবুজপত্র পর্ব হতেই নারীর বুদ্ধিমত্তা, বাকচাতুর্য, জীবন মহিমা, কর্ম ও চিন্তা শক্তির উপর সমগুরুত্ব আরোপ করেছেন। তার মতে নারী হল প্রেরণাশক্তি।

বাঁধানো সোজা রাস্তায় হাঁটা যত সহজ, অচেনা, অজানা পথহীন দেশে ততটাই শক্ত। নূতন পথে চলা, নূতন কিছু করা, নূতন ভাবনা চিন্তার জন্যে যে মহতী পরিশ্রম প্রয়োজন, নারী সেই পরিশ্রমের কাঠিন্যকে স্নিগ্ধতার মলয় বাতাসে, হৃদয়ের অমৃত সিঞ্চন করে মসৃণ করে দেয়। নারী তাই পুরুষের Inspiration.

রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা দৈবীমায়ার আবরণ ঘুচিয়ে অর্জুনকে বলেছে,

যদি পার্শ্বে রাখ / মোরে সঙ্কটের পথে, দুরূহ চিন্তার /যদি অংশ দাও / যদি অনুমতি করো /কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে / যদি সুখে-দুঃখে মোরে কর সহচরী / আমার পাইবে পরিচয়।

ল্যাবরেটরীর সোহিনী বলে,

“অনেক পুরুষকেই আমি ভুলিয়েছি, কিন্তু আমার উপরেও টেক্কা দিতে পারে এমন পুরুষ আজ দেখলুম। আমাকে তুমি ছেড়ো না বাবু, তাহলে তুমি ঠকবে।”

চিত্রাঙ্গদা ও সোহিনী এরা একই বৃন্তবাসিনী। পৌরাণিক মহিমার আবরণ ছিন্ন করে সোহিনীর কণ্ঠে যেন চিত্রাঙ্গদার আত্মঘাষণা। পুরুষের পিছনে নয়, পার্শ্ববর্তিনী হওয়ার

দৃঢ় প্রত্যয় এই আত্মঘঘাষণার মধ্যে বিরাজিত। ল্যাবরেটরীর সোহিনীও পিছনে থাকেনি, সে প্রাণপণে তার স্বামী নন্দকিশোরের ল্যাবরেটরী ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করেছে। 'কালান্তর'-এ নারী প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

"অতি দীর্ঘকাল মানব সভ্যতার ব্যবস্থাভার ছিল পুরুষের হাতে। মেয়েরা তার পিছনে প্রকাশহীন অন্তরাল থেকে কেবল করেছিল ঘরের কাজ। এই সভ্যতা হয়ে উঠেছিল একঝোঁকা। এই সভ্যতার মানবচিত্তের অনেকটা সম্পদের অভাব ঘটেছে, সেই সম্পদ মেয়েদের হৃদয়ভাণ্ডারে কৃপণের জিম্মায় আটকা পড়েছিল। আজ ভাণ্ডারের দ্বার খুলেছে। ঘরের মেয়েরা প্রতিদিন বিশ্বের মেয়ে হয়ে দেখা দিচ্ছে। এই উপলক্ষ্যে মানুষের সৃষ্টিশীল চিত্তে এই যে নূতন চিত্তের যোগ, সভ্যতায় আর একটি তেজ এনে দিল।"

নরনারীর প্রেম সম্পর্কের এ এক মহৎ উত্তরণ। নতুন সভ্যতায় এক আলোকোজ্জ্বল অধ্যায় সূচিত হবে সেদিন, যেদিন নারী পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে কাজের চাকাটা ঘুরিয়ে দেবার কাজে আত্মনিয়োগ করবে। তিনসঙ্গীর গল্প এই ঐক্য সাধনের মহান আদর্শে উন্নীত।

১.৩ রবিবার

(আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫শে আশ্বিন, ১৩৪৭)

তিনসঙ্গীর প্রথম গল্প 'রবিবার'। গল্পটির মধ্যে লেখকের অভিমানাশ্রয়ী চিত্তভাব অভীকের বিলাত যাত্রার মধ্যে প্রকাশরূপ পেয়েছে। শিল্পীর কাজ সৃজন করা, এই সৃজনকর্মে শিল্পীর খেয়ালীপনা বা সাহিত্যের ভাষার কবি স্বয়ং বলেছেন কবিতা কল্পনালতা', মুখ্য হয়ে ওঠে বলেই শিল্প নিত্য নূতন রূপে আবির্ভূত হয়। নূতন শিল্পরূপ বা তার আঙ্গিক সমকালীন যুগ প্রায়ই অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়। সমকালীন সমাজ শিল্পীর শিল্পকর্মকে সম্যকভাবে বুঝতে অক্ষম হয়ে হয় তার নিন্দা করে, কিম্বা নিজের ব্যর্থতার, অজ্ঞতার পরিচয়কে গোপন করার জন্যে অহেতুক প্রশংসা করে। এ এক ধরনের মিথ্যা ছলনা। নিন্দুকের নিন্দায় শিল্পী অভিমানে আহত বা ক্ষুব্ধ হতে পারেন,

কিন্তু মিথ্যার ছলনা তাকে ব্যথিত করে। রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতি সাগর পার হতে আসার পূর্বে, তাঁর রচনার নিন্দা করার সমালোচক এদেশে খুব একটা কম ছিল না। দীর্ঘকাল পরাধীনতার মধ্যে থেকে নূতন কিছু ভাববার, নূতন কিছু বোঝবার, শক্তি, জ্ঞান ও বুদ্ধি এদেশের লোক হারিয়ে ফেলেছিল। সাগরপারের সার্টিফিকেট না পাওয়া পর্যন্ত তাদের বিশ্বাসই হত না যে, এদেশের মানুষের মধ্যেও কেউ কেউ নূতন পথের সন্ধান দিতে পারে। গল্পের নায়ক অভীককে সেই স্বীকৃতির সার্টিফিকেট পেতেই বিলাত যেতে হয়েছে জাহাজের কয়লা দেওয়ার কুলী হয়ে।

রবিবার গল্পের প্রথমাংশে অভীক ও বিভার পূর্ব ইতিহাস বিকৃত হয়েছে। অভীক শিল্পী, ছবি আঁকা তার শখ। মোটরগাড়ি জোড়াতালি দেওয়া শিখেছিল আর এক উল্টা শখে। কিন্তু সেটাই হয়ে দাঁড়াল তার জীবন পাথেয়। বার্ণ কোম্পানির কারখানার মিস্ত্রি হতে হেড মিস্ত্রি পর্যন্ত হয়ে শেষে জাহাজের ইঞ্জিনে কয়লা দেওয়ার কাজ নিয়ে চলল ইউরোপে। উদ্ভট ধরনের নাস্তিক, আর এই নাস্তিকতার জন্যেই বাবার ত্যাজ্যপুত্র। তার জীবনের লক্ষ্য হল চিত্রশিল্পে প্রতিষ্ঠা অর্জন। শ্রদ্ধেয় প্রমথনাথ বিশী অভীককে বৈজ্ঞানিক বলেছেন, কিন্তু অভীক জীবন ধর্মে মেকানিক্স হলেও মননধর্মে বিশুদ্ধ শিল্পী। অভীকের শিল্পের প্রশংসা করার জন্যে তার এক উপাসিকা দল তৈরি হয়ে যেতেই বিভা সেই দল হতে দূরে চলে এসেছিল। বিভা জানত যে অসম্ভব ধরনের ন্যাকামির দ্বারা অভীক ক্রমশই পরিবেষ্ঠিত হচ্ছে। মেয়েরা অভীকের ইনসপিরেসন, কিন্তু যতক্ষণ না বিভার মুখে সে তার ছবির প্রশংসা শুনছে ততক্ষণ তার স্বস্তি নেই। অভীক চেষ্টা করেছে বিভার মনে ঈর্ষার উদ্রেক করতে। কিন্তু সেখানেও সে ব্যর্থ হয়েছে। বিভা ধর্ম বিশ্বাসী, অভীক নাস্তিক। বিভা পিতার উপর শ্রদ্ধাশীল ও রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন, অভীক পিতার ত্যাজ্যপুত্র ও নূতন পথের দিশারী। বিভার পথ সোজা সরল, অভীক ছায়াছন্ন অজানা পথের যাত্রী! বিভা বিশ্বাস করে যে, পুরুষের পৌরুষত্বের দীপ্তি সূর্যের মত তেজদৃপ্ত থাকে তখনই যখন সে আকর্ষণের কেন্দ্র হয়, কিন্তু সস্তা ভাবালুতায় নিজেকে মেয়েদের কাছে বিকিয়ে দেয় না। অভীক মনে করে মেয়েরা তার ইনসপিরেস। তাদের সৌন্দর্য তার সৌন্দর্য সৃষ্টির কল্পনার মূলে জল সিঞ্চন করে। বিভা

ও অভীক পরস্পর বিপরীত মেরুর হলেও, বিভার নারী হৃদয় অভীকের ছেলেমানুষি, দুঃসাহসী স্বপ্ন; বাঁধন ছেঁড়া কল্পনাকে ভালোবেসেছে, কিন্তু অভীকের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তার পার্শ্ববর্তিনী হতে পারেনি। যাকে ভালোবাসে, তার কাছে যেতে না পারাটাই বিভার বেদনা। আর অভীক জাহাজের কয়লা কুলী হয়ে ইউরোপে চলেছে তার প্রতিভার স্বীকৃতি দিয়ে সে বিভার হৃদয়কে জয় করবে। তার তপস্যা সার্থক হবে তখনই, যখন বিভার মত নারীর স্বীকৃতির দ্বারা কর্মপ্রচেষ্টা অভিষিক্ত হবে।রবিবার গল্পে পুরুষের সাধনার পরিচালনাকারী শক্তিরূপে বিভার অবস্থান রবীন্দ্র চিন্তার এক উল্লেখযাোগ্য দিক। অভীকের জীবনে বহুরীর সমাগম তার বহির্লোকের আনন্দোৎসব, কিন্তু অন্তর্লোকে একমাত্র বিভাই কেন্দ্রীয় শক্তি। বাহিরের যে ধর্ম উভয়ের মধ্যে লৌকিক ব্যবধান সৃজন করেছিল, প্রেমের পূজায় তারা দুজনে একদিন এক হবে। নাস্তিক অভীক হয়ে উঠবে প্রেমিক অভীক, এবং প্রেমের পূজাই হবে ঈশ্বরীপূজা। অভীকের পত্রে অভীক নিজের পরিচয় দিয়েছে নাস্তিক ভক্ত বলে। এটি একটি বিরোধাভাস। বাহ্য আচার আচরণে সে নাস্তিক, কিন্তু প্রেমের ধর্মে সে আক্তিক। আর এখানেই বিভা ও অভীকের মিলনক্ষেত্র।

এই গল্পে বস্তুসত্য ভাবসত্যের তলায় চাপা পড়েছে। ভাবনাই প্রাধান্য পেয়েছে এবং সেজন্যেই চরিত্রায়নও কাহিনী সব কিছুই মূল্যহীন। গ্রামের এক অভিনব আধুনিক রূপই এই গল্পের মূলবস্তু, যার প্রকাশ ঘটেছে গল্পের উপসংহারে অভীকের চিঠির মধ্যে।

১.৪ শেষ কথা

(শনিবারের চিঠিঃ ফাল্গুন ১৩৪৩)

‘শেষ কথা'র নবীন মাধব দীর্ঘ ছত্রিশ বছর পর্যন্ত নারীসঙ্গ বর্জন করে বিজ্ঞানের সাধনায় জীবন কাটিয়েছে। আমেরিকা হতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর বিবাহের জন্য মায়ের অনুরোধ উপেক্ষা করে ছোটনাগপুরে জিওলজিক্যাল সার্ভের কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। সে একজন বিজ্ঞানের কঠোর ব্রতধারীব্রহ্মচারী। এই অংশটি গল্পের প্রাক্

কথন।নবীনমাধবের কঠিন ব্রত পালনের এই প্রাক কথাটি বিবৃত হয়েছে তার ব্রতস্খলনের চিত্রটিকে সুস্পষ্ট করে ভোলার জন্যে।

গল্প আরম্ভ হয়েছে ছোটনাগপুরের অরণ্যে অচিরার আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে। বিজ্ঞানের ব্রত নিয়ে নবীন মাধব এবং প্রেমের সাধনা নিয়ে অচিরা সেই অরণ্যে পাঁচটি শালের চক্রব্যুহে প্রবেশ করেছ। অরণ্য মানুষের চিত্ত শক্তিকে দুর্বল করে, সুখতন্দ্রায় আবেশের পরিবেশ এনে দেয়, জৈবসত্তার আদিম প্রবণতাকে উদ্দীপ্ত করে। গল্পের এই পরিবেশ রচনায় শিল্পী হাতের দক্ষতা অবিস্মরণীয়। "পলাশ ফুলের রাঙা রঙ-এর মাতলামিতে বিভোর আকাশ, শাল গাছে মঞ্জুরী, মৌমাছি ঘুরে বেড়াচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে সাঁওতালেরা কুড়োচ্ছে মহুয়াফুল।" এমনই এক পরিবেশে ঘটে গেছে জ্ঞানতপস্বী নবীন মাধবের ব্রতস্খলন। পঞ্চবটীতে সীতাহরণ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছিল, আর পঞ্চশালের চক্রব্যুহে জ্ঞান হরণের, ব্রতস্খলনের পর্ব শুরু হল। অরণ্য পরিবেশ মাকড়সার জালের মত নবীনমাধবকে জড়িয়ে ফেলেছে। অচিরাও অনুভব করেছে 'অন্ধপ্রাণ শক্তির জান্তব রূপ। দুজনেই তারা সাময়িকভাবে ব্রতভ্রষ্ট। জ্ঞানের সাধনায় হায়ার স্টেজ ইস্পার্সোন্যাল, নারীর হৃদয়ের সম্পদও তেমনি ইপার্সোন্যাল। অচিরার মধ্যে যে ভালোবাসা রয়েছে তা ভবতোষকে কেন্দ্র করে নয়, ভবতোষকে ভালোবাসার ভালোবাসাকে কেন্দ্র করে। এ ভালোবাসা impersonal। শেষের দিকে রবীন্দ্র চিন্তার পরিবর্তনশীলতা এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি এর পূর্বে বহুবারই বলেছেন যে, নির্বিশেষের দিকে পুরুষের, বিশেষের দিকে মেয়েদের ঝোক। কিন্তু শেষ কথায় তিনি নারীত্বের সংজ্ঞায় এই সঙ্কীর্ণতা পরিহার করেছেন। কচ দেবযানী প্রসঙ্গ টেনে এনেও তিনি কবিতার মিথ ভেঙে ফেলেছেন। সতীত্ব এক নূতন দিগ বলয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

অধ্যাপক ও নবীন মাধব উভয়েই জ্ঞান তপস্বী। অরণ্যের মায়ালোক ছিন্ন করে উভয়ে গল্প শেষে ফিরে গেছে স্বক্ষেত্রে। কর্মের মধ্যেই পেয়েছে আনন্দময় মুক্তি। কিন্তু এই মুক্তির আনন্দকে ফিরিয়ে দিয়েছে অচিরা। সে পুরুষকে পঙ্গু করে, নিজের করে ধরে রাখেনি। অচিরা রবিবারে বিভার মতই হয়ে উঠেছে পুরুষের প্রাণশক্তির

পরিচালনাশক্তি। তার প্রেরণা দাত্রী। রবিবারের মতই 'শেষ কথা' ও এই একই অর্থে সতীত্বের অভিনব ব্যাখ্যায় অনেকটাই এগিয়ে গেছে।

১.৫ প্রাকগাল্পিক কথনে নবীন মাধবের ব্রত পর্ব

"আমার ছোটগল্পের সঙ্গে এই সব বড় বড় কথার একান্ত যোগ নেই—বাদ দিলে চলত, হয়তো ভালোই হত।" একথা বলেছেন গল্প কথক নবীন মাধব। গল্প লেখক রবীন্দ্রনাথের এটি এক অভিনব শিল্পকৌশল। যোগ আছে কি নেই তা তিনি পাঠকের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। গল্পপাঠেই বোঝা যায় যে এই গল্প নবীন মাধবের ব্রত স্খলনের গল্প। কিন্তু কি তার ব্রত, তার স্বরূপই বা কি এসব কথা জানা না থাকলে ব্রত স্খলনের তাৎপর্য ঠিক বোঝা যায় না। তাই গল্পের প্রারম্ভে প্রাক্ গাল্পিক ইতিহাসের ধারাকে অনুসরণ করতেই হয়।

নবীন মাধব নিজের পরিচয়ে নিজেকে একজন বিপ্লবী বলে পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু প্রথাগত বিপ্লববাদে ঘোরতর সংশয়ী হয়েই সে আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছে যন্ত্র বিদ্যায় পারদর্শী হবার জন্যে। প্রথাগত বিপ্লববাদ সম্পর্কে তার মতামত হল,

"আমরা যে প্রণালীতে বিপ্লবের পালা শুরু করেছিলুম, সে যেন আতসবাজিতে পটকা ছোঁড়ার মতো, তাতে নিজের পোড়া কপাল পুড়িয়েছি অনেকবার, দাগ পড়েনি ব্রিটিশ রাজরক্তে।" তার মতে এ বিপ্লবের অর্থই হল সমারোহ করে আত্মহত্যা। হাতের নখ দিয়ে আগ্নেয়াস্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলেনা। তাই সি. আই. ডি'র চোখকে ফাঁকি দিয়ে আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে আমেরিকায় এসে ডেট্রয়টে ফোর্ডের কারখানায় যন্ত্রবিদ্যা শিক্ষায় নিযুক্ত হল। কিন্তু বেশিদিন এই কাজে মন বসাতে পারল না। তার মনে হল যন্ত্রবিদ্যা শিক্ষার আরও গোড়ায় যাওয়া চাই?

"ঠিক করেছি আমার কাজ পটকা ছোঁড়া নয়। সিঁধ কাটতে যাব পাতালপুরীর পাথরের প্রাচীরে।"

সুতরাং খনিজ বিদ্যার শিক্ষা শুরু হল। হাতে-কলমে খনিজ বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শীতা লাভ করার পর বিদেশী ডিগ্রী নিয়ে গল্পকথক দেশে ফিরলেন এবং ছাোটনাগপুরের রাজার অধীনে জিওলজিক্যাল সার্ভেয়ার রূপে কর্মপ্রাপ্তি ঘটল।

বিপ্লবের জন্যে যন্ত্রবিদ্যা, যন্ত্রবিদ্যার জন্যে খনিজ বিদ্যা এবং ছোটনাগপুরে কর্ম প্রাপ্তির মধ্যে নবীন মাধবের বিপ্লবী মতবাদই প্রাধান্য পেয়েছে। এটাই তার ব্রত। এই ব্রত পালনের জন্যেই সে আজন্ম ব্রহ্মচারী অর্থাৎ নারী প্রভাবের ম্যাগনেটিজম মুক্ত। সন্ন্যাসী ও কর্মযোগীর ভূমিকায় তার মনের দ্বার রুদ্ধ ছিল বলেই, নারীরা কখনই তার ধারে কাছে আসতে পারেনি। এদেশে যদিও কিছু সামাজিক বাধা আছে, পাশ্চাত্যে তাও নেই। নবীন মাধবের সুন্দর দেহ সৌষ্ঠবে আকৃষ্ট হয়ে উভয়দেশেই তরুণীরা তার কাছে আসার চেষ্টা করেছে। কিন্তু নবীন মাধবের কঠোর ব্রত সাধন প্রক্রিয়ায় প্রতিহত হয়ে ফিরে গেছে। বিবাহ করার জন্য মাতৃ অনুরোধও কোন মূল্য পায়নি।

অথচ নবীন মাধব সব দিক হতেই above the average। আর বিদ্যাশক্তি, বুদ্ধি শক্তি, বাচনভঙ্গি এবং দেহ সৌষ্ঠব সব কিছুই অসাধারণ। এই অসাধারণত্ব প্রতিফলিত হয়েছে তার ব্রতচর্যায়।

"মেয়েদের নিয়ে রসের পালা শুরু করে তার পরে সময় বুঝে খেলা ভঙ্গ করাকেও ছিল আমার প্রকৃতি বিরুদ্ধ। আমি নিশ্চয় জানতুম, যে জিদ নিয়ে আমি আমার ব্রতের আশ্রয়ে বেঁচে আছি, এক পা ফসকালে সেই জিদ নিয়ে আমার ভাঙা ব্রতের তলায় পিষে মরতে হবে। আমার পক্ষে এর মাঝখানে কোন ফাঁকির পথ নেই।"

ছত্রিশ বছরের নবীন মাধব তার এই কঠোর ব্রতচর্যায় সিদ্ধকাম। ডক্টর সেনগুপ্ত নামে তাঁর রচিত গ্রন্থ দেশ-বিদেশের মনীষীদের পাঠ্য। প্রাগাল্পিক কথনে নবীনমাধবের এই কঠোর তপশ্চর্যার ইঙ্গিত প্রদান না করলে গল্প অবসরে তার ব্রত স্খলনের সম্যক ধারণা জন্মায় না। গল্প-অবয়বে তাই এই প্রাকথন বিশেষ অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। নারী প্রভাবের ম্যাগনেটিজম হতে যে নবীন মাধব শতহস্ত দূরে থেকেছে কেমন করে তার জীবনে নারীর প্রভাব তার কর্মের পরিচালন শক্তি হয়ে উঠল সেটাই গল্পের বিষয়।

১.৬ ভোরের শুকতারা

পাঁচটি শালগাছের ব্যুহের মধ্যে একটা ঢিবির উপর বসেছিল মেয়েটি। গাছের গুড়িতে হেলান দিয়ে পা দুটি বুকের কাছে গুটিয়ে এক মনে কি যেন লিখছে ডায়েরির খাতায়। এক মুহূর্তের বিস্ময়বক্ষতটে জোয়ারের ঢেউ, নবীন মাধব বুঝলেন তার আরণ্যক প্রবৃত্তির কথা-যা যুক্তি মানেনা, মোহ মানে। মেয়েটির তিনি নাম দিলেন অচিরা। কথা বলার সুযোগ নেই, অথচ নবীন মাধবের অবস্থা ঠিক যেন শকুন্তলা নাটকের দুষ্যন্তের মত। অন্তর্লোকের আলোড়নে তার বিজ্ঞানীর ভূমিকা যেন আচ্ছন্ন। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে অন্ধকারের তপ্ত বিগলিত জিনিস যেন উপরে উঠে আসছে।

ইতিমধ্যে অচিরা ভবতোষ সংবাদ নবীন মাধবের জানা হয়ে গিয়েছে। মেয়েটিকে তার লজ্জা ও অবসাদ হতে বাঁচাতে সে যেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাই প্রথম আলাপের কোন পথ না। পেয়ে নিজের বরকন্দাজ দিয়ে ডাকাতির অভিনয়। এর পরেই শুরু আলাপের মধ্য দিয়ে ঘনিষ্ঠতা। কিন্তু এই ঘনিষ্ঠতাকে অচিরাই ভেঙে দিতে চেয়েছে। প্রথমকথা শেষ কথায়। পরিণত হয়েছে। তলিকা নদীর ধারে চড়িভাতির দিনে কথা প্রসঙ্গে সে শুনিয়েছে।

“ভালোবাসার সফলতা আপনার মতো সাধকের কামনার জিনিস নয়।
মেয়েদের জীবনের চরম লক্ষ্য ব্যক্তিগত, আপনাদের নৈর্ব্যক্তিক।”

নবীন মাধবের মোহের জাল হতে বেরিয়ে আসার আপ্রাণ চেষ্টা অচিরার। কিন্তু সে এগিয়েছে অতি ধীর গতিতে। ‘বিদায় অভিশাপ’-এর কচ বেরিয়ে পড়ে স্বর্গের উদ্দেশ্যে দেবযানীকে পিছনে রেখে। মায়ের অনুরোধকে পিছনে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে কচের মতই নবীন মাধব। নৈবিদ্যের প্রতি দেবতার নিরাসক্তির মতই নবীন মাধবের সংসার জীবনের প্রতি নিরাসক্তি। সে ছত্রিশ বৎসর বয়সের গণিত ফল শুনিয়ে নবীন মাধবকে তার সাধনার সিদ্ধির পথের দিকনির্দেশ করেছে। হঠাৎ করেই অচিরা বলেছে,

“এই চিরকালের বনের মধ্যে যে একটা অন্ধ প্রাণের শক্তি আছে, ক্রমেই তাকে আমার ভয় করছে।”

নবীন এর উত্তর দিয়েছে নিজ স্বার্থের অনুকুলে, বলেছে,

“এই রকম জায়গায় এমন একজন মানুষের সঙ্গ সমস্ত অন্তর বাহিরে পাওয়া চাই, যার প্রভাব মানব প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ করে রাখতে পারে। যতক্ষণ না পাই ততক্ষণ অন্ধ শক্তির কাছে কেবলই হার ঘটতে থাকবে।”

নবীন মাধব চাইছে অচিরাকে নিজের করে পেতে। কিন্তু অচিরা তাকে জানিয়ে দেয়

“দীর্ঘকালের প্রয়াসে মানুষ চিত্তশক্তিতে নিজের আদর্শকে গড়ে তোলে, প্রাণ শক্তির অন্ধতা তাকে ভাঙে। আপনার দিকে আমার যে ভালোবাসা, সে সেই অন্ধশক্তির আক্রমণে।”

নবীন মাধব ভবতোষের কথা তুলেছে। কিন্তু অচিরা জানিয়েছে যে তার জীবনের প্রথম ভালোবাসা ক্রমেই ইম্পার্সোন্যাল হয়ে উঠেছে। প্রথম ভবতোষকে ঘিরে যা ছিল পার্সোনাল, ক্রমেই তা এমন ইম্পার্সোন্যাল হয়ে উঠেছে যে আর কোন আধারের প্রয়োজন হয় না।

সে বলেছে, “ভালোবাসার আদর্শ আমাদের পূজার জিনিস। তাকেই বলে সতীত্ব। সতীত্ব একটা আদর্শ। এ জিনিসটা বনের প্রকৃতির নয়, মানবীর। এ নির্জনে এতদিন সেই আদর্শকে আমি পূজা করছিলুম সকল আঘাত সকল বঞ্চনা সত্ত্বেও। তাকে রক্ষা করতে না পারলে আমার শুচিতা থাকে না।”

তাই ভালোবাসা তার কাছে একটা আদর্শ যা অবাঙমনোসগোচরঃ। নবীন মাধবের প্রতি তার ভালোবাসার উৎস ভক্তি। পঞ্চবটীর বনে বসে অচিরা নবীন মাধবের কর্ম প্রবাহকে লক্ষ্য করে তার প্রতি যে ভক্তিভাব জন্মেছিল, সেটাই হয়ে উঠল আলাপের শুরু। কিন্তু যতই ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে নবীন মাধবের কর্মসাধনায় এসেছে শৈথিল্য। অচিরার মনে হয়েছে এটা নবীন মাধবের পরাজয় এবং এই পরাজয়ের মূলে রয়েছে সে। অচিরা তাই নিজেকে ধিক্কার দিয়েছে, বলেছে,

“ছি, ছি, কী পরাজয়ের বিষ এনেছি আমার মধ্যে। সে অনুরূপ উক্তি করেছে দাদুর সম্পর্কেও।

“আমি তোমাকে টেনে এনেছি তোমার আসন থেকে। আমরা কেবল নামিয়ে আনতেই জানি।”

এযেন অচিরার নবতম উপলব্ধি। ভবতাোষের প্রতি তার ভালোবাসা যেমন ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে ইম্পার্সোন্যাল হয়ে উঠেছে, কিন্তু তা ক্ষণেকের জন্যও ভুলে গিয়ে অচিরা নবীন মাধবের দিকে প্রেমের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, ক্ষণেকের জন্যও তার সতীত্বের আদর্শ ম্লান হয়ে গেছে। কিন্তু সে পরক্ষণেই নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে। নবীন মাধবের কর্ম সাধনার বিচ্যুতি, অধ্যাপক দাদুর গ্রন্থকীটে পরিণতি এ সবই যে তার আদর্শ হতে বিচ্যুতির কারণ— তা তার মনের মধ্যে চেপে বসেছে। তাই সিদ্ধান্ত যা নেবার তাকে তা একাই নিতে হয়েছে। নবীন মাধবের প্রতি প্রেমের মোহাবরণ ছিন্ন করে সে বেরিয়ে এসেছে। অধ্যাপক দাদুকেও সে স্বস্থানে ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নবীন মাধব ক্রমেই বুঝেছে অচিরার সতীত্বের আদর্শকে। এই আদর্শ-আদর্শই সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক বাক্য দিয়ে স্পর্শ দিয়ে, অনুভূতি দিয়ে যা বোঝা যায় না, শুধুমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই যা লভ্য অর্থাৎ অবাঙমানসোগোচরঃ, নির্গুণ ব্রহ্মের মতই তা শুধু ধেয়-লভ্য নয়, যার অজিত বাইরে নয়, সম্পূর্ণ মানসিক। অচিরাকে তার এই অবস্থান হতে বিচ্যুত করলে তা হবে অচিরার মানসিক অপমৃত্যু-যা কখনই কাম্য নয় জ্ঞান সাধক নবীন মাধবের।

অচিরা বলেছে মানুষের অভিব্যক্তি তপস্যার, বায়োলজির নয়। অধ্যাপক দাদুও বলেছে যে তপস্যাহীন মানুষ জান্তব প্রবৃত্তির বর্বর, তপস্যাই মানুষকে জ্ঞানী করে। তাই স্থূলত্ব বর্জন করে সূক্ষ্মতার পথে অগ্রসর হতে হবে। মানুষের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে মানুষই দেবতা হয়ে উঠবে। নবীনমাধবের সাময়িক বিচ্যুতি শেষ পর্যায়ে উপনীত হল। সে বুঝতে পারল জ্ঞানের যে দীপশিখার সে অনুসরণ করেছে তা অনির্বাণ। একে রোধ করার শক্তি কারও নেই। সেই পথই তার পথ-সে পথ বায়োলজির নয়, উন্নত তপস্যার। অধ্যাপক দাদুও বলেছেন,

"আমি জানি সামনে তোমার কীর্তির পথ প্রশস্ত"। তবে এই সাধনা কি অচিরার সমস্ত স্মৃতিকে বিসর্জন দিয়ে এখানেই ফুটে উঠেছে লেখক রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় আদর্শ। নারী হয়ে উঠেছে পুরুষের পরিচালন শক্তি।

নবীন মাধবের পা ছুঁয়ে অচিরা প্রণাম করে বলেছে "আপনার তুলনায় আমি কেউ নই সে কথাটা একদিন স্পষ্ট হবে।" ক্রমেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে নবীন মাধবের মনে। শুধুমাত্র নারীত্ব জৈবিক আচরণে সিদ্ধা, তাই নারীত্ব নয়, নারীর মনুষ্যত্বই এক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়েছে। গল্পের শেষে সকলেই ফিরে গেছে। অচিরা গেছে তার দাদুকে স্বস্থানে স্থিত করতে, আর নবীন নধব ফিরে গেছে। তার সাধনায়। সে অচিরা চিন্তার বায়োলজির ফাঁদ হতে মুক্ত, অনেকটা মুক্ত বিহঙ্গের মত। যে বিহঙ্গ মোহরূপ খাঁচায় আবদ্ধ ছিল তা হতে সে মুক্ত হয়েছে বটে, কিন্তু পায়ে রয়েছে ছিন্ন শিকলের অংশ।

- "সন্ধেবেলায় দিনের কাজ শেষ করে বারান্দায় এসে বোধ হল— খাঁচা হতে বেরিয়ে এসেছে পাখি, কিন্তু পায়ে আছে এক টুকরো শিকল। নড়তে চড়তে সেটা বাজে।" এই ছিন্ন শিকল হয় অচিরার স্মৃতি-প্রেরণা ছাত্রীরূপে তার অবস্থিতি। নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানের সাধনায় ক্লান্তি আসা স্বাভাবিক। কিন্তু ক্লান্তির এই মুহূর্তকে দূরে অপসারিত করে আনন্দ প্রবাহ সিঞ্চন করবে অচিরারূপী শিকল। এ শিকল ছিন্ন, পরিপূর্ণ শিকলের মত বন্ধীভূত হবেনা। বেদনাময় মুক্তির আনন্দ স্মৃতি দিয়ে নবীন মাধব ফিরে পেয়েছে তার জ্ঞান উদ্ভাসিত জগৎকে। অচিরা হয়ে উঠেছে তার প্রেরণাদাত্রী, তার আনন্দদায়িনী সত্তা।

১.৭ অরণ্য প্রকৃতির মোহ

ছোটনাগপুরের নেটিভরাজার ছেলে দেবিকাপ্রসাদের সঙ্গে পরিচয় সূত্রে রাজ এস্টেটের জিয়োলজিক্যাল সার্ভেয়ার হিসাবে নবীন মাধবের চাকরী জীবনের সূত্রপাত। নবীন মাধব জ্ঞান তপস্বী। হাতে-কলমে শিখে খনিজ বিদ্যার উপর ভালো বিদেশী ডিগ্রি পেয়েছে। বিলাতে থাকাকালীন বিলিতি কাগজে তার যে সব গুরুগম্ভীর লাতিন শব্দালংকৃত তত্ত্বমুলক প্রবন্ধ বের হয়েছিল-তা দেশ বিদেশের জ্ঞানী-গুণী সমাজে বিশেষ

ভাবে প্রভাব ফেলেছে। এমনকি ল্যাবরেটরি অচিরার অধ্যাপক দাদুও তাকে নামে চিনেছেন। দেশ বিদেশে সে ডক্টর সেনগুপ্ত বলে পরিচিতি। নবীন মাধবের এই জ্ঞানের সাধনা সম্পূর্ণরূপে নারী সঙ্গ বর্জিত। বিয়ের ব্যাপারে সে মার অনুরোধেও কর্ণপাত করেনি। সে তার কাজের স্থান বেছে নিয়েছে ভারতবর্ষে। প্রথাগত বিপ্লববাদের প্রতি অনীহাবশত সে বিলাতে গিয়েছিল যন্ত্রবিদ্যা শিখতে। কিন্তু তার সাধনা পথ খুঁজে পেল খনিজ বিদ্যায়। এই বিদ্যায় সিদ্ধকাম হয়ে সে ভারতেই ফিরে আসে। কারণ সে মনে-প্রাণে তার দেশকে ভালোবাসে। সে দেশপ্রেমিক বলেই কাজ নিয়েছে ছোটনাগপুরের রাজ এস্টেটে। রেডিয়াম কন্যার সন্ধানে সে ব্যস্ত।

এহেন নবীন মাধবের জীবনে ছোটনাগপুরের অরণ্য প্রভাব এক অপূর্ব মোহজাল বিস্তার করেছে। সে বলেছে, "জিয়োলজির চর্চার মধ্যেই ভিতরে ভিতরে এই আরণ্যক মায়ার কাজ চলছিল।" পলাশ ফুলের রাঙা রঙের মাতলামি, শালগাছের মঞ্জুরী ঘিরে মৌমাছির ঝাঁক, মহুয়া ফুলের সমারোহ, ফুলের পাতায় রেশমের গুটি, ছিপ ছিপে নদী এসবই আরণ্যক পটভূমি যার মায়ায় আদিম প্রাণের মন্ত্রধ্বনি শ্রুত হয়। জীবচেতনা কে উজ্জীবিত করে, বুদ্ধিকে করে গৌণ। কঠোর বিজ্ঞানী ননী মাধবের অটল অন্তঃস্তরে এই প্রভাব তাকে তার সাধনার পথ হতে অনেকটাই সরিয়ে এনেছে। সাধনা ছেড়ে সে যেন ক্রমেই বায়োলজির ছাত্র হয়ে পড়েছে।

অন্যদিকে এই আরণ্যক মোহ অচিরাকেও আদর্শ ভ্রষ্ট করেছে।" সে স্পষ্ট স্বীকার করেছে। "এই চিরকালের বনের মধ্যে যে একটা অন্ধ প্রাণের শক্তি আছে, ক্রমেই তাকে আমার ভয় করছে। নবীন মাধবের যুক্তি হল 'একজন মানুষের সঙ্গ অন্তর বাহিরে পাওয়া চাই, যার প্রভাব মানব প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ করে রাখতে পারবে। যতক্ষণ না পাই ততক্ষণ অন্ধ শক্তির কাছে কেবলই হার ঘটতে থাকবে। কিন্তু অচিরা এই অন্ধশক্তির নাগালের বাইরে আসতে চায়। ছায়াছন্ন অরণ্যের নিশ্বাস, রাক্ষসী রাত্রির দ্বারা আবিষ্ট প্রবৃত্তি রাক্ষসকে সে জয় করেছে তার নবলব্ধ সতীত্বের আদর্শ দিয়ে। এই আদর্শকে শেষ পর্যন্ত মেনে নিয়েছে নবীন মাধব। অচিরা ফিরে গেছে শহরে তার দাদুকে সঙ্গে নিয়ে। প্রবৃত্তিরূপী অক্টোপাস শেষ পর্যন্ত তার গতিরোধ করতে পারেনি।

১.৮ অনুশীলনী

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তিনসঙ্গী' সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করো।

২। রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের লেখা 'তিনসঙ্গী' এর বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

৩। 'তিনসঙ্গী'র প্রথম গল্প কোনটি? গল্পের অভিক চরিত্রটি ব্যাখ্যা করো।

৪। 'শেষকথা' গল্পে নবীন মাধব চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করো।

৫। 'রবিবার' গল্পটি ছোট গল্প হিসেবে কতদূর সার্থক।

৬। 'শেষ কথা' গল্পের নামকরণের সার্থকতা আলোচনা করো।

১.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১। গল্পগুচ্ছ রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ - বামা পুস্তকালয়

২। রবীন্দ্র কথা কাব্যেরশিল্প সূত্র - সুখরঞ্জন রায়

৩। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প - প্রমথনাথ বিশী

৪। রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ -তপোব্রত ঘোষ

৫। রবীন্দ্র ছোটগল্প আলোচনার আলোকে - অশোককুমার কুণ্ডু (সম্পাদিত)

একক ২ ল্যাবরেটরি

বিন্যাসক্রম

২.১ সাধারণ আলোচনা

২.২ শেষ পর্যায়ের কথা

২.৩ নন্দকিশোরের গূঢ়ার্থ

২.৪ মেট্রিয়ার্কি রেবতীর রক্তে

২.৫ সোহিনী ও নীলা

২.৬ অনুশীলনী

২.৭ গ্রন্থপঞ্জি

২.১ সাধারণ আলোচনা

একেবারে শেষের গল্প ল্যাবরেটরির সোহিনী নন্দকিশোরের মনোবৃত্তির অনুসারিণী। সে এককথায় নন্দকিশোর অনুব্রতা, কেননা নন্দকিশোরের ল্যাবরেটরি তার পূজার মন্দির। সোহিনীর মধ্যে নন্দকিশোর প্রত্যক্ষ করেছিল ক্যারেক্টারের তেজ, সে তেজ মলিনতার মধ্যেও অনির্বাণ। শাস্ত্রমতে বিয়ে হয়নি, তাই সোহিনী নন্দকিশোরের সঙ্গিনী হলেও, সে পতিব্রতা এই অর্থেই যে, স্বামীর ব্রতই তার ব্রত। প্রাণের, ধর্মে সে স্বৈরিণী, স্বেচ্ছাচারিণী। নিজের রূপ ও যৌবনের দ্বারা অনেককেই সে ভুলিয়েছে, কিন্তু চিত্তধর্মে যে নিষ্ঠাবতী, স্বামীব্রতচারিণী। সমাজ প্রচলিত সতীত্বের ধারণাকে সে বিচুর্ণ করেছে। নন্দকিশোর বলেছিল “ওকে নন্দকিশোরী করতে হবে, সেটা যে সে মেয়ের কাজ নয়। পতিব্রতা স্ত্রী চাও যদি, আগে ব্রতের মিল করাও।” সোহিনী নিজেই স্বীকার করেছে

"আজন্ম তপস্বিনী নই আমরা, ভড়ং করতে করতে প্রাণ বেরিয়ে গেল মেয়েদের। দ্রৌপদী কুন্তীদের সেজে বসতে হয় সীতা সাবিত্রী।" এই সতী সেজে থাকার আবিলতা থেকে সোহিনী মুক্ত ছিল। সে জন্যেই প্রাণধর্মের স্বেচ্ছাচারিতাকে সে জয় করে, নন্দকিশোরের চিতার আগুনে নিজের আসক্তিকে ভস্মীভূত করে ল্যাবরেটরিকে করে তুলেছে হোমের পবিত্র স্থণ্ডিল।

সোহিনী ও নন্দকিশোর উভয়ের চিত্তধর্মের সাদৃশ্যটাও লক্ষণীয়। নন্দকিশোর ল্যাবরেটরি নির্মাণের জন্যে রেল কোম্পানীর টাকা চুরি করেছে, আর সোহিনী ল্যাবরেটরি রক্ষার জন্যে। নিরাসক্তভাবে তার নারীত্বকে ব্যবহার করেছে। উভয়েরই means শুভ, উভয়েই। ব্যক্তিগতভাবে আসক্তিহীন। অধ্যাপক চৌধুরীকে সে নিজে, এবং রেবতীকে আকৃষ্ট করার জন্যে মেয়ে নীলাকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করেছে। আবার প্রয়োজনে নীলার জন্ম বৃত্তান্ত অর্থাৎ তার স্বৈরিণী জীবনের গোপন কথাও অকপটে ঘোষণা করেছে। বিপরীতে রেবতীর চরিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে গোবৎস রূপে। রেবতী গৃহপালিত পিসিমাচালিত পৌরুষত্বহীন ব্যক্তিসত্তা। পিসিমার আহ্বানে সব ছেড়ে দিয়ে রেবতীর চলে যাওয়াটা যেমন হাস্যকর তেমনই লজ্জাজনক। পরিণামটি খুবই চমকপ্রদ।

রেবতীর মধ্যে পৌরুষের ম্যাগনেটিজম্ নেই। মহাবিশ্বে গ্রহগুলি পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে এবং এই আকর্ষণের মধ্য দিয়েই অপরের আকর্ষণের টানকে এড়িয়ে চলে। মানব জীবনের ক্ষেত্রেও সেটা ঘটে। নারীর চৌম্বকশক্তির টানে যে পুরুষ আত্মসমর্পণ না করে নিজের চৌম্বকশক্তির প্রতিমুখী টানে ভারসাম্য বজায় রাখে, সেই জন আসল পুরুষ।

রবিবারের অভীক তা রাখতে পেরেছে। নন্দকিশোর এ বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু রেবতী গোবৎসে পরিণত। ল্যাবরেটরিকে শেষপর্যন্ত রক্ষা করেছে নীলা। রেবতীকে মৃত্যুটান দিয়ে সে বুঝিয়ে দিয়েছে তার মায়ের নির্বাচনে গলদ কোথায়। 'ল্যাবরেটরি' গল্পটি এয়োদশ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত হয়েছে। গল্প কথার শুরু হয়েছে তৃতীয় পরিচ্ছদ থেকে। প্রথম দুটি পরিচ্ছেদকে বলা যায় গল্পের প্রাথন। সোহিনীও নীলার পূর্বজীবন এখানে

সংলাপ ও বিবৃতির মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। সংলাপ কিছুটা নাট্যধর্মী। দশম পরিচ্ছেদ থেকে নীলার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে, সে হয়ে উঠেছে সোহিনীর প্রতিপক্ষ। সোহিনীর প্রতিপক্ষে তার উপস্থিতি এবং শেষের কয়েকটি পরিচ্ছেদে তার কার্যাবলীর বিস্তৃত বিবরণ ছোটগল্পের আঙ্গিকে গল্পের একমুখীনতার হানি ঘটিয়েছে। সোহিনীও অধ্যাপকের সংলাপ অত্যন্ত বিস্তৃত। এও ছোটগল্পের ক্ষেত্রে সংহতি বিনাশক হয়ে উঠেছে। হয়তো এসব রবীন্দ্রনাথের বার্ধক্য জনিত দুর্বলতা। এসব সত্ত্বেও ল্যাবরেটরি গল্প হিসাবে অসাধারণ। এই অসাধারণত্ব বিরাজ করেছে ল্যাবরেটরির শিল্পরূপে- লেখকের বার্ধক্য সত্ত্বেও সতীত্বের নতুন ব্যাখ্যায়-যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি সতীত্বের নতুন মানদণ্ড নিরূপণ করতে চেয়েছেন তা যেমন দুঃসাহসিক তেমনই চমকপ্রদ। ল্যাবরেটরির অবস্থান বাস্তব হলেও গাল্পিক শিল্পরূপে প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

মানব মনই হল সেই ল্যাবরেটরি যেখানে নিয়তই ম্যাগনেটিজম্-এর খেলা চলছে। এই ম্যাগনেটিজ হল নারী পুরুষের যৌন আকর্ষণ। সোহিনীর মুখে এই আকর্ষণ ও বিকর্ষণের সত্যতা বিশ্লেষিত হয়েছে। জড় বিশ্বে গ্রহগুলি পারস্পরিক টান যেমন মেনে চলে, তেমনই আবার টান এড়িয়েও চলে। মানববিশ্বে নারীর প্রতি পুরুষের আকর্ষণ যেমন সত্য, তেমনই সত্য পৌরুষের ম্যাগনেটিজম যা প্রতিমুখী আকর্ষণে বিকর্ষণ জনিত একটা ভারসাম্য গড়ে তোলে। এই গল্পে সোহিনী পরীক্ষা নিয়েছে রেবতীর। এ পরীক্ষা টান মেনে চলে টান এড়িয়ে চলার ক্ষমতার পরীক্ষা। রেবতী এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়নি, কিন্তু ল্যাবরেটরির অক্তিত্ব সঙ্কট দূর হয়েছে।

২.২ শেষ পর্যায়ের কথা

ল্যাবরেটরি গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের আনন্দবাজার পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায়।

এটি ছোটোগল্প নয়—অন্তত আকৃতিতে। প্রকৃতিতেও সেই ভাবটি পুরোপুরি নেই। তবে সমাপ্তিতে ছোটোগল্পোচিত একটি চমক আছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

এতাবৎকাল প্রচলিত বিশিষ্ট সাহিত্যরূপ বা জঁরগুলির আঙ্গিকগত নির্দিষ্ট নিয়মসমি মাঝে মাঝেই লঙ্ঘন করেছেন।

শুধুমাত্র আঙ্গিকের ক্ষেত্রেই নয়, বিষয়ের ক্ষেত্রেও তাঁর নব নব নিরীক্ষা চ*লেছে* জীবনের শেষপর্বের সাহিত্যকর্মগুলির ক্ষেত্রে। একসময়ে প্রচলিত সমাজবিধি সাহিত্যেও মান্য করে চলেছেন তিনি। তাই চোখের বালি'র বিধবা নায়িকা বিনোদিনী বিহারীকে বিবাহ করার পরিবর্তে বারাণসী চলে গেছে ; আবার পরবর্তীকালে বিধবা দামিনীর সঙ্গে শ্রীবিলাসের বিবাহ সম্ভব হয়েছে 'চতুরঙ্গে'র সাহিত্যক্ষেত্রে। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে পাওয়া গেছে মৃণালকে, যে 'পতি পরম গুরু' মন্ত্রকে ত্যাগ করেছে মন-থেকে এবং স্বামীগৃহ ছাড়াও নারীর যে অন্য আশ্রয় আছে এই বিশাল পৃথিবীতে—তাই বিশ্বাস করেছে। এগুলি প্রচলিত সমাজবিধি নয়, কিন্তু শিল্পী তাকিয়েছেন চরিত্রগুলির হৃদয়ের দিকে। এই পথ ধরেই এসেছে ল্যাবরেটরি। সেই হৃদয়ের কাছে দেহের পবিত্রতা-অপবিত্রতার তত্ত্ব নিতান্তই তুচ্ছ এ বিষ*য়ে লে*খক স্বয়ং প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে বলেছিলেন— "আমি ইচ্ছে করেই তো করেছি। সোহিনী মানুষটা কি রকম, তার মনের জোর, তার লয়ালটি, এই হল আসলে বড়ো কথা। তার দেহের কাহিনী তার কাছে তুচ্ছ। নীলা সহজেই সমাজে চলে যাবে, কিন্তু সোহিনীকে বাধবে।" (শ্রী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, "কবি-কথা", বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ/১৩৫০)। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের জগতে সোহিনী কিন্তু প্রক্ষিপ্ত চরিত্র নয়। সোহিনীর অস্পষ্ট পূর্বরূপ আছে 'চিত্রাঙ্গদা' চরিত্রে। চিত্রাঙ্গদা গৃহিণী ও প্রেয়সীতে মিলে একটি আদর্শ চরিত্র কিন্তু তার প্রেমময়ী রূপটিই লাবণ্যে উজ্জ্বলতর। ঘরে-বাইরের বিমলা-চরিত্রের মধ্যেও *প্রেয়*সী ও গৃহিণী পরিচয়ের দ্বন্দ্ব। পরে যখন রবীন্দ্রনাথ দুই-নারী তত্ত্বে বিশ্বাস স্থাপন করলেন, তখন হয়তো এও ভাবলেন যে, প্রেয়সী ও জননী পরিচয়ের মধ্যে কোনো *মৌ*লিক দ্বন্দ্ব *নে*ই। এই বিন্দু থেকে চিন্তা আরও অগ্রসর হয়ে পৌঁছোলো নারীত্বে। বস্তুত, সোহিনী ঐ নারীত্ব-পদেরই যোগ্যতম অধিষ্ঠাত্রী। তারও প্রেয়সীরূপ এবং জননীরূপ আছে কিন্তু তা সামাজিক আদর্শোচিত নয়। সে নিজে একাধিকবার তা জানিয়েছে। নন্দকিশোরের কাছে সে এসেছিল তাঁর চমকপ্রদ ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে, প্রেমের আকর্ষণে নয়। মেয়েটি

ইতিমধ্যেই অনেক পুরুষকে দেখেছিল—তাই নন্দকিশোরের অনন্যতা বুঝতে তার সময় লাগেনি। বিশ বছরের ঘাগরা-দোলানো মেয়েটির জ্বলজ্বলে চোখ, শাণ-দেওয়া ছুরির মতো হাসি, এসব তার এই পরবর্তী বক্তব্যটির সঙ্গেই খাপ খাওয়ানো, যে-"অনেক পুরুষকেই আমি ভুলিয়েছি, কিন্তু আমার উপরেও টেক্কা দিতে পারে এমন পুরুষ আজ দেখলুম। সমাজে তার অবস্থান নির্মল বা নিভৃত ছিল না—তবু নন্দকিশোর তাকে পাক থেকে তুলে আনলেন কারণ মেয়েটির ব্যক্তিত্বের তেজ তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। নন্দকিশোর গত হবার পরে অধ্যাপক মন্মথ চৌধুরীর সঙ্গে তার আচরণেও আছে কার্যোদ্ধার করে। নেবার ইঙ্গিত। স্বামীর মৃত্যুর পর সম্পত্তির উপর স্বামীর আত্মীয়স্বজনদের দখলদারির চেষ্টা সে অনায়াসে ব্যর্থ করে দিল উকিলপাড়ায় নারীর মোহজাল বিস্তার করে। আদর্শ প্রেয়সী সে কোনোকালেই নয়। নারীর রূপকে সে কার্যোদ্ধারের অস্ত্র হিসেবেই জানে। কিন্তু কাজের জায়গাটায় তার নিষ্ঠা অসামান্য। এই অসামান্যতা আছে বলেই ছোটোখাটো পদস্খলনগুলির কথা সে অনায়াসে স্বীকার করতে পারে। আসলে ওগুলিকে সে গায়েই মাখে না—"সত্যি কথা বলতে আমার বাধে না। আজন্ম তপস্বিনী নই আমরা।.....ছেলেবেলা থেকে ভালোমন্দ বোধ আমার স্পষ্ট ছিল না।.....তাই মন্দের মাঝে আমি ঝাপ দিয়েছি সহজে, পারও হয়ে গেছি সহজে। গায়ে আমার দাগ লেগেছে কিন্তু মনে ছাপ লাগেনি। প্রথাগত প্রেয়সীর ধারণার সঙ্গে এই বক্তব্যগুলি খাপ খায় না–সাথে সাথে এও বোঝা যায় যে, মনের ব্যাপারটাকেই সোহিনী সর্বাধিক মূল্য দেয়, দেহকে নয়। সেই কারণেই ল্যাবরেটরির কাজে যোগদানের ব্যাপারে রেবতী ভট্টাচার্যের আগ্রহ বাড়াবার জন্য সে নিজের মেয়ে নীলিমার সৌন্দর্যকে কাজে লাগিয়েছিল। ফলতঃ, জননী হিসাবেও তার ভূমিকা তেমন স্পৃহনীয় নয়। নীলিমাকে সে কার্যসিদ্ধির অস্ত্ররূপেই ব্যবহার করেছে। আবার, যখনই দেখেছে, নীলিমার দ্বারা ল্যাবরেটরির ক্ষতি হবার সম্ভাবনা, তখনই নির্দয়ভাবে সর্বসমক্ষে জানিয়ে দিয়েছে, যে, নীলিমা নন্দকিশোরের মেয়ে নয়। গ্রহ যেমন একমাত্র নক্ষত্রের চারপাশে ঘোরে, তেমনি সোহিনীর চিত্তও ঘুরে বেড়িয়েছে নন্দকিশোরের ল্যাবরেটরির আশেপাশে। যে কোনো মূল্যে ঐটিকে রক্ষা করাই তার কাছে সতীধর্ম। এই ধর্মপালনের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ, ঐ ব্যক্তিত্বই তার ঐশ্বর্য।

মানুষ মরণশীল, তবু সে অমরত্ব চায়। প্রাচীনকালের মানুষ সাধনার দ্বারা নিজের আয়ু বাড়াবার চেষ্টা করত, বর্তমান মানুষ জগতে অমর হতে চায় কীর্তির মাধ্যমে আয়ুর মাধ্যমে নয়। এই অমরত্ব অর্জনের উপায় ল্যাবরেটরি—নন্দকিশোরের ক্ষেত্রে। তাই ল্যাবরেটরির জন্য তিনি কিছু সরকারি টাকা নয়ছয় করেছিলেন, বিনা বিবেক-তাড়নায়। সমাজের প্রচলিত নীতিবোধকে অগ্রাহ্য করতে তাঁর বাধত না উদ্দেশ্য-র খাতিরে, বিশেষতঃ সরকারকে বঞ্চনা করাটা ঠিক ব্যক্তিমানুষকে বঞ্চনা করবার মত নির্দয় কাজ নয় বলেই তার মনে হতো।সোহিনীকে তিনি কিনে নিয়েছিলেন সাত হাজার টাকা দিয়ে কারণ মেয়েটির সাবলীলতা এবং অসংকোচ ভঙ্গির মধ্যে ধরা পড়ছিল তার ব্যক্তিত্বের তেজ। মেয়েটিকে তিনি শুধু বিয়েই করেননি, তাকে নিজের ধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন। ব্রতের মিল করানোটা সহধর্মিণী হয়ে ওঠার গুরুত্বপূর্ণ শর্ত বলেই তিনি জানতেন। এ কাজে তিনি সফলও হয়েছিলেন। সোহিনী নিজের প্রাণধর্মের বহুচারিতা থেকে আস্তে আস্তে চিন্তধর্মের একনিষ্ঠ অবিচলতায় পৌঁছেছিল।

সব মানুষের মধ্যেই ছোটো ও বড়ো দুটি দিকই আছে। বড়ো দিকটি গ্রহণীয়। ল্যাবরেটরি গল্পে নন্দকিশোর এ তত্ত্ব পালন করেছেন এবং সোহিনী এ তত্ত্ব উচ্চারণ করেছে অধ্যাপকের কাছে। তাই সে জীবনের মূল কেন্দ্রে কোনো অনিয়ন্ত্রণকে প্রশ্রয় দেয়নি—না নিজের, মেয়ের। তাই ল্যাবরেটরির স্বত্ব নিয়ে মামলা লড়বার সময়ে সোহিনী আর্টিকেলড ক্লার্কের পর মোহ বিস্তার করেছে—তাতে তার কোনো নীতিগত দোলাচলতা দেখা যায়নি। ল্যাবরেটরি রক্ষার জন্যই সকলের সামনে নীলিমার জন্মবৃত্তান্ত ব্যাখ্যা করতেও সে নির্দ্বিধ। তার মধ্যে ভড়ং বা কৃত্রিমতা নেই। আর সেই কারণেই নন্দকিশোর নীলার জন্মবৃত্তান্ত খোলসা করে রেজিস্ট্রি করতে পেরেছিলেন।

শুধুমাত্র ল্যাবরেটরি নয়—রক্ষা করবার এক স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই আছে সোহিনীর মধ্যে, তাই পা-ভাঙা রেয়া-ওঠা কুকুরটা তার কাছেই রক্ষা পায়। বায়োলজি বিষয়ক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর কানা খোড়া প্রাণীগুলির জন্য সে একটা হাসপাতালও খুলতে চেয়েছে। ল্যাবরেটরি রক্ষার জন্য সে যে-কোনো পথ নিতে প্রস্তুত। এই মনোবৃত্তির ক্ষেত্রেই তার ও নন্দকিশোরের সাম্য। নন্দকিশোর রেলের-ব্রিজ তৈরির অনেক টাকাই আত্মসাৎ

করেছিলেন-—কিন্তু অপচয় করেননি। ব্যয় করেছিলেন এক অনবদ্য ল্যাবরেটরি বানাবার কাজে। দুজনের কাছেই উদ্দেশ্যটা বড়ো, পদ্ধতিটা তুচ্ছ।

ল্যাবরেটরি এ গল্পে একটি প্রতীকরূপেই ব্যবহৃত হয়েছে। সমস্ত মানুষের মনই হচ্ছে ল্যাবরেটরি। যেমন সৌরমণ্ডলে গ্রহগুলো নক্ষত্রের টান মেনে চলে আবার এড়িয়েও চলে— তেমনি যথার্থ পুরুষও নারীর চৌম্বক শক্তির আকর্ষণকে মান্যও করবেন আবার তার ঊর্ধ্বে উঠবেন। দুদিকের আকর্ষণ মানুষকে কোনো দিকে হেলতে দেবে না—স্থির রাখবে। ঐ স্থির থাকার শক্তিটাই রেবতীর মানস-ল্যাবরেটরিতে আছে কি না, তা সোহিনী পরীক্ষা করে নিতে চেয়েছে। প্রথমদিকে নীলিমা ওরফে নীলার দ্বারা আকর্ষিত হলেও অনতিবিলম্বে রেবতীর মধ্যে জেগে উঠেছে বিজ্ঞানী—"জ্বলে উঠল তার দুই চোখ। চেহারাটা একেবারে ভিতর থেকে গেল বদলে।" কিন্তু নারীজাতির প্রাধান্য স্বীকার রেবতীর বাল্যস্বভাব। দাপটযুক্তা পিসিমার প্রভাবের আওতায় সে মানুষ। তার বাইরে এসে স্বাধীনভাবে কাজ করার অনভ্যাসের ফোঁটা তার কপালে চড়চড় করে। অচিরেই সে নীলার অধীন হয়ে পড়ল। সম্ভবত, এই অবসরটুকু করে দেবার জন্যই সোহিনীকে লেখক পাঠিয়ে দিয়েছেন আম্বালায়, মৃত্যুপথযাত্রিনী আইমার পাশে ; অধ্যাপককে বন্ধুকৃত্যের কারণে যেতে হয়েছে গুজরানওয়ালায়। মেট্রিয়ার্কি রাজ্যে ঘোর আনাড়ি রেবতী এই দুই জলজ্যান্ত টীকার অভাবে নারীর আকর্ষণ-রূপ-এপিডেমিকের কবলে পড়েছে—যা নাকি প্রথম থেকেই সোহিনীর আশঙ্কা ছিল। ফলে ল্যাবরেটরির ট্রাস্ট সম্পত্তির প্রেসিডেন্ট পদ গ্রহণ করবার প্রস্তাবে সে অসম্মতি জানিয়েছে অথচ পরে নীলাদের জাগানী ক্লাবের প্রেসিডেন্ট পদ গ্রহণ করেছে। কাহিনীর শুরুতে এই বিজ্ঞানব্রতী তাপসকে সোহিনী প্রণাম জানিয়েছিল। কাহিনীর শেষে সোহিনী সেই ব্যক্তিরই হাতের বদলে খুর দেখতে পেয়েছে। রেবতী যেন সেই গোরুটি, যার দড়ি কখনো পিসিমার কখনো নীলিমার হাতে! কাহিনীর মধ্যে গোরুর প্রতীকটি চমৎকারভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং কাহিনীর শেষে লেখক তাকে প্রায় গোবৎসে পর্যবসিত করেছিলেন।

এই প্রমাণকার্যে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে, নীলা। পুর্বে সোহিনী বারে বারে ব*লেছে*, যে, তার মেয়ের স্বভাব ল্যাবরেটরি রক্ষার পক্ষে অনুকুল না। মেয়েটি সুন্দরী, দে*হে* মৃতপক্ষের আতা, চোখে নীলপথের আভাস, তার জন্ম পরিচয় রহস্যময় তাই বিবাহের একমাত্র পথ হচ্ছে মন ভোলাবার পথ। এক মাড়োয়ারি যুবকের সঙ্গে সিভি মতে বিবাহ হয়েছিল, কিন্তু অবিলম্বে টাইফয়েডে মারা গেল ছেলেটি। মেয়ের যৌবনচাপল্য মাটির পেতে লাগল।মনে পড়ল নিজের অতীত জ্বালামুখী অগ্নিচাপল্যের দিনগুলি। একটা বিপরীত আকর্ষণ তৈরির জন্য মেয়েকে নিবিড় করে পড়াশোনায় লাগিয়ে দিল - এক বিদুষী এলেন শিক্ষিকা হয়ে। এইখানে রবীন্দ্রনাথ মৃদু সমকামিতার ইঙ্গিত দিয়েছেন-"নীলার যৌবনের আঁচ লাগত তারও মনে, তুলত তাকে তাতিয়ে অনির্দেশ্য কামনার তপ্ত বাপে।" মেয়ে অজায়গায় উঁকিঝুকি দিতে বেশি উৎসুক, মাঝে মাঝে ধরা পড়ে, সাজাও পায়। রেবতীর উপর মোহজাল বিস্তার করবার কাজে সে মাকে সাগ্রহে সাহায্য করেছে, কিন্তু তারপর চলবার চেষ্টা করেছে নিজেরই পথে। অধ্যাপক মজুমদারের সঙ্গে সে যায় সিনেমায়, বিষয়সম্পত্তির জন্য আশ্রয় করে অ্যাটর্নি বন্ধুবিহারীকে বিয়ে করতে চায় মোতিগড়ের রাজকুমারকে। রেবতীকে ল্যাবরেটরির কাজে লাগানো হয়েছে বলেই সে বিশেষভাবে তাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে চায়। সোহিনী যেমন নিজেও বহু মানুষের সঙ্গ করেছিল, তার মেয়েও তাই। কিন্তু সোহিনী নন্দকিশা◌োরকে পেয়েছিল এবং রেবতী নন্দকিশোরতুল্য নয়, তাই নীলা তাকেও সম্পূর্ণভাবে আশ্রয় করে না! বহু পুরুষকে আশ্রয় করাই তার স্বভাবধর্ম। এই ধর্মের কারণেই রেবতীর মেকিত্ব ধরা পড়েছে। খুব অল্প আয়াসেই রেবতীকে সাধনাভ্রষ্ট করা গেছে। নীলার approach নঞর্থক, কিন্তু ফলাফল সদর্থক।

বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ এ গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন--"কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে কেন যে, মেয়েরা পুরুষের ইস্পিরেশন জাগাতে পারে। আমার সবই জানা আছে। পুরুষের খোরাকে আমিষ পর্যন্ত ভালোই চলে, কিন্তু মদ ধরালেই সর্বনাশ।"

অথবা, "আমি শাস্ত্র মিলিয়ে পতিব্রতাগিরি করতে বসিনি। .....আমার মধ্যে যে রত্ন আছে সে একা ওঁরই কণ্ঠহারে দোলবার মতো, আর কারও নয়।"

এ গল্পের সেরা চরিত্র সোহিনী—শুধুমাত্র নারীত্বের জোরে আলোকিত। পতিব্রত্যের এক নতুন ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে তার মধ্যে। সমাজসংসারে এমন চরিত্র দুর্লভ হোক না হোক, সাহিত্যসংসারে এমনটি লাখে এক।

২.৩ নন্দকিশোরের গুঢ়ার্থ

নন্দকিশোর 'ল্যাবরেটরি' গল্পের মূল প্রবক্তা। যদিও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে যে কোন এক দুঃসাহসিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় তিনি অপঘাতে মারা গেছেন, তবু তিনি গল্পের সর্বত্রই ছড়িয়ে আছেন তার কাজের মাধ্যমে। তিনি ল্যাবরেটরির স্রষ্টা এবং সেই ল্যাবরেটরিকে কেন্দ্র করেই গল্প বিবর্তিত হয়েছে। নন্দকিশোর নেই, কিন্তু তার স্বপ্ন, তার অভীপ্সা-স্মৃতিরূপে সর্বত্রই বিদ্যমান। সোহিনী নন্দকিশোরের আরকর্ম নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। স্বামীর স্মৃতি ল্যাবরেটরিকে সে প্রাণ দিয়ে আগলে আছে। সে নিজে বৈজ্ঞানিক নয়, তাই ল্যাবরেটরির কাজকর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করা তার পক্ষে অসম্ভব বলেই সে এমন। একজন বৈজ্ঞানিককে ল্যাবরেটরির কর্মকর্তায় অধিষ্ঠিত করতে চেয়েছে, যাতে তার স্বামীর স্মৃতি চির অম্লান থাকে। তার নির্বাচনে ভুল হতে পারে, কিন্তু রেবতী যে কর্মকর্তার পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্যতম ব্যক্তি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

গল্পকথক বলেছেন নন্দকিশোর ওকে যে-দশা থেকে নিয়ে এসেছিলেন সেটা খুব নির্মল নয়, এবং নিভৃত নয়। সোহিনীর চরিত্রের এটি একটি ইঙ্গিত। এর অর্থ সোহিনী যেমন পতিতা ছিল, তেমনই ছিল বহু পরিচর্যাকারিণী। ছত্রী জাতের মেয়ে সোহিনীর এটা ছিল বাহ্যরূপ। তার জীবনে নিভৃতির অভাব বোধটাই এর একমাত্র কারণ। সোহিনীর জীবনে এই নিভৃতিটারই প্রয়োজন ছিল। পাঁকে পদ্ম ফোটে, কিন্তু পাকের দুর্গন্ধ সে বহন করে না। জবালার মতই। সে মনেপ্রাণে শুচি। জবালার যেমন বলতে বাধেনি।

"যৌবনে দারিদ্রদুখে

বহু পরিচর্যা করি পেয়েছিনু তোরে।

জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে

গোত্র তব নাহি জানি তাত।”

সোহিনীও তেমনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছে,

“আজন্ম তপস্বিনী নই আমরা, ভড়ং করতে করতে প্রাণ বেরিয়ে গেল মেয়েদের দ্রৌপদী কুন্তীদের সেজে বসতে হয় সীতা সাবিত্রী।”

সে আরও বলেছে “ছেলেবেলা থেকে ভালোমন্দবোধ আমার স্পষ্ট ছিল না। কোন গুরু আমায় তা শিক্ষা দেয়নি। তাই মন্দের মাঝে আমি ঝাঁপ দিয়েছি সহজে, পারও হয়ে গেছি সহজে। গায়ে আমার দাগ লেগেছে, কিন্তু মনে ছাপ লাগেনি” তাই সে নিজের মেয়ে নীলাকে জবালার মতই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে পেরেছে,

“কে তোর বাপ, কার সম্পত্তির শেয়ার চাস, এমন লোকের তুই মেয়ে একথা মুখে আনতে তোর লজ্জা করেনা?” সোহিনীর জীবন পবিত্র নয়, নন্দকিশোরের প্রশ্নের উত্তরে তাই সে বলতে পেরেছে,

“চিড়িয়াখানার কোন দরকার নেই। যাদের ভিতরে রাখবার, তারা বাইরে সব ছাড়া আছে, আমি তাই মানুষ খুঁজছি।” সোহিনীর মতে নন্দকিশোরের মধ্যেই রয়েছে সেই মানুষ যার কাছে ফাস কলে পড়ে যায় গলায় মোটা সোনার চেনওয়ালা শেঠজির। নন্দকিশোরের ভুল হয়নি, সে সোহিনীকে চিনে নিয়েছে তার ভিতরে ঝঝকে ক্যারেক্টারের তেজ দেখে। পশ্চিমী ছাঁদের সুকঠোর ও সুন্দর দেহ দেখে ভোলবার মানুষ সে নয়। জীবনে বহু ঘাতপ্রতিঘাত অতিক্রম করে উঠে আসতে হয়েছে তাকে। রেলে কাজ করার সময় বিরাট ইমারত, এবং চাকরী যাওয়ার পর রেল কোম্পানীর পুরোনো লোহালক্কর সস্তাদামে কিনে বিরাট কারখানা তৈরি, ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি, ল্যাবরেটরি স্থাপন এ সবের মূল লক্ষ্যই হল একালের ছেলেদের টেক্সটবুকের শুকনো পাতা হাঁটকানোর পরিবর্তে হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া। তার পণ হল,

“ক্ষমতা আছে আমাদের মগজে, অক্ষমতা আমাদের পকেটে, ছেলেদের জন্যে বিজ্ঞানের বড় রাস্তাটা খুলে দিতে হবে বেশ চওড়া করে।”

এর জন্য দেশ-বিদেশের মূল্যবান যন্ত্রপাতি এনে সাজিয়েছেন তার ল্যাবরেটরি। মৃত্যুর চিন্তা কি নন্দকিশোরের মনে উঁকি দিত? তার অবর্তমানে কি হবে ল্যাবরেটরির ? কে তা দেখভাল করবে। মনের কোণে এমন চিন্তা খুব স্বাভাবিক। সোহিনী যেমন খুঁজে পেয়েছে রেবতীকে নন্দকিশোরও খুঁজে পেয়েছিলেন সোহিনীকে। সোহিনীর নির্বাচনে ভুল ছিল, কিন্তু নন্দ কিশোরে বেলায় তা হয়নি। সোহিনী তাকে বুঝিয়েছে তাদের উভয়ের জন্ম ছকে রয়েছে। শয়তানের দৃষ্টি। এই শয়তান জাতককে টেনে উপরে তোলে, কথার খেলাপ না করা পর্যন্ত তাকে ছাড়ে না। সে বলেছে।

"অনেক পুরুষকেই আমি ভুলিয়েছি, কিন্তু আমার উপরেও টেক্কা দিতে পারে এমন

পুরুষ আজ দেখলুম। আমাকে তুমি ছেড়ো না বাবু, তা হলে তুমি ঠকবে।" নন্দকিশোর ঠকেনি। সাত হাজার টাকা আইমাকে দিয়ে কিনে নিয়েছিলেন সোহিনীকে। প্রথাগত ভাবে তাদের বিয়ে না হলেও সোহিনী হয়ে ওঠে স্বামী নন্দকিশোরের অনুব্রতা। নিজের বিদ্যায় নন্দকিশোর স্ত্রীকে তালিম দিয়েছে যাতে তার অবর্তমানে তার আরদ্ধ কর্ম পরিচালনায় দক্ষ হয়ে ওঠে। একেই বলা হয়েছে নন্দকিশোরী' করা। চণ্ডীতে বলা হয়েছে। 'ভার্যাং মনোরমাং দেহিমনোবৃত্ত্যানুসারিনীম'।নন্দ কিশোরের মতে মনোবৃত্তির অনুসরণকারিণী সীই সবর্ণা। বিপরীতটা মানবধর্ম নিষিদ্ধ। সোহিনীর সমস্ত আসক্তিকে তিনি হোম চিতানলে ভস্মীভূত করেছেন। নন্দকিশোরের ল্যাবরেটরিই সেই হোমানলে।

নন্দকিশোর ও সোহিনী উভয়েই এ বিষয়ে নিষ্কাম। ল্যাবরেটরি স্থাপনের জন্য নন্দকিশোর যেমন নিষ্কাম হয়ে রেলের টাকা চুরি করেছেন, সেই ল্যাবরেটরিকে বাঁচিয়ে রাখতে সোহিনীও নিষ্কাম ভাবে নারীত্বকে বিসর্জন দিয়েছে, নারীর মোহজাল বিস্তার করে ল্যাবরেটরিকে আশু বিপদের হাত হতে রক্ষা করেছে। এমনকি নিজের মেয়ে নীলার জন্মবৃত্তান্তের সত্য প্রকাশেও কুণ্ঠিত হয়নি। মানবমনের স্বাভাবিক বৃত্তিতে সে স্বৈরিণী, কিন্তু চিত্তধর্মে নন্দকিশোরের অনুব্রতা—এক কথায় নন্দ কিশোরী।

২.৪ মেট্রিয়ার্কি রেবতীর রক্তে

রেবতী ভট্টাচার্য জন্মমাত্রেই মাতৃহারা, তাই আচারপরায়ণা এক পিসির তত্ত্বাবধানে বড় হয়েছে। বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে উচ্চস্থানাধিকারী এবং সায়েন্সের ডক্টরেট। বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে রেবতী শ্রেষ্ঠ হলেও ব্যক্তিগত জীবনে পিসির নির্দেশের বাইরে আর হাঁটার শক্তি নেই। এক কথায় সে সর্বতোভাবে পিসির উপর নির্ভরশীল। প্রফেসর চৌধুরী রেবতীর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, "রেবতীর বুদ্ধির ডগার উপরে চড়ে বসে আছে একটি রীতিমত মেয়ে। এই প্রসঙ্গেই মিসেস মল্লিককে জিজ্ঞাসা করেছেন 'জান মেট্রিয়ার্কাল সমাজ কাকে বলে? যে সমাজে মেয়েরাই হচ্ছে পুরুষের সেরা। এক সময়ে সেই দ্রাবিড়ি সমাজের ঢেউ বাংলা দেশে খেলত।"

মেট্রিয়ার্কি বা মাতৃতন্ত্র বাংলাদশেই যে শুধু আবির্ভূত হয়েছিল তা নয়, কৃষি আবিষ্কারের প্রথম যুগটাই ছিল মাতৃতন্ত্রের যুগ, তাই এর ব্যাপ্তি ছিল বিশ্বব্যাপী। প্রকৃতির উৎপাদনশীলতা এবং নারীর উৎপাদনশীলতার মধ্যে সাদৃশ্য পর্যবেক্ষণ করে আদিম জনগোষ্ঠী নারীকে প্রকৃতির প্রতীকে পরিণত করল। এর পর হতেই সামগ্রিক জনজীবনের অস্তিত্ব রক্ষার দায়িত্ব নারীর হাতে এসে পড়ে। এই ভাবেই মাতৃতন্ত্রের বিকাশ ঘটে। মাতৃতন্ত্রের প্রধান লক্ষণই হল যৌথ বিবাহ। শারীরিক দিক হতে অপটুতা, প্রসবকালীন মৃত্যু, ইত্যাদি কারণে আদিম সমাজে নারীর সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় একাধিক পুরুষ একটি নারীকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়। সংসারে কত্রী হলেন নারী এবং স্বামীরূপ পুরুষেরা সকলেই তার পরিবারের সদস্য। মাতৃতন্ত্রের বিশদ গবেষণা করেছেন R. Briffault, G. Thomson, R. G. Bhandarker, এবং দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। তারা সকলেই বলেছেন যে, বহু স্বামীর অনুগমনকারিণী নারীর গর্ভস্থ সন্তানের পিতৃপরিচয় নির্ধারণ করা সহজসাধ্য ছিলনা বলেই মা এর দিক হতে বংশ পরিচয় নির্ণয়ের প্রথা সৃষ্ট হয়। রাবণের পিতার নাম বিশ্বশ্রবা, কিন্তু রাবণের পরিচয় নিকসাতনয় নৈকষের রূপে। এমনকি মহাভারতের কুন্তীও মাতৃপ্রাধান্য হতে আসা নারী বলেই দ্রৌপদীর স্বামীরূপে পঞ্চপুত্রকে চিহ্নিত করেছিলেন। অর্থনীতিবিদেরা মনে করেন যে সন্তানের জন্মদান ও লালন-পালনের দায়িত্ব যেহেতু নারীর, সন্তানের

মানসিক সংগঠন, দৈহিক শক্তির বিকাশ, এবং পরিবেশের সঙ্গে সন্তানের সমঝোতা করানোর দায়িত্ব যেহেতু নারীর, সন্তান সে কারণে তার মাকেই চিনত, পিতাকে নয়। এই ভাবেই সমাজ ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এল নারী। প্রাণী সমাজেও মাতুপ্রভাব অক্ষুন্ন। পুরুষ প্রাণীটি মিলনের পরেই অরণ্যে হারিয়ে যায়। স্ত্রী প্রাণীটি সন্তানের জন্মদান ও তার লালন পালনের দায়িত্ব পালন করে।

Bishop Coldwell, Dr. Macleane এবং Sir H. Risley প্রমুখ গবেষকেরা মনে করেন যে ভারতীয় বহু আদিম উপজাতির মতই দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়ি সংস্কৃতি পরিপূর্ণ ভাবে মাতৃতান্ত্রিক। (The Social System of the Dravidians was matriarchial)। মাতৃপুজাও তন্ত্রের আদিম ভিত্তিভূমিই হল দ্রাবিড়ি সংস্কৃতি। যে-কোন ভাবেই হোক বাংলাদেশ এই মাতৃতন্ত্রের তরঙ্গে আন্দোলিত হয়েছিল। মাতৃপূজা, লিঙ্গপূজা, সর্পপূজা এসবই দ্রাবিড় সংস্কৃতি হতে আমদানী। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান বলেই তন্ত্র প্রভাবান্বিত এবং দেবতাদের চেয়ে দেবীদেরই অধিক প্রাধান্য। এখানে দেবীমাহাত্ম নবভাবে উদ্ভাসিত। দেবী পার্বতী একগুঁয়ে শিবকে ভীত করার জন্য ধারণ করলেন দশমহাবিদ্যারূপ। জগৎ প্রসবকারণে তিনি ব্রহ্মাণী, সংহার কত্রীরূপে মাহেশ্বরী ও পালয়িত্রীরূপে নারায়ণী। নারীর মধ্যেই তার অবস্থান বলেই স্বীয়া সমস্ত সকলা জগৎসু। বাংলাদেশে কৃষ্ণ কথা রাধাকে ঘিরে এবং শক্তিকে ঘিরে গড়ে উঠেছে শাক্ত সমাজ। দক্ষিণ ভারতীয় দ্রাবিড় সংস্কৃতির সঙ্গে বঙ্গ সংস্কৃতির মিল অত্যন্ত প্রকট বলেই ল্যাবরেটরি গল্পে প্রফেসর চৌধুরী দ্রাবিড়ি সংস্কৃতির ঢেউ বাংলাদেশে খেলত বলে মন্তব্য করেছেন।

প্রফেসর চৌধুরীর কথাতেই জানা গেছে যে বদরিকাশ্রমে একটা রিসার্চের বিষয়ে রেবতীর যাওয়ার প্রয়াোজন পড়ে। কিন্তু পিসির পিসি ঐ বদরিকাশ্রমের পথে মারা যায় বলে, পিসির নির্দেশে রেবতীর পাহাড় পর্বতের দেশে যাওয়া নিষেধ হয়ে যায়। সরকারী বৃত্তি নিয়ে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের বিষয়েও প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায় ঐ পিসি। তার ভয় বিলাত গেলেই রেবতী মেম বিয়ে করবে। তাই তিনি একেবারে মারণ অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। “ছেলে যদি বিলাত যায় তাহলে গলায় দড়ি দিয়ে মরব।”

রেবতীর বিলাত যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। এখন সে "ভারতীয় ঘানিতে ফোটা ফোটা তেল বের করছে।" বাঙালীর রক্তে মেট্রিয়ার্কির বীজ আছে বলেই বাঙালী সন্তানেরা এত মাতৃভক্ত। মা-মা ডাকের মধ্যে তাদের মেধাশক্তি হারিয়ে যায়। রেবতীর মেধা আছে কিন্তু তা পিসির তত্ত্বাবধানের বাইরে নয়। বাল্যকালে ইস্কুল হতে ফিরতে রেবতীর পাঁচ মিনিট দেরি হলে, পঁচিশ মিনিট লাগত তার জবাবদিহি করতে।

সোহিনীর এই রেবতীকেই চাই। সে বলেছে, "এই ল্যাবরেটরিতেই হয়েছে আমার স্বামীর সাধনা। তার ঐ বেদীর তলায় কোন একজন যোগ্য লোককে বাতি জ্বালিয়ে রাখবার জন্য যদি বসিয়ে দিতে পারি, তাহলে যেখানে থাকুন তার মন খুশি হবে।"

রেবতী সেই যোগ্য লোক বলেই সোহিনী তাকে ভোলাবার জন্য মেয়ে নীলাকে নিয়ে হাজির হল বোটানিক্যালে। মনে হতে পারে সোহিনী এখানে যেন বৃন্দা দূতী কিম্বা অতনু। মেয়ে নীলার রূপ যৌবনের দ্বারা সে চেয়েছে রেবতীর তপোভঙ্গ করতে। আপাতদৃষ্টিতে তা মনে হলেও তার সত্যকার উদ্দেশ্য হল টান মেনে নিয়ে টান এড়িয়ে চলার দক্ষতা পরীক্ষা করা। কিন্তু সে পরীক্ষায় রেবতী সফল হতে পারেনি। সোহিনী বুঝেছে যে ফলাফল ল্যাবরেটরির পক্ষে ভালো হলেও, শেষ পর্যন্ত তা টিকবে না। নীলার আকর্ষণে রেবতী স্থানচ্যত হবেই। তার বিজ্ঞানসাধনা বিনষ্ট হবে। তাই সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে নীলা ও রেবতীর মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক যাতে না ঘটে, তারই জন্য ল্যাবরেটরি হবে জনসাধারণের সম্পত্তি এবং যে ট্রাস্টির হাতে এর পরিচালনার দায়িত্ব থাকবে—রেবতী হবে তার প্রেসিডেন্ট। ল্যাবরেটরির মধ্যে গবেষণারত রেবতীকে বিরক্ত করা নীলার নিষেধ। এসময় সোহিনীকে যেতে হয় মৃত্যু পথযাত্রিণী আইমার কাছে আম্বালায়। কিন্তু যাবার পূর্বে সে চারজন শিখ সিপাহী নিয়োগ করল ল্যাবরেটরির প্রহরায়। নীলাকে বারংবার নিষেধ করে গেল ল্যাবরেটরিতে প্রবেশ করে রেবতীকে বিরক্ত না করার জন্যে।

সোহিনী আম্বালায় চলে যেতেই নীলা ল্যাবরেটরিতে এসে তার যৌবন মত্ততার পসরা খুলে ধরেছে। রেবতী যেন বিড়ালের মুখে ইঁদুরের মত। তার বাধা দেওয়ার কোন ক্ষমতাই নেই। সে বাধ্য ও অনুগতের মতই জাগানী ক্লাবের সভ্যপদে সই করে

দিয়েছে। তার মধ্যে পৌরুষের অভাববোধটা দারোয়ানের চোখেও প্রকট হয়ে উঠেছে। রেবতীর চরিত্রে কোন দৃঢ়তা নেই। পিসির তত্ত্বধানে সে লেখাপড়া করেছে বাধ্য ছেলের মত পিসির কেটে দেওয়া। গণ্ডির বাইরে সে কোনদিন হাঁটেনি। বাস্তব জগৎ সম্পকে সে সম্পূণ অজ্ঞ। নীলার মোহ হতে মুক্তি পাওয়ার বা তার মোহকে অতিক্রম করা তাই তার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে। পরের দিনের চায়ের সভায় সে যাব না যাব না করেও হাজির হয়েছে। নীলার ব্যবস্থা মত সে জাগানী ক্লাবের প্রেসিডেন্ট হয়েছে এবং লতাবিতানের নিরালায় নীলাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

"রেবতীর আসল কাজ গেছে বন্ধ হয়ে। ছিন্ন হয়ে গেছে ওর সমস্ত চিন্তা সূত্র। মন কেবলই অপেক্ষা করছে নীলা কখন আসবে, হঠাৎ পিছন থেকে ধরবে ওর চোখ টিপে।" রেবতীর মধ্যে মেট্রিয়ার্কির বীজ ছিল বলেই কি সে নীলাকে অস্বীকার করতে পারেনি? এটা তত্ত্বের কথা। আসলে নীলাই তার কাছে প্রথম নারী। নীলার ছলনাকে সে ধরতে পারেনি কারণ তার বাস্তবুদ্ধির অভাব। সে টান মেনে চলতেই শিখেছে টান এড়িয়ে চলার কোন ক্ষমতাই তার নেই। পৌরুষ না থাকলেও পুরুষের ঈর্ষা আছে। ড্রয়িংরূম থেকে হালদার যখন নীলাকে আড়কোলা করে তুলে নিল এবং বাধা না দিয়ে নীলা যখন তার গলা জড়িয়ে ধরল, তার মনে ঈর্ষার ভাবের উদ্রেক হয়েছে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই, হালদারকে বাধা দেওয়ার সাহস তার হয়নি।

"হালদারের বাহুর জোর এবং অসংকুচিত অধিকার বিস্তারের তুলনায় নিজের বিদ্যাভিমান ওর কাছে আজ বৃথা হয়ে গেল।" রেস্তোরার সান্ধ্য ভোজে হঠাৎ হাজির হয়েছে সোহিনী। ল্যাবরেটরির চৌম্বকশক্তির পরীক্ষায় রেবতী ব্যর্থ। আজ আর সে বিজ্ঞানব্রতী ব্রাহ্মণ নয়, সোফায় বসা নীলার পায়ের তলায় অনুগত ভৃত্যের মত বসে আছে রেবতী। সমগ্র গল্পে পুনরাবৃত্ত হয়েছে গোরু নামক একটি প্রতীক। প্রফেসর চৌধুরী বলেছিলেন, "মেট্রিয়ার্কি রক্তের মধ্যে হাম্বাধ্বনি জাগিয়ে তোলে, হতবুদ্ধি হয়ে যায় বৎসরা।'জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তুমি কি রেবতীর হাতের বদলে খুর দেখতে পেয়েছ নাকি?" গল্পের শেষে সোহিনী বলেছে,

"এইবার আমার মেয়ে আমার ল্যাবরেটরিকে বাঁচিয়েছে। আমি লোক চিনতে পারিনি, কিন্তু আমার মেয়ে ঠিক বুঝেছিল যে ল্যাবরেটরিতে গোয়ালঘর বসিয়ে দিয়েছিলাম। গোবরের কুণ্ডে আর একটু হলেই ডুবত সমস্ত জিনিসটা।" অধ্যাপক চৌধুরীর কথায় আরও পরিস্ফুট হয়েছে যে রেবতীর বিদ্যা আছে, কিন্তু বাস্তব। বুদ্ধিহীন নীলার বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়ে রেবতী আবার তার কর্মে ফিরতে পারবে। নীলাকে হতে হবে গয়লানী। রেবতীর বিদ্যারূপ দুগ্ধকে নিংড়ে বের করে নেওয়ার দায়িত্ব তার। কিন্তু রেবতী গোবৎসের মতই। সোহিনীর সামনেই যে নীলাকে বিয়ে করার সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, পিসিমার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তা বিলীন হয়ে গেল। গাভী মাতাকে দেখে গোবৎস যেমন হাম্বাধ্বনি তুলে ছুটে যায়, রেবতীও তেমন ভাবেই পিসির পিছনে পিছনে স্থান ত্যাগ করেছে। একবারও ফিরে তাকায়নি। পিছনে পড়ে রইল নীলা, সোহিনী ও প্রফেসর চৌধুরী এরা সবাই যেন এই মেট্রিয়ার্কির ধারায় ভেসে গেল। জয় হল পিসিমার, জয় হল মেট্রিয়াকির। রেবতী অক্ষম নয় ঠিকই, কিন্তু তার বিদ্যা থাকলেও বুদ্ধি নেই, জীবন থাকলেও চরিত্রের পৌরুষ নেই। আকৃতিতে সে মানুষ হলেও, মানব চরিত্রের কোন দৃঢ়তা নেই। আদ্যন্ত সে বোকা বলেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। টান এড়িয়ে চলার কোন ক্ষমতাই তার নেই।

২.৫ সোহিনী ও নীলাঃ নারীর দুইরূপ

সোহিনী ও নীলামাও মেয়ে তবু উভয়ের মধ্যে বৈসাদৃশ্যটাই সর্ববৃহৎ, এরা একে অপরের বিপরীত। প্রথম জনের বাল্যজীবন রহস্যাবৃত, দ্বিতীয় জনের জন্মবৃত্তান্ত রহস্যাবৃত, প্রথম জন গড়তে চায়, ল্যাবরেটরিকে রক্ষা করতে চায় এবং ল্যাবরেটরির সুপরিচালনার জন্য সদাই চিন্তিত, দ্বিতীয় জন ভাঙন ধরানো মেয়ে সোহিনীর ভাষায় মদের পাত্র কানায় কানায় ভরা।

মা ও মেয়ে-মন যেমন তাদের পরস্পর বিপরীতমুখী, সংসার জীবনে চলার পথটাও তাদের এক নয়। সোহিনী আবাল্য স্বৈরিণী হলেও নন্দকিশোরের অনুগামী, উভয়ের মানসিক মিলনে নন্দকিশোরের আদর্শই তার আদর্শ। সেই আদর্শকে রক্ষা করতে

সোহিনী দেহকে ব্যবহার করেছে বটে, কিন্তু তার মনে কোন দাগ পড়েনি। বাসনা বা চিত্তবিক্ষেপের কোন কারণ ঘটেনি বলেই সে চৌধুরীকে বলতে পেরেছে,

"ছেলেবেলা থেকে ভালোমন্দ বোধ আমার স্পষ্ট ছিলনা। কোন গুরু আমায় তা শিক্ষা দেননি। তাই মন্দের মাঝে আমি কঁপ দিয়েছি সহজে, পারও হয়ে গেছি সহজে। গায়ে আমার দাগ লেগেছে কিন্তু মনে ছাপ লাগেনি। কিছুই আমাকে আঁকড়ে ধরতে পারেনি। গাই হোক, তিনি যাবার পথে তার চিতার আগুনে আমার আসক্তিতে আগুন লাগিয়ে/দিয়েছেন, জমা পাপ একে একে জ্বলে যাচ্ছে। এই ল্যাবরেটরিতেই জ্বলছে সেই হোমের আগুন।"

কিন্তু নীলার জীবনে নন্দকিশোরের মত পুরুষের আবির্ভাব ঘটেনি। সে ছেলেবেলা থেকেই স্বেচ্ছাচারী স্কুলে পাঠকালীন সে মাড়োয়ারী তনয়কে বিয়ে করে। কিন্তু এ দাম্পত্য বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। টাইফয়েডে স্বামীর মৃত্যুর পরই যে মুক্ত হয়, মেয়ের ছটফটানি দেখে মার মনে পড়ত প্রথম বয়সের জ্বালামুখীর অগ্নিচাঞ্চল্য। মেয়েকে শাসনে বাঁধতে চাইলেন মা। পাত্রের খোঁজ চলতে লাগল। এমন সময় এসে পড়ল রেবতী। রেবতীকে জামাই করে ল্যাবরেটরিতে পাকাপাকি ভাবে যুক্ত করে দেওয়ার মনোগত বাসনা নিয়েই বোটানিক্যালে রেবতী সন্নিধানে গিয়েছিল সোহিনী। কিন্তু রেবতীকে দেখে ও তার সঙ্গে কথা বলে সোহিনী নিশ্চিত হল যে পৌরুষের ম্যাগনেটিজম রেবতীর মধ্যে নেই। নৈর্ব্যক্তিক জ্ঞান-চর্চায় সোহিনীর মতই নীলাও যে ভুলে থাকবে—তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তখনই সে পূর্বসিদ্ধান্ত বদল করেছে। ল্যাবরেটরিকে জনসাধারণের সম্পত্তি ঘোষণা করে রেবতীকে তার প্রেসিডেন্ট করতে চেয়েছে এবং রেবতীর ধারে কাছে নীলার গমন নিয়ন্ত্রিত করেছে। সোহিনী বলেছে,

"বিদ্যার পথে মানুষকে উদ্ধার করার দীক্ষা তিনি আমাকে দিয়ে গেছেন। বলে গিয়েছেন যেন মেয়ে জামাইয়ের গুমর বাড়াবার জন্যে তার জীবনের খনি খোড়া রত্ন ছাইয়ের গাদায় হারিয়ে না ফেলি।"

মাতৃনিয়ন্ত্রণে থেকে নীলা প্রায় বেপরোয়া হয়েই হাইয়র স্টাডি সার্কেলে ভর্তি হওয়ার জন্য মাকে যুক্তি দেখায়, বলে,

"জগৎসংসারে লোক চলাচল তত বন্ধ হবে তোমার খাতিরে। আর তাদের সঙ্গে আমার জানাশুনো একেবারেই ঠেকিয়ে রাখবে যে, সে আইন তো তোমার হাতে নেই।"

সোহিনীকে রাজী হতে হয়, তবে একটা শর্তে এবং রেবতীর ধারে কাছে না যাওয়ার শর্তে নীলা দ্বার্থহীন ভাষায় জবাব দিয়েছে,

"ঐ স্টাইলের পুরুষকে নিয়ে আমার চলবে না। যেসব মেয়েরা ভালোবাসে বুড়ো খোকাদের মানুষ করতে, ওকে জিইয়ে রেখে দেওয়া ভালো তাদেরই জন্যে। ও মারবার যোগ্য শিকারই নয়।" মোতিগড়ের রাজকুমারকে বিয়ে করার প্রস্তাব মেনে নিলেও সোহিনী নীলাকে একটুও বিশ্বাস করেনি। বিশ্বাস করেনি বলেই চৌধুরীকে কোমরবন্ধ হতে ছুরি বের করে বলেছে—

"আমি পাঞ্জাবের মেয়ে, আমার হাতে ছুরি খেলে সহজে.....আমি বাঙালীর মেয়ে নই, ভালোবাসা নিয়ে কেবল চোখের জল ফেলে কান্নাকাটি করিনে ভালোবাসার জন্যে প্রাণ দিতে পারি, প্রাণ নিতে পারি। আমার ল্যাবরেটরি আর আমার বুকের কলিজা, আর মাঝখানে রয়েছে এই ছুরি।"

সোহিনী আম্বালায় চলে যাওয়ার পরই পিঙ্গলবর্ণা, শ্বেত ও নীল পদ্মের আভায় উদ্ভাসিত যৌবনবতী নীলার উছুঙ্খল আচরণ সকল সীমা অতিক্রম করল। কানপ্রকার লজ্জা শরমের বালাই তার নেই। যৌবন মদমত্ত করে তুলেছে রেবতীকে-তাকে সরিয়ে নিয়ে গেছে তার। সাধনার পথ থেকে জাগানী ক্লাবের প্রেসিডেন্ট করার আছিলায় তাকে বানিয়েছে গোবৎস। তার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে, তাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারই সামনে হালদারের বক্ষলগ্ন হয়ে চলে গেছে ডায়মণ্ড হারবার। রেস্তোরার সান্ধ্যভোজে হঠাৎ হাজির সোহিনীর কাছে সে রেবতীর ব্যজস্তুতি করে মাকে আঘাত দিতে চেয়ে বলেছে, "মাথা পিছু পঁচিশ টাকা করে ধরে নেয়, মদ না খেলেও মদের দাম ধরে দিতে হয়। খালি গেলাসের জরিমানা কম লাগল না। আর কেউ হলে মুখ চুপসে যেত। ওঁর দরাজ হাত দেখে ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরের তাক লেগে গেছে। সিনেমার গাইয়েকে কত দিতে হয়েছে জানো? তার এক রাত্তিরের পাওনা চারশো টাকা।"

এর পরেই মাও মেয়ের মধ্যে তর্কাতর্কি শুরু হয়, নীলা যখন বলে, "বাবার অতখানি টাকায় তার মেয়ের কোন শেয়ার থাকবেনা, এটা অস্বাভাবিক।" এরপরেই সোহিনী দৃপ্ত কণ্ঠে নীলার জন্মরহস্য প্রকাশ করে বলে যে সে নন্দকিশোরের মেয়ে। নয় বলেই, নন্দকিশোরের টাকায় তার কোন শেয়ার থাকতে পারে না। এরপরই নীলা একেবারে চুপসে গেছে, কিন্তু তার সবচেয়ে বড় আঘাত হল রেবতীর সব কিছু ভুলে গিয়ে পিসির পিছনে অন্তর্ধান হয়ে যাওয়াই এ তার যৌবন মদমত্ততার পরাজয়।

গল্পশেষে মা ও মেয়ে উভয়েই ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। সোহিনী ভেবেছে যে রেবতীর নির্বাচনে তার ভুল তার মেয়ে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। রেবতী যে কতখানি অযোগ্য তা তার অপসারণই একথা প্রমাণ করে। ল্যাবরেটরিকে ধ্বংসের পরিণতি হতে বাঁচিয়েছে তার মেয়ে। আর নীলা ভেবেছে রেবতী বুড়ো খোকা, নীলার যৌবন তার কাছে কোন মুল্য পায়নি তার পিসির নির্দেশে। তার মধ্যে পৌরুষের ম্যাগনেটিজম তত দূর অস্ত, তার চরিত্রে কোন পৌরুষত্ব নেই।

উভয়ের ভাবনা সূত্র ভিন্নার্থক হলেও পরিণামে এক।

২.৬ অনুশীলনী

১। ছোটগল্প হিসেবে 'ল্যাবরেটরি'র গল্পটির সার্থকতা বর্ণনা করো ।

২। নন্দকিশোর চরিত্রটি আলোচনা করো।

৩। রেবতী চরিত্রটি কতদূর রবীন্দ্র মানসিকতা বহন করেছে ব্যাখ্যা কর।

৪। সোহিনী চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করো

৫। অনিলা ও নীলা - নারীর দুই রূপ এর তুলনামূলক আলোচনা করে একটি প্রবন্ধ রচনা করো।

২.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১। গল্পগুচ্ছ রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ - বামা পুস্তকালয়

২। রবীন্দ্র কথা কাব্যেরশিল্প সূত্র - সুখরঞ্জন রায়

৩। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প - প্রমথনাথ বিশী

৪। রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ -তপোব্রত ঘোষ

৫। রবীন্দ্র ছোটগল্প আলোচনার আলোকে - অশোককুমার কুণ্ডু (সম্পাদিত)

একক ৩ বাংলা ছোটোগল্পে তারাশঙ্কর

বিন্যাসক্রম

৩.১ সাধারণ আলোচনা

৩.২ অনুশীলনী

৩.৩ গ্রন্থপঞ্জী

৩.১ সাধারণ আলোচনা

যে কোনো ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের ন্যায় বাংলা ভাষা-সাহিত্যের ইতিহাস মূলত বাঙালির আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ইতিহাস। প্রাকৃতের বন্ধন থেকে মুক্তির মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার স্বাতন্ত্রধর্মী পরিচয়ের যে প্রকাশ চর্যাপদে সংলক্ষ এবং যা প্রাচীন পটভুমি ও মধ্যযুগীয় জীবনভাবনাকে অতিক্রম করে উনিশ শতকের আধুনিক কালপর্বে স্বতন্ত্র এক সৃষ্টির গৌরবে উজ্জ্বল সেই বাংলা সাহিত্যের অন্যতম ফসল হলো ছোটগল্প। অন্যান্য দেশের ছোটগল্পের ন্যায় বাংলা ছোটগল্প অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের ফসল। মধ্যযুগীয় জীবনভাবনার সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে উনিশ শতকে বাঙালির সমাজমানস যে নতুনতর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিল বাংলা ছোটগল্পে তার জীবনদর্শন উচ্চারিত। পাশ্চাত্যে সামন্ততান্ত্রিক জীবনব্যবস্থার সঙ্গে যন্ত্রসভ্যতার অভিঘাতের ফলে পালাবদলের সূচনায় সাহিত্য যেমন নতুন পথসৃষ্টিতে উন্মুখর হয় তেমনি উনিশ শতকে পাশ্চাত্য সাহিত্য সংস্কৃতির অভিঘাতে বাংলা সাহিত্যও আপাত আধুনিক ও অভিনবরূপ-বৈচিত্র্যে ক্রমবিকশিত হতে থাকে। বাঙালির মন ও মানস আধুনিকতার পরিগ্রহণের মাধ্যমে সাহিত্যের যে কটি শিল্পরূপকে জীবনজিজ্ঞাসার অন্যতম মাধ্যমরূপে গ্রহণ করলো তার মধ্যে ছোটগল্প অন্যতম। উনিশ থেকে বিশ শতকীয় জীবনবোধেরও অভ্রান্ত প্রকাশ ছোটগল্প জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির গভীরতার ও প্রকরণগত বৈচিত্র্যে বাংলা ছোটগল্প সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে

বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার যে স্ফুরণ সেখানেও ছোটগল্পের পদধ্বনি। জীবনসম্পৃক্ত বাংলা ছোটগল্পের কাল তারুণ্যের দীপ্তিতে, যৌবনের উজ্জ্বল উন্মাদনায়, শিল্প কারখানায় পরিবেশগত বৈচিত্র্যে, নতুন বিষয়বস্তুতে, আঙ্গিক ও জীবনদৃষ্টিতে, গ্রাম ও সহরকেন্দ্রিক জীবনকে আশ্রয় করে অবাধ গতিতে অগ্রসরণে এক অনাস্বাদিতপূর্ব জগতের সন্ধান দিয়েছে একালের পাঠকসমাজকে। প্রথম মহাযুদ্ধ বাংলাদেশ থেকে বহু দূরবর্তী অঞ্চলে সংঘটিত হলেও বাংলা সাহিত্যে তার পরোক্ষ অনুপ্রবেশ ঘটে। বিশ্বযুদ্ধজনিত মূল্যবোধের বিপর্যয়ে পারিবারিক সম্পর্কের টানাপোড়েন, ব্যক্তিত্বের সংকট ইত্যাদি ত্রিশোত্তর কালের বাংলা সাহিত্যেকে প্রভাবিত করেছে এবং 'কল্লোল' (১৯২৩) ও 'কালিকলম' (১৯৩৩) তার প্রচ্ছদপটকে পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছে। অবশ্য একথা ঠিক যে, 'কল্লোল', 'কালি-কলম' পত্রিকায় বাংলা ছোটগল্প তার অভিনব জীবনচারণায় প্রকাশিত হলেও বাংলা ছোটগল্পের সার্থক প্রবর্তকরূপে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করতে হয়। কেননা, তার আশ্রয়েই বাংলা ছোটগল্প প্রথম পূর্ণতা লাভ করে।'গল্পগুচ্ছ' যুগের রবীন্দ্র গল্পের মধ্যে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জীবনভূমি পরিবর্তিত হয়েছে। শিল্পীর জীবনদৃষ্টি অনাবিষ্কৃত জগতে প্রবেশাধিকার লাভ করে বাঙালী জীবনের নবতম স্বাদ সন্ধান করেছে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তার পরিচায়নের সূত্রে বলেছেন—"আমি যে ছোট ছোট গল্পগুলো লিখেছি, বাঙালী সমাজের বাস্তব জীবনের ছবি প্রথম তাতেই ধরা পড়ে। বঙ্কিম-যুগের আবেগপুষ্ট রোমান্স ও নাগরিক আভিজাত্যের কল্পলোক থেকে গ্রামীণ বাংলার বস্তুঋদ্ধ জীবনভূমিতে নেমে এল বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাস। ছোট গল্পের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের জীবনমুখিতাই সাহিত্যে নবমুক্তির পথ রচনা করল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাংলাদেশের জনজীবনে গভীর ও ব্যাপক প্রভাব হানার ফলে বাংলাদেশের মানবসজগত গভীরভাবে আলোড়িত হয়। যুদ্ধের অভিঘাতে প্রচলিত সামাজিক- সাংস্কৃতিক - রাজনৈতিক – অর্থনৈতিক – ধর্মীয় ধ্যানধারণা ও মূল্যবোধ পরিবর্তিত হতে সুরু করে। অবশ্য এর সূচনা প্রথম মহাযুদ্ধ থেকেই, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তা শীর্ষে সমুন্নীত। মানুষ নিঃসঙ্গ নিরালম্ব হয়ে পড়ে; ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক

পরিবর্তনের ফলে সাহিত্য শিল্পসংস্কৃতির ক্ষেত্রে পবিবর্তমানতা অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। জীবনের বিপর্যস্ত মূল্যবোধ ও সমাজ - মানসের বিকারগ্রস্ত প্রকাশ অনিবার্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবন সম্পর্কে নতুন চেতনা ও প্রকরণগত পরিবর্তন ও অন্বিষ্ট হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ মধ্যকালীন এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর বাংলা ছোটগল্পের আঙ্গিকে এসেছে নতুনত্ব, ঘটেছে নানা স্বাদের সংযোজন, ইতিহাস - ভূগোলগত পটভূমির প্রসার ইতিহাসবৃত্তে আবর্তিত জটিল জীবনযন্ত্রণা ও তাকে আতক্রম করে জীবনের প্রার্থিত লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার কাঙ্ক্ষিত উদ্যোগ। একালের বাংলা ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য বস্তুনিষ্ঠ জীবনবোধ এবং সমাজের সম্পর্কে আত্মিক, বৌদ্ধিক সচেতনতা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের ইতিহাস ভাঙনের ইতিহাস, অত্যাবশক দ্রব্যসামগ্রীর রেশ ব্যবস্থা, মদ্রাস্ফীতি, যুদ্ধের ফলে অসদুপায়ে অর্জিত অর্থের পটভুমিত প্রতিষ্ঠত ধনিকশ্রেণী ,দর্ভিক্ষ, রাজনৈতিক আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশ ভাগ ইত্যাদি বাঙালীর ভাবজীবনে যে মর্মান্তিক দুঃখের দাবদাহ সৃষ্টি করেছে বাংলা ছোটগল্পে সেই মনুষ্যত্বহীনতার ভয়াবহ বিকত রূপ। নতুন জীবনচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ফ্রয়েড (১৮৭৭ - ১৯৩৯) ও ইয়ুং (১৮৭৫ - ১৯৬১)— কে কেউ আশ্রয় করেছেন; কেউ বা প্রগতিশীল চেতনা বিশেষত মার্কসবাদী দর্শনে সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হয়েছেন। অবশ্য শুধু যে জীবনকে ঘিরে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা, ভাঙন ও অসুস্থ মনোবিকার বাংলা ছোটগল্পের উপজীব্য। হয়েছে তা নয়, অতিপরিচিত জীবনের নতুন সম্ভাবনাপূর্ণ আলেখ্যও এখানে অনুপস্থিত নয়। মানবঅস্তিত্বের অন্তর্নিহিত বেদনাঘন উপলব্ধির কথাও এখানে উচ্চারিত। দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও সমস্যাকে এড়িয়ে গিয়ে বিনাশী শক্তির কাছে সমর্পণের আত্মবিধ্বংসী আকাঙক্ষ, অস্তিত্বের সংকটে সমস্যাতাড়িত জীবন থেকে পলায়নের প্রচেষ্টা, নরনারীর প্রেম সম্পর্কের মাহাত্ম্যকীর্তন, শ্রেণিসংগ্রামের উপকরণ, ব্যক্তিত্বের মুক্তি ইত্যাদি বাংলা ছোটগল্পকে যেমন বৈভবমণ্ডিত করেছে, তেমনি প্রকরণগত বৈচিত্র্যময়তার ব্যাপ্তিতে তাকে প্রোজ্জ্বল করেছে।

কল্লোলকেন্দ্রিক চেতনাকে অস্বীকার করে স্বাতন্ত্রধর্মী তারাশঙ্করের আবির্ভাব। পাশ্চত্ত্যমুখিনতাকে বরণ না করে, নিজস্ব দেশ সভ্যতা-সংস্কৃতির পারিপার্শ্বিকে জীবনের

সহজ ও স্বাভাবিক পরিচয়কে অবলম্বন করে সমাজের সম্পর্কে অভিজ্ঞ তারাশঙ্কর জীবনের আনন্দ - বেদনা - সঞ্জাত জীবনোপলব্ধির যে সাহিত্যিক প্রকাশ ছাোটগল্পে ঘটিয়েছেন তার জন্যে তিনি স্মরণীয়। প্রকাশিত প্রথম গল্প 'রসকলি ' থেকে সুরু করে অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত তার লেখনীতে ছোটগল্পের অমেয় জন্ম বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। জীবন পরিধির পরিবর্তমান স্রোত সম্পর্কে সচেতন তারাশঙ্কর বিশেষ কোনো মতবাদাশ্রিত প্রচারে অভিলষিত হন নি। বীরভূম অঞ্চলের প্রকৃতির বুকে উদ্দাম ও অসংস্কৃত জীবনধারা যেমন তাঁর রচনায় বিষয়, তেমনি মধ্য ও উচ্চবিত্তের কাহিনিও তাঁর গল্পে অনুপস্থিত নয়। এবং কালপ্রবাহে পরিবর্তনের স্রোতে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক জীবনব্যবস্থার ভাঙনের রূপও তাঁর রচনায় বিবৃত। তারাশঙ্করের সাহিত্যে সামন্তব্যবস্থার পাশাপাশি নতুন বণিকসভ্যতা, মহাযুদ্ধ - জনিত নৈতিকতা ও মূল্যবোধের পরিবর্তনকেন্দ্রিক জীবনব্যবস্থা তিনি অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে অঙ্কন করেছেন। তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত যন্ত্রণার রূপায়ণও তাঁর ছোটগল্পে সংলক্ষ। তারাশঙ্করের 'রসকলি', 'জলসাঘর', নারী', ও নাগিনী', 'অগ্রদানী', 'বেদেনী', 'ডাইনী', প্রভৃতি গল্পে এর প্রকাশ আছে। জলসাঘর' গল্পে 'বিলীয়মান স্বর্ণদিগন্ত', 'তারিণী মাঝি' গল্পে 'নিষ্ঠুর জীবনসত্যের রহস্য', 'নারী ও নাগিনী' গল্পে জৈব আসক্তির নতুন স্তর আবিষ্কার, 'কালাপাহাড়' গল্পে বলিষ্ঠ স্বাভাবিকতা, 'অগ্রদানী' গল্পে নির্মম নিয়তির অনিবার্যতা, 'বেদেনী' গল্পে অরুগ্ন বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্বরতা, 'ডাইনী' গল্পে ডাইনীরূপণী হতভাগিনী নারীর জীবন-ট্র্যাজেডির নির্মমতা, 'পৌষলক্ষ্মী' গল্পে মানুষের চিরন্তন ধর্ম ও তার পরিমাণ অপরূপ লিপিকুশলতার সঙ্গে অঙ্কিত। আধুনিক কালের জীবন-পরিধি ও পরিবেশকে তার সৃষ্টিকর্মে তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভারতের গ্রামজীবনের বাস্তবিক অভিজ্ঞতার রূপকরাও বটে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্যের যে বৈচিত্র্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের রূপান্তরের কাহিনিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠছিলো তারাশঙ্করের রচনায় তা অনুপস্থিত নয়। তার সাহিত্য সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ইতিহাসকে ধারণ করে আছে। প্রাচীন বিশ্বাসের পটভূমিতে শিথিলতার কালেও নতুন মূল্যবোধ গড়ে না ওঠার পর্যায়ে তারাশঙ্করের আবিতাব বলে যুগের নাড়ীর স্পন্দন তার শিল্পীমানসে নবতম যন্ত্রণার উদ্ভাসন

ঘটিয়েছিল। তারাশঙ্কর দায়িত্বসচেতন শিল্পী বলেই অতীতের ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগ রক্ষা করে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আলোকের সন্ধানে তৎপর হয়েছিলেন। পারিপার্শ্বিকতা সম্বন্ধে যে সচেতনতা শিল্পীকে দ্রষ্টার মহিমা দান করে, তারাশঙ্কর তার অধিকারী ছিলেন বলে তিনি পরিবর্তনের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে অতীতকে অস্বীকার না করে অতীতের জন্য যে বেদনানুভব করেছেন, সেখানেও মানব মহিমার প্রকাশ। তারাশঙ্কর তাঁর নিজস্ব কালকে স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তম কাল পরিধিতেও বিধৃত; মাবনতাবোধকেও এক বিশিষ্ট প্রকাশ তার শিল্পদৃষ্টির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তার গল্পে অন্ত্যজ শ্রেণির বিচিত্র পারিবারিক সামাজিক পরিচয়, ব্যক্তিমানুষের দ্বিধা - দ্বন্দ্ব, আশা - আকাঙ্ক্ষা, হিংসা দ্বেষ ইত্যাদির সাবলীল প্রকাশ। আপাতদৃষ্টিতে তার গল্প বিবৃতিধর্মী, শিথিল-গ্রন্থি মনে হয়। এর অন্যতম কারণ সম্ভবত এই যে, তিনি জীবনের ইতিহাস প্রকাশের সঙ্গে সমাজ প্রতিবেশের পারিপার্শ্বিক পরিবর্তনের ধারাকেও ব্যক্ত করেছেন। যে বাস্তবতার উপর নির্ভর করে আধুনিক ছাোটগল্পের রূপায়ণ, তারাশঙ্কর সেই বাস্তবতার ধারণ ক্ষমতাকে স্বীকার করে তার ছোটগল্পের চরিত্র রূপায়ণ ঘটান। তাঁর সৃষ্ট অধিকাংশ চরিত্র শরৎচন্দ্রের মতো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ধৃতফসল। তারাশঙ্করের বক্তব্যে প্রাধান্য দান করেন, চরিত্রচিত্রণেও তিনি মনোযোগী; কিন্তু রচনার প্রকরণকৌশল সম্পর্কে তিনি খুব বেশি মনোযোগী নন। ভাষাভঙ্গিতে তিনি আবেগপ্রবণ, বুদ্ধিদীপ্ত নন; বর্ণনাংশে শরৎচন্দ্রের অনুসরণ তাঁকে ভাবকল্পনায় অতি আগ্রহী করেছে বলে সূক্ষ্মতার অনুপস্থিতি তার সৃষ্টির মৌল ত্রুটি। তার রচনার কৌশলগত সীমাবদ্ধতা সত্বেও জীবনের রূপকার হিসেবে ও সমাজ - প্রতিবেশের সার্থক দ্রষ্টারূপে তারাশঙ্করের তুলনারহিত। বিচিত্রের সাধক তারাশঙ্করের দীর্ঘকালের সাহিত্য সাধনার মানবজীবন বিচিত্র পরিচয়ের পরিধিতে ও অপরূপ ভঙ্গিতে তাঁর ছোটগল্পে চিত্রিত। তারাশঙ্কর বোধ হয় বাঙলার শেষ জীবনশিল্পী যিনি জীবনকে কেবল প্রবৃত্তির রমণীয়তার সূক্ষ্ম অন্তর্দ্বন্দ্বের শিল্পসৌন্দর্যে বর্ণাঢ্যরূপে চিত্রিত করিতে চাহেন নাই — একটা বৃহত্তর আত্মসীমাবহির্ভূত তাৎপর্যের সহিত যুক্ত করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তারাশঙ্করের গল্পের বিষয় বৈচিত্র্য বাংলা ছোটগল্পের আসরে অসমান্তরাল তারাশঙ্করের সাহিত্যে মানুষের নিয়তি যেন প্রবৃত্তি। মানুষ প্রবৃত্তির হাত থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে না যেমন, তেমনি অমোঘ

নিয়তির যে অবশ্যম্ভাবী পরিণাম তাকেও সে এড়িয়ে যেতে পারে না। অথচ এ সমস্তকে পরাভূত করে মানুষকে জীবনকে জানার অমৃতজ্যোতিতে কখনও কখনও উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এই বৈশিষ্ট্য হল সর্বকালীন মহৎ সাহিত্যের লঙঘন; আর তারাশঙ্করের গল্পে তারই অভিব্যক্তি। 'তারিণী মাঝি' গল্পে প্রেম আর আত্মরক্ষার দ্বন্দ্ব; আলোচ্য গল্পের উপজীব্য আত্মরক্ষার আদিম প্রবৃত্তির আহ্বানে প্রেমনির্ভরতার চরম বিয়োগান্তক পরিণতি। গল্পটি ছোটগল্পরূপে ও পরিমিতি আয়তণে সমুত্তীর্ণ হয়ে ওঠে জীবন - সত্যের উন্মেষে। আবার 'তমসা' গল্পে বীভৎসতার প্রতিমূর্তি অন্ধ পঙখি যে গান গায় সেখানে প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে প্রাণের সঙ্গে প্রাণের মিলনের জ্যোতির্ময়ী বাসনা। 'নারী ও নাগিনী' গল্পে জীবনসত্যের বিস্ময়কর প্রকাশ নাগিনীর প্রতি পুরুষের রহস্যময় আকর্ষণে। কালা-পাহাড় ল গড়ে ওঠে সম্পন্ন চাষী রংলালের গরু, মোষের প্রতি আসক্তিকে কেন্দ্র করে। অগ্রদানী গল্পে নিয়তির লীলা কার্যকরণ পরম্পরায় সুগ্রন্থিত। 'অগ্রদানী' - তে নিয়তির আবির্ভাব শাস্তিরূপে; আর 'না' গল্পে তার আবির্ভাব পরম ক্ষমায়। একটি মাত্র না ধ্বনির মাধ্যমে নষের সমস্ত সজ্ঞান প্রচেষ্টা পরাভূত হয়, জীবনের উপর নেমে আসে নিয়তির বিধান। বিনীত, নম্র, সুন্দরী বধূ শৈলর ভাগ্যবিড়ম্বনার কারণ তার নিজের স্বভাব। কিন্তু 'তাসের ঘর' গল্পে শেষ পর্যন্ত মানবচরিত্রের মধুর ছলনা ক্ষমাসুন্দর সরসতায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সামাজিক মানুষ ডাক্তার গড়গড়ির অদ্ভুত চরিত্রের তির্যক মহিমার মর্মঘটানে লেখক মানব মনের পরস্পর বিরোধী প্রবৃত্তির রূপটিকে অক্ষয় করেছেন 'দেবতার ব্যাধি' গল্পে। 'আখড়াইয়ের দীঘি' গল্পের নায়ক হিংস্র খুনে কালী বাগদী। বংশানুক্রমিক ধারা রক্তের মধ্যে প্রবাহিত হলে কত দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে তার প্রমাণ আলোচ্য গল্পটি। 'বেদেনী' গল্পটি 'অরুগ্ন বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্বরতা'র কাহিনি। 'পৌষলক্ষ্মী' গল্পে বর্ণিত হয় মানুষের চিরন্তন ধর্ম আর তার পরিণাম। তারাশঙ্করের উপন্যাসের বিস্তৃতির মধ্যে যেমন জীবনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র প্রস্ফুটিত, তেমনি ছোটগল্পের খন্ডাংশেও আছে জীবনের গভীরতা। চরিত্রসৃষ্টিতে জটিলতা নয়, গভীরতা ও বলিষ্ঠতাই তার উদ্দেশ্য। গল্পকার তারাশঙ্কর জীবনের নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে তেমন আগ্রহী নন; তিনি আগ্রহী পুরাতন জীবনকে মূল্যবান করার আকাঙ্ক্ষায়। আবার উনিশ-বিশ শতকের ভারতের

জনজীবনের মধ্যে ভারতকে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। 'ইমারত' আর 'কামধেনু' গল্পদুটি ভারতের এই অবিনশ্বর জীবনরহস্যের বক্তব্যকে ধরে রেখেছে। গল্পটিকে যেন ভারত - কথার দুটি চিরন্তন ধারার বাঙ্ময় রূপ। ইমারত গল্পের নায়ক জনাব আলির মনে হয়েছে বটগাছ হল ভগবানের গড়া ইমারত। 'কামধেনু' গল্পে কল্যাণ আর কামনা, সেবা তার প্রলোভের দ্বন্দ্বে ভারতীয় জীবনবোধের প্রকাশ। এ গল্পে ভারত সংস্কৃতি স্পর্শ করেছে এব্বোরে মাটির স্তরকে। সূর্যপ্রভব মহাবংশের উত্থান - পতনে প্রাচীন ভারতের মহাকবি যে জীবনসত্যকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, অবজ্ঞা, পল্লীর অখ্যাত জনের প্রাকৃত জীবনেও সেই একই জীবনরহস্য সমুদ্ভালিত;- তারাশঙ্করের এই দৃষ্টিই আপামর সর্ব সাধারণের জীবনে ভারতকে নতুন মহিমায় আবিষ্কার করেছে। (আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী : জগদীশ ভট্টাচার্য।) তারাশঙ্করের দৃষ্টি কিন্তু শুধু ভারতকেই নতুনমহিমায় আবিষ্কার করেনি; তাঁর গল্পে আছে জমিদারী সংঘাত - সংঘষের কাহিনি, বিলীয়মান যুগের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা-মিশ্রিত বেদনার ভাষা, প্রবীণ নবীনের সংঘাত, আদর্শ নিষ্ঠ বিবেকবান মানুষের কাহিনি। আর এ সমস্ত পাওয়া যায় 'জলসাঘর' 'রায়বাড়ি', 'পুরেহিত', 'খাজাঞ্চিবাবু', 'মধূ মাস্টার', টহলদার', 'নুটু মোক্তারের সওয়াল', 'স্বাধীনতা', 'পণ্ডিতমশাই' ইত্যাদি গল্পে। আদর্শনিষ্ঠ, কর্মদক্ষতাসম্পন্ন, সৎ, পরিশ্রমী মানুষ কীভাবে বিলুপ্ত হতে চলেছে তার বেদনাই হচ্ছে 'খাজাঞ্চিবাবু' গল্পের বিষয়। 'শিলায়ন' গল্পে নবীন ও তার নতুন ঘোড়াটি যেন দুই কালের প্রতীক। 'মধুমাস্টার গল্পের মধু মাস্টার ন্যায়পরায়ণ, আত্মভোলা , সৎ মানুষ। 'টহলদার' গল্পের টহলদার সাধারণ বৃত্তিতে নিযুক্ত হলেও তারাশঙ্করের সহমর্মিতার আদর্শপ্রাণ, সত্যনিষ্ঠমানুষ রূপ চিত্রিত। 'নুটু মোক্তারের সত্তয়াল' গল্পের নুটুর আত্মধিক্কার জাগে প্রখর নীতিবোধের জন্য। 'স্বাধীনতা' গল্পে স্বাধীনতার তাৎপর্য বোঝাতে তারাশঙ্ক ভারতধর্মর প্রসঙ্গ বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। আবার 'পণ্ডিতমশাই' গল্পে যতীনের জীবনের সার্থকতা ও ব্যর্থতা গল্পের রূপ না পেয়ে শুধুই কাহিনিতে পর্যবসিত হয়। তাঁর গল্পে আদর্শবাদের সঙ্গে অনৈতিকতার কাহিনিও আছে। 'ব্যাধি' গল্পের হারাণ আচার্য নৃশংস যন্তে পরিণত হয়, তার ছিল না মানুষ্যত্বের প্রতি দুর্বলতাবোধ বা শ্রদ্ধা। তারাশঙ্করের 'স্রোতের কুটো' 'পুর্ণিমা' পত্রিকার আষাঢ় ১৩৩৪ - এ প্রকাশিত প্রথম উল্লেখযোগ্য গল্প হলেও গল্পটি

সার্থকতার স্তরে উত্তীর্ণ হতে পারে নি। আলোচ্য গল্পে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ, তাদের জীবনযাত্রা, সংস্কার, ধর্মচর্চা, লোকসংস্কৃতি ইত্যাদি সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা যেমন আছে, তেমনি আছে চাষাবাদ, খাজনা, মোকদ্দমা, মহাজনী প্রথা জমিদার ইত্যাদি সমস্ত কিছুই; কিন্তু গল্পটির চরিত্রগুলাের আবেগ অত্যন্ত উঁচুস্বরে উচ্চারিত। 'রসকলি' গল্পটি তারাশঙ্করের প্রিয় গল্প, প্রেমের গল্প, গল্প পঞ্চাশৎ ইত্যাদি সংকলনের অন্তর্ভুক্ত। গল্পটি 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রত্যাখ্যাত হলেও কল্লোল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গল্পটিতে বৈষ্ণবজীবনচর্যার অনুপুঙ্খ বিবরণ আছে। তারাশঙ্করের বৈষ্ণবজীবনাচরণ সম্পর্কিত। অভিজ্ঞতা এখানে ছোটগল্পের শিল্পাঙ্গিকে সোনার কাঠির স্পর্শে উজ্জ্বল। মঞ্জরীর রহস্যময় চরিত্রায়ণই গল্পটির কেন্দ্রীয় সম্পদ।

তারাশঙ্করের বেশ কিছু গল্পের বিষয় নরনারীর ভুল বোঝাবুঝি; তবে এখানে গল্পকার ব্যাহত; কেননা গল্পগুলি উদ্দেশ্যহীন বিবরণে পর্যবসিত। এ প্রসঙ্গে 'আলো - আঁধারি', 'কুলীনের মেয়ে' গল্পের উল্লেখ করা চলে। আবার 'ইতিহাস', 'শ্রীনাথ ডাক্তার', 'মুহূর্ত', 'বিষধর', ইত্যাদি গল্পে টাইপ চরিত্র গল্পে মুখ্যভূমিকা গ্রহণ করে। সরল কৌতুকও কোনো কোনো গল্পের বিষয় হয়ে ওঠে। যেমন, 'রানুর বিবাহ' গল্পে রানুর বিবাহকে কেন্দ্র করে একটি বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের বিভিন্ন চরিত্রের সরল মানবিক প্রতিক্রিয়াকে কেন্দ্র করে কৌতুককর পরিমণ্ডলের সৃষ্টি হয়েছে। মধ্যবিত্ত জীবনের একান্নবর্তী পরিবার, গৃহবধূর বেদনাবিমথিত জীবন, বালবিধবা কালো - বৌ - এর সরল সুন্দর আন্তরিকতা চিত্রিত হয় 'বড় বৌ', 'প্রতিমা 'কালো বৌ' ইত্যাদি গল্পে। তারাশঙ্করের দাম্পত্য প্রেমবিষয়কে গল্পগুলি হল 'পদ্মবউ', 'হারানো সুর', 'কুশপুত্তলী' ইত্যাদি! সামান্য ভুলের জন্য, বেরিবেরি রোগকে কুষ্ঠরোগ মনে করে পদ্মবউ জগৎ ও জীবনের প্রতি একটা ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ আক্রোশে আত্মহননের পথ বেছে নিল। 'হারানো সুর' গল্পে ননীও গিরির পারস্পরিক ভুলবোঝাবুঝির শেষে মিলন ঘটলেও গল্পটি ছোটগল্পেরূপে উৎকর্ষ লাভ করতে পারে নি। 'প্রতীক্ষা' গল্পে। স্বৈরিণীর নিয়তি-নিধারিত পরিণতি যেন নীতি-নিরংকুশ লেখকের কল্পনাকে নিয়ন্ত্রিত করে কাহিনিকে একটি নিদিষ্ট প্যাটার্নে রূপান্তরিত করেছে। দাম্পত্য প্রেম বা যে কোনো প্রেমের গল্প

রচনায় তারাশঙ্কর খুব বেশি সার্থকতা অর্জন করতে পারেন নি। তার কাটা গল্পাত অমানবিক নিষ্ঠুর স্বার্থপরতার কাহিনি, আর 'বন্দিনী কমলা' গল্পটি আভিজাত্যের অন্তঃসারশূন্যতার গল্প।কাহিনির পরিমণ্ডল রচনায় তারশঙ্করের দক্ষতা অবিস্মরণীয়।

'তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ' তিন খণ্ডে সর্বসমেত ১৯০ টি গল্প সংকলিত হয়েছে। তারাশঙ্করের গল্পের আলোচনায় দেখা যাবে তার গল্পগুলি গড়ে উঠেছে জমিদার ও ব্যবসায়ীর সংঘর্ষ, সমাজের উচ্চ শ্রেণী, ব্রাত্যসম্প্রদায়, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি, রাঢ় লোকসংস্কৃতি, বৈষ্ণব রসধারা, প্রবৃত্তি, নিয়তির আমোঘ লীলা, অন্ত্যজ যাযাবর সম্প্রদায়ের মানুষ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে।

৩.২ অনুশীলনী

১। বাংলা ছোটগল্পে তারাশঙ্করের অবদান আলোচনা করো।

৩.৩ গ্রন্থপঞ্জী

১। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত – অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

একক ৪ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত গল্প – জলসাঘর,তারিণী মাঝি,নারী ও নাগিনী,কালাপাহাড়

বিন্যাসক্রম

৪.১ জলসাঘর: নতুন ও পুরাতনের দ্বন্দ্ব

৪.২ তারিণী মাঝি

৪.৩ নারী ও নাগিনী

৪.৪ কালাপাহাড়

৪.৫ অনুশীলনী

৪.৬ গ্রন্থপঞ্জি

৪.১ জলসাঘর: নতুন ও পুরাতনের দ্বন্দ্ব

তারাশঙ্করের 'জলসাঘর' প্রথম প্রকাশিত হয় সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় ১৩৪১ সালের বৈশাখ মাসে। আর প্রায় একই বিষয় নিয়ে রচিত 'রায়বাড়ি' গল্পটি প্রকাশিত হয় ভারতবর্ষ পত্রিকায় ১৩৪৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসে। আসলে এই দুটি গল্পই একসূত্রে বাঁধা। তিনি প্রথমে ভেবেছিলেন যে জলসাঘর নিয়ে তিনটি গল্প লিখবেন, "প্রথম জলসাঘর গড়ে ওঠা, দ্বিতীয় জলসাঘরের পরিপূর্ণ জৌলুষ, তৃতীয় এবং শেষেরটি আগেই লেখা হয়ে আছে।" এই তৃতীয় গল্পটিই 'জলসাঘর'। এখানে আছে ভাঙনের কথা। তারাশঙ্করের স্বীকৃতি অনুযায়ী দ্বিতীয় গল্পটি অর্থাৎ জলসাঘরের পরিপূর্ণ জৌলুষের কাহিনি' আর লেখা হয়ে ওঠে নি। 'রায়বাড়ি' দিয়েই আলোচনার সূত্রপাত হওয়া প্রয়োজন। কেননা এই গল্পেই জলসাঘের গড়ে ওঠার কাহিনি রয়েছে।

গড়ে ওঠার কাহিনি না জানলে ভাঙনের কাহিনির তাৎপর্য বোঝা যাবে না। 'রায়বাড়ি' গল্পের রাবণেশ্বর রায় বংশের চতুর্থ পুরুষ, আর 'জলসাঘরের' বিশ্বম্ভর রায় এই বংশেরই সপ্তম পুরুষ। "চতুর্থ পুরুষ করিয়াছিলেন রাজত্ব। পঞ্চম ও ষষ্ঠ পুরুষ করিলেন ভোগ ও ঋণ। সপ্তম পুরুষ বিশ্বম্ভরের আমলেই রায়বাড়ির লক্ষ্মী সে ঋণসমুদ্রে তলাইয়া গেলেন। বিশ্বম্ভর লক্ষ্মীহীন দেবরাজের মত শুধু বসিয়া বসিয়া দেখিলেন। শুধু এই মাত্র নয় রায়বংশ এই সপ্তম পুরুষে নির্বংশও হইয়া গেল (জলসাঘর)।" পঞ্চম ও ষষ্ঠ পুরুষের সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেবার সময় তারাশঙ্কর করে উঠতে পারেন নি। কিন্তু চতুর্থ ও সপ্তম পুরুষকে দেখেই তাদের চরিত্রও কিছুটা আন্দাজ করা যায়।

আসলে এঁরা সবাই প্রায় একই ছাঁচে ঢালা। প্রত্যেকেরই মধ্যে প্রবল আত্মমর্যাদাবোধ, অহমিকা, ভোগলিপ্সা, দৃপ্ত শৌর্য এবং অমিতব্যয়িতার নিদর্শন পাওয়া যাবে। একদিকে অনুগত ও আশ্রিতদের প্রতি এঁরা মুক্তহস্ত, অপরদিকে বিপক্ষের প্রতি অন্যায়ভাবে নিষ্ঠুর। ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায়ের ভাষায় এই চরিত্রগুলির মধ্যে ঘটেছে 'ঔদার্যের সঙ্গে নির্মমতার বিচিত্র মিশ্রণ। আবার এরই পাশাপাশি অধিকাংশ জমিদার বংশের পরবর্তী উত্তরাধিকারীদের মধ্যে একধরনের অসহায়ত্ব-মিশ্রিত পলায়নবাদী মনোভাবও লক্ষ করা গেছে। পতন অনিবার্য জেনেও তারা বাস্তব থেকে যেন স্বেচ্ছায় চোখ ফিরিয়ে থেকেছিলেন। রায়বংশের প্রতিষ্ঠাতা অথবা প্রথম কয়েক পুরুষের মধ্যে এই অসহায়ত্ব দেখা যায় নি, কিন্তু বংশের শেষ পুরুষ বিশ্বম্ভরের সামনে কেবল অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ। মহিম গাঙ্গুলীর কাছে তার পরাজয় কেবল ব্যক্তিগত নয়, তা ঐতিহাসিক সত্য। গ্রামে যে নতুন বণিক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হচ্ছিল তাদের সঙ্গে পতনোন্মুখ সামন্ততন্ত্রের সংঘর্ষ ছিল অনিবার্য। অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই সামন্ততন্ত্রকে এই অসম-সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়েছিল। এই অসম-সংগ্রাম তারাশঙ্করের ক্ষেত্রে কোন কল্পিত ব্যাপার ছিল না। গ্রামীণ সমাজে নতুন বণিক শ্রেণীর উদ্ভব ও তাদের সঙ্গে জমিদারদের নিয়মিত বিরোধ তাঁর চোখেই দেখা। সামন্ততন্ত্রের গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলি তিনি চোখে দেখেন নি, কিন্তু অনেক জমিদারের দোর্দন্ড প্রতাপের কাহিনী তার শোনা ছিল। আর তিনি নিজেই যেহেতু

ছোটখাত একটা জমিদার পরিবারের লোক তাই অল্প কিছু নিজের চোখে দেখাও ছিল। ‘রায়বাড়ি’ গল্পের রাবণেশ্বর রায় । সম্পর্কে তার মন্তব্য, “কিন্তু এমন চরিত্রের কথা গল্পে আমি শুনেছিলাম। ছেলেবেলা থেকে শুনেছি এবং এমনি কঠিন চরিত্রের মানুষের ছায়া আমার পিতৃপুরুষদের মধ্যে, পিতৃ-পুরুষদের সমসাময়িকদের মধ্যে দেখেছি বলেই এই চরিত্র এত সজীব, এত বাস্তব আমার কাছে।”

তারাশঙ্করের হাতে রাবণেশ্বর রায় এবং বিশ্বম্ভর রায় উভয়েই যে এই বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে সজীব এবং বাস্তব হয়ে উঠেছে এটা মেনে নিতেই হয়। যে চরিত্রগুলির সঙ্গে লেখক সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে যান সেগুলিই শিল্প সফল হয়ে ওঠে। এই জমিদারেরা তারাশঙ্করের স্ব-শ্রেণীর, তাই ভালোমন্দ সবকিছু মিলিয়ে তাদের যথাযোগ্য মূল্যায়নের চেষ্টা তিনি করে গেছেন। এ ব্যাপারে তিনি হয়তো কিছুটা পক্ষপাতদোষে দুষ্ট কিন্তু তাই বলে তিনি একেবারে মোহগ্রস্ত ছিলেন না। বরং তার জানা ছিল যে ক্রমক্ষয়িষ্ণু জমিদারতন্ত্রকে আঁকড়ে ধরে থাকাটা একটা মোহমাত্র, এর কোন বাস্তব ভিত্তি আর নেই। পুরাতনে এবং নতুনের এই সংঘর্ষের ফলাফলও তার জানা। যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিতের প্রতি যে কারণে একটা সাধারণ সহানুভূতি থাকে হতমান জমিদার শ্রেণীর প্রতি তারাশঙ্করের মমতার কারণও তাই। তাই ‘জলসাঘর’ গল্পের জমিদার বিশ্বম্ভর রায় তারাশঙ্করের হাতে যতই সজীব এবং বলিষ্ঠ হয়ে উঠুন না কেন আর্থিক সমৃদ্ধিতে মহিম গাঙ্গুলী তাকে অনেকটা পিছনে ফেলে দেয়। ঋণগ্রস্ত এবং সর্বান্ত বিশ্বম্ভরের ঝাড়লণ্ঠনের ম্লান ও বিষন্ন আলোককে ব্যঙ্গ করে মহিম গাঙ্গুলীর নিজস্ব ডায়নামোর বৈদ্যুতিক আলোকমালা উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। বাইজীকে বকসিস দিতে গিয়ে তার পারিবারিক গয়নার বাক্স নিঃশেষ হয়ে যায়, কিন্তু তার চোখের সামনেই মহিম টাকার তোড়া নামিয়ে দেয়। এই অসম প্রতিযোগিতা যে অর্থহীন এই নির্মম সত্যটি বিশ্বম্ভরেরও জানা। কিন্তু অতীত ঐতিহ্যের মোহ, পুরনো খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার মোহ এখনও তাকে মাঝে মাঝে আচ্ছন্ন করে কেলে। আবার একসময়ে কঠোর বাস্তবের আঘাতে সেই মোহজাল ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, ‘সভয়ে রায় পিছাইয়া আসিলেন। সহসা মনে হইল, দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়াছেন—মোহ! কেবল

তাঁহার নহে, সাত রায়ের মোহ ওই ঘরে জমিয়া আছে। যেখানে বর্তমানের কোন ভরসাই নেই সেখানে অতীতের মাোহকে আঁকড়ে ধরে না থেকে উপায়ই বা কি? কিন্তু কেবল অতীতের মোহ জমিদারতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। তাই এদের নিরন্ধ্র দুর্নিবার পতনের চিত্র না এঁকে তারাশঙ্করের কোন উপায় ছিল না। কিন্তু একেবারে পতন বা অন্ধকারের ছবি আঁকলে শিল্পীর যথাযথ দায়িত্ব পালনে তিনি ব্যর্থ হতেন। তার এও জানা ছিল যে আলোকের পরেই অন্ধকার নেমে এলে বৈপরীত্যটি পাঠকের চোখে সহজেই ধরা পড়বে। তাই তাঁকে কিছুটা নাটকীয় কৌশলের সাহায্য নিতে হয়েছে। 'জলসাঘর' গল্পে সামন্ততন্ত্রের গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলির শেষ অঙ্কের নাটক যেন অভিনীত হয়ে চলেছে। এর আগে রায়বংশের ছয় পুরুষের রাজত্বকালের প্রতিটি অঙ্কেই রঙ্গমঞ্চে একটির পর একটি আলোক নির্বাপিত হয়েছে। পঞ্চম অঙ্কে নেমে আসবে সম্পূর্ণ অন্ধকার। এই অনিবার্য অন্ধকারের চিত্র রয়েছে আলোচ্য গল্পে। প্রভাত-সূর্যের মতো অস্তগামী সূর্যেরও কিছুটা আকর্ষণ থাকে। জলসাঘরের বিশ্বম্ভর রায়ের প্রতি তারাশঙ্করের আকর্ষণ আসলে অস্তগামী সূর্যের প্রতি শেষ আকর্ষণ।

একে তারাশঙ্কর জমিদার বংশের সন্তান তার ওপর পতনোম্মুখ সামন্ততন্ত্রের প্রতি তার প্রকাশ্য দুর্বলতা—এ দুটিই এক সময় লেখকের মারাত্মক অপরাধ বলে গণ্য হয়েছিল। ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও 'শিল্পী সংঘ' এবং 'প্রগতিলেখক সংঘের' মতো প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বপদে আসীন থাকা সত্ত্বেও তার জমিদার-প্রীতি প্রগতিশিবির থেকেই আক্রান্ত হয় বেশি। হিরণকুমার স্যানালের মতো স্থিতধী সমালোচকও হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখলেন,

"তারাশঙ্করবাবু মাটির মানুষের ছবি আঁকলেন জমিদারি প্রাসাদের ভগ্নস্তুপ থেকে। কিন্তু এ টিই যে দেশের মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন।" আর বীরেন পাল ছদ্মনামে প্রখ্যাত কমিউনিস্ট এক ভবানী সেন 'কালিন্দী'র সমালোচনা করলেন এই ভাষায়, "তিনি ধনতন্ত্রের সমালোচনা জমিদারের পক্ষ থেকে, জমিদারী প্রথার সমালোচনা করেছেন প্রাচীন গোষ্ঠী-সমাজের পক্ষে কে তার দৃষ্টি অতীতমুখী সুতরাং প্রতিক্রিয়াশীল। ..ইতিহাসের অগ্রগতির ভিতর দেখলাম কারখানা মালিকের বিরুদ্ধে জমিদারের সংগ্রাম, এ সংঘর্ষে

জমিদারের সংগ্রামটাই যেন ন্যায্য সংগাম।" এই জাতীয় সমালোচনায় অবশ্যই কিছু সত্যতা আছে, তবে তা নিতান্তই একপেশে বিচার। জমিদারের দৃষ্টি নিয়ে তারাশঙ্কর ধনতন্ত্রের সমালোচনায় নেমেছিলেন এ অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাই তার হাতে নবীন ব্যবসায়ী সম্প্রদায় কখনো আদর্শ চরিত্র হয়ে ওঠে না। 'কালিন্দী'র মিলমালিক বিমল মুখার্জী অথবা জলসাঘরে'র ধনী ব্যবসায়ী মহিম গাঙ্গ লীদের তিনি অশ্রদ্ধার দৃষ্টিতেই দেখেন। তার দৃঢ় বিশ্বাস এদের আর্থিক সমৃদ্ধি যতই হোক না কেন সামাজিক প্রতিষ্ঠা বা মর্যাদা এরা কোনদিনই পাবে না। জমিদারদের যতই অধঃপতন ঘটুক না কেন বা অত্যাচারী বলে তারা যতই কুখ্যাত হোন না কেন মানুষ তাদেরই সম্ভ্রমের চোখে দেখে। প্রিভি কাউন্সিলের রায়ে বিশ্বম্ভরের প্রায় সবকিছুই চলে গেছে। আছে সামান্য দেবোত্তর সম্পত্তি। কিন্তু নতুন ধনী মহিম গাঙ্গুলীর সামাজিক শ্রেষ্ঠত্ব কেবল তিনিই নন তাঁর প্রজারাও মানতে রাজি নয়। তাই তুফানের পিঠে চড়ে হারানো লাট কীর্তিহাট দিয়ে যাবার সময় প্রজাদের এই ধরনের কথাবার্তা বিশ্বরের কানে আসে, "গাঙ্গুলী বাবুরা কিনে থেকে খাজনা দিয়ে লাভ কিছু আর থাকে না। সুখ ছিল রায়-রাজাদের আমলে।" বিশ্বম্ভরের জমিদারীর অধিকাংশ করায়ত্ত করেও গাঙ্গুলীরা বাবু'ই থেকে যায়, আর নিঃস্ব রায়েরা এখনও প্রজাদের কাছে 'রাজা'ই হয়ে থাকেন। বাবুরা কোনদিনই রাজা হতে পারে না।

এইটুকুই তারাশঙ্করের মোহ বা দুর্বলতা। অতীত ঐতিহ্য আঁকড়ে থেকেই ফিউডালিজম বেচে থাকে। এই মোহের জগতে বাইরের লোকের অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ। তাই 'গণদেবতা'য় ছিরু পালের শ্রীহরি ঘোষ হয়ে ওঠাটা তিনি কিছুতেই সমর্থন করেন না। তার চেয়ে বদ্ধ পড়ন্ত জমিদার দ্বারকা চৌধুরী অনেক শ্রদ্ধেয়। কিন্তু এক্ষেত্রে তারাশঙ্করদের দৃষ্টি অবশ্যই 'অতীতমুখী' নয়। ফিউডালিজম-এর গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে আঁকড়ে ধরে থাকা যে হাস্যকর তা তার জানা। এদের নির্মম পরিণতি সম্পর্কেও তিনি সুনিশ্চিত। তার ফিউড়াল চরিত্রগুলিকে তাই বারবার তিনি কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিতে চান। নিজের শেষ সম্বলটুকু বাজি রেখে মহিন গাঙ্গুলীর সঙ্গে বিশ্বম্ভর মার্যাদার লড়াইয়ে নেমেছিলেন। দীর্ঘকাল বাদে আবার

জলসাঘরের দরজা খোলা হয়েছিল। বাইজীকে বকসিস্ দিতে গিয়ে তার শেষ দুটি মোহর চলে। গেলেও উপস্থিত শ্রোতা এবং শিল্পীদের কাছে মহিমের সম্পূর্ণ হার হয়েছে, "রায়বাড়ির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় নাই।" কিন্তু জলসাঘরের দরজা কেবল এই একটি সন্ধ্যার জন্যই খোলা গিয়েছিল। এখন আর বেপরোয়া বিলাসব্যসনের সুযোগ নেই— গল্পের শেষে অনেক মূল্য দিয়ে বিশ্বম্ভর রায় এই সত্যকে জেনেছিলেন। দেশকাল, অর্থনৈতিক কাঠামো এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। এখন জলসাঘরের দরজা খুলে ক্ষণকালের জন্য হারানো মর্যাদা ফিরে পাওয়া যেতে পারে কিন্তু স্থায়ীভাবে পাওয়া যাবে না। তাই যে জলসাঘরের দরজা বিশ্বম্ভর নিজের উদ্যোগে অনেককাল বাদে খুলিয়েছিলেন নিজেই আতঙ্কিত হয়ে তা বন্ধ করে দেন। এই কারণেই এই গল্পে শেষপর্যন্ত জলসাঘর একটা প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। তা বিলীনমান ফিউডালিজম-এর শেষ সূর্যাস্তের শেষ স্বর্ণরশ্মি। এদের ভাগ্যাকাশে সূর্যোদয়ের যে আর কোন সম্ভাবনা নেই তা বিশ্বম্ভরের চেয়েও ভালোভাবে শিবনাথ বা অহীন্দ্র বুঝেছিল। বিশ্বম্ভরের ছিল মোহ, কিন্তু ধাত্রীদেবতা'র শিবনাথ বা কালিন্দী'র অহীন্দ্র জমিদারীর ব্যাপারে সম্পূর্ণ মোহমুক্ত।

তারাশঙ্করের চরিত্রের এই মোহমুক্তি আসলে স্বয়ং লেখকেরই মোহমুক্তির প্রতিফলন। তিনি নিজে জমিদার, কিন্তু ছোট মাপের জমিদারবংশের সন্তান। নিজের গ্রাম লাভপুরেই অস্তিত্বরক্ষার জন্য সামন্ততন্ত্রকে ধনতন্ত্রের সঙ্গে অসম দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হতে তিনি দেখেছিলেন। এই গ্রামটি একদিকে জমিদার প্রধান, আবার এই গ্রামেরই একটি পরিবার কয়লাখনির মালিক হয়ে বিপুল বিত্তের অধিকারী হন। একদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য জমিদার, অপরদিকে এই ধনী ব্যবসায়ী—উভয়েই তখন আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত, "১৮৯৮ সালে লাভপুরের সমাজে তখন দুই বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব চলেছে।..বীরভূমের জমিদারদের একটা বৈশিষ্ট্য হল জমিদারীর আয়তন ও আয়ের দ্রতা এবং তাদের সংখ্যার বাহুল্য...তাদের পরাক্রম কম নয়। তারা বলতেন--মাটি বাপের নয়, দাপের; দাপ তো আয়ে নাই, দাপ আছে বুকে। বুকে চাপড় মেরে তারা বীর্যের দাবি ঘোষণা করে বলতেন—"আমি জমিদার। এঁদের সঙ্গে আরম্ভ হল লক্ষ লক্ষ

টাকার মালিক এই ভাগ্যবান ব্যবসায়ীর বিরোধ।" "জলসাঘর' গল্পে জমিদার বিশ্বম্ভর রায়ের সঙ্গে ব্যবসায়ী মহিম গাঙ্গুলীর দ্বন্দ্বের মধ্যে এই আঞ্চলিক সংঘাতেরই প্রতিফলন ঘটেছে মাত্র। তারাশঙ্করের ব্যক্তিজীবনও এই সংঘাত থেকে মুক্তি ছিল না। ক্ষুদ্র জমিদারবংশের এই সন্তানের বিবাহ হয়েছিল স্থানীয় ব্যবসায়ী পরিবারে। ব্যবসায়ী পরিবারের কন্যা পড়ন্ত জমিদারবংশের অন্তঃসারশূন্য আভিজাত্যের মোহে আচ্ছন্ন হননি, বরং তাদের দারিদ্র্য তাকে পীড়িত করেছিল। তারাশঙ্করকে জমিদারী ছেড়ে শ্বশুরবাড়ির ব্যবসায়ে যোগ দেবার আমন্ত্রণও জানানো হয়েছিল। স্বভাবতই তারাশঙ্কর রাজি হন নি। এতে তার মানসিক অস্বস্তিই বেড়েছে। 'ধাত্রীদেবতা'য় গৌরী 'তোমার জমিদারীর পায়ে প্রণাম' বলে কেবল স্বামী শিবনাথকেই ঠাট্টা করেনি, তার পিতৃকুলের জমিদারদের সম্পর্কে ধারণটিকেও স্পষ্ট করেছে। এ হচ্ছে ব্যবসায়ীর দৃষ্টিতে জমিদারীর সমালোচনা। এও তো তারাশঙ্করের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। তাই 'জলসাঘরে'র মতো গল্প তারাশঙ্করের সাহিত্যজীবনে মোটেই আকস্মিক নয়। 'রায়বাড়ী' বা 'জলসাঘর' তো একমাত্র তিনিই লিখতে পারেন। ক্ষয়িষ্ণু জমিদারতন্ত্রের মহিমার দিনগুলি তার জা'না, তর ক্রম-অধঃপতনেরও তিনি সাক্ষী। আবার সামন্ততন্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে পুঁজিবাদের উদ্ভবও তিনি লক্ষ করেছিলেন। কিন্তু এ সমস্ত তো ইতিহাসের সত্য। সাহিত্যের সত্য আলাদা বস্তু। 'জলসাঘরের' সাহিত্যিক সত্য ইতিহাসকে ছাড়িয়ে গেছে। সেখানে সামন্ততন্ত্র এবং ধনতন্ত্রের দ্বন্দ্ব প্রধান নয়, মানবচরিত্রগুলির টানাপৈড়েনই প্রধান। বিশ্ববম্ভর রায় বনাম মহিম গাঙ্গুলীর দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি মানুষের দ্বন্দ্ব হয়ে ওঠে, ব্যক্তিগত মান-অভিমান বা আত্মসম্মানবোধ তাদের আচার-আচরণকে অনেক সময় নিয়ন্ত্রিত করে। নিজেদের শ্রেণীগত অবস্থান তারা ভুলে যায় না বটে কিন্তু সবকিছু সেই অবস্থানের দ্বারা বিচার্য হয় না। বিস্তর সম্পর্কে একথা বিশেষভাবে সত্য। জমিদার বিশ্বম্ভর যখন তার প্রিয় ঘোড়া তুফানকে উপযুক্ত দানার অভাবে ক্রমাগত রুগ্ন হয়ে যেতে দেখেন, যখন পরলোকগত পত্নীর স্মৃতিবিজড়িত মোহর দিয়ে তাকে মহিন গাঙ্গুলীর বাড়িতে উপহার পাঠাতে হয়, অথবা যখন চরম উত্তেজনায় তুফানের পিঠে চড়ে যাবার সময় হঠাৎই তিনি হারানো জমিদারী কার্তিহাটের সামনে গিয়ে পড়েন কিংবা যখন পিয়ারী বাইজীকে বকসিস্ দিতে না পেরে

তাপমানিত বিশ্বম্ভর নতমস্তকে আসার বসে থাকেন তখন তার যে বেদনা তা ভাগ্যবিড়ম্বিত নানুষের চিরন্তন বেদনা, কেবল কোন পতনোম্মুখ জমিদারের বেদনা নয়। তাই জলসাঘরের বিশ্বম্ভর গ্রীক ট্র্যাজেডির নায়কের মতো নিয়তির অনিবার্য শিকার। পতন সুনিশ্চিত জেনেও শেষমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি মাথা উঁচু করে রেখে যেতে চান।

তুলনায় মহিম গাঙ্গুলী কিন্তু বিশ্বম্ভবের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। 'কালিন্দী'তে জমিদার ইন্দ্র রায়ের সঙ্গে চিনিকলের মালিক বিমল মুখার্জার প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল প্রায় সমানে সমানে। বিমল মুখার্জী ধনতন্ত্রের যথার্থ প্রতিনিধি, তিনি শিল্পপতি। তাই প্রতিটি স্তরেই জমিদারের সঙ্গে তার লড়াই জমে উঠেছিল, ইন্দ্র রায় এবং রামেশ্বর চক্রবর্তী এই দুই জমিদার পক পদে পদে তার কাছে কূট-কৌশলে, অর্থ ও সংগঠনশক্তির জোরে পরাস্ত হয়েছে। আবার জমিদারপক্ষও সহজে হাল ছাড়ে নি। তাই দুই প্রবল প্রতিপক্ষের সংঘাত 'কালিন্দী' উপন্যাসটিকে ঘাত প্রতিঘাত সম্পন্ন করে তুলেছে। কিন্তু জলসাঘরের মহিম গাঙ্গুলী শিল্পপতি নয়, তারা পুরুষানুক্রনে সুদখোর মহাজন। "গাঙ্গুলী বংশ চিরদিন রায়-দপ্তরের এলাকায় মহাজনি করিয়াছে। মহিনের পিতা জনার্দন পর্যন্ত রায়বাড়ির কর্তাকে বলিয়াছে—হুজুর।"শিল্পপতি এবং মহাজনের মানসিকতা আলাদা। তাই মহিমের সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও রুচি—এই দুইয়েরই একান্ত অভাব। বিমল মুখার্জী অর্থ, বুদ্ধি ও ক্ষমতার দাপটে গ্রামবাসী এবং কর্মচারী উভয়ের কাছেই সমীহের পাত্র, এমন কি শেষের দিকে ইন্দ্র রায়ও তাকে তেমন ঘটাতে চান নি। কিন্তু মহিন বিশ্বম্ভরের মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহসই পায় না। তার স্কুল আচার-আচরণের জন্য সে জমিদারের নায়েব ও খানসামার পর্যন্ত অশ্রদ্ধার পাত্র। বিশ্বম্ভরকে অকারণে ছোট করবার জন্য সে মাঝে মাঝে হাস্যকর আচরণ করে। তাতে সে আরো ছোট হয়ে যায়। বিশ্বম্ভরের মতো প্রবল ব্যক্তিত্বশালী এবং আভিজাত্যগর্ব চরিত্রের বিপরীতে এই ধরনের দুর্বল চরিত্রের অবতারণা গল্পের গতিবেগকে যে কিছুটা মন্থর করেছে তাতে সন্দেহ নেই। এমন কি 'ধাত্রীদেবতা উপন্যাসেও জমিদার-সন্তান শিবনাথের সঙ্গে তার ব্যবসায়ী পরিবারের স্ত্রী গৌরীর সংঘাত এর চেয়ে অনেক সজীব ও বেগবান। অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী 'জলসাঘর' গল্পে "বৈষয়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতার চিত্রাংশ ধৃত আছে বলে মনে করেছিলেন।

কিন্তু যেখানে একপক্ষে সম্পূর্ণ বিষয়হীন সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অসম ও নিষ্প্রাণ হতে বাধ্য। সুতরাং 'জলসাঘরে' তারাশঙ্কর জমিদার-ব্যবসারী বা পুরাতন এবং নতুন এই উভয়ের দ্বন্দ্বকেই কেবল প্রধান করে তুলতে চেয়েছিলেন কি না এ প্রশ্নের সামনে এসে দাঁড়াতেই হয়।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এই প্রশ্নটির উত্তর খুঁজেছেন এইভাবে নতুন ও পুরাতনের দ্বন্দে পুরাতনের পরাজয়ের ওপর তারাশঙ্করের যে দীর্ঘশ্বাস বর্ষিত হয়েছে—এই গল্পের সেইটিই মূল সূত্র। অর্থাৎ দ্বন্দ্বের চেয়ে দীর্ঘশ্বাস বড়, বুদ্ধির চেয়ে অনুভূতি বড়। তারাশঙ্কর বুদ্ধি দিয়ে লেখেন না, লেখেন হৃদয় দিয়ে। তার স্বাভাবিক অনুভবের কাছে সমসাময়িক দেশকালের চিত্র যেভাবে ধরা পড়ে সেটাকেই তিনি গুরুত্ব দিতে চান। এমন কি জমিদারী প্রথার বিলুপ্তির মতো ঐতিহাসিক সত্যকেও তিনি মনের বিশ্বাস অনুযায়ী রূপান্তরিত করে নিতে চান। জমিদারদের ঔদ্ধত্য ও উজ্জ্বলতা তার জানা, কিন্তু তার দৃঢ় বিশ্বাস যে এই জমিদার-সমাজ গৌরবময় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বাহক। নিম্নবর্গের দরিদ্র জনসাধারণও দীর্ঘকালের সুস্থ সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী। কিন্তু উঠতি ধনী সম্প্রদায়ের কোনদিনই সংস্কৃতিক্ষেত্রে কোন অবদান নেই, তাদের অর্থলোভ এবং ভোগবাদ সমাজের মূল স্রোত থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। তাই জমিদারদের প্রতি তার সহানুভূতি, কাহার বা সাপুড়েদের সঙ্গেও তিনি একাত্ম হয়ে যেতে পারেন, কিন্তু বিমল মুখার্জী বা মহিম গাঙ্গুলীদের তিনি কখনো মনে মনে মেনে নিতে পারেন । তাই বুদ্ধি ও অনুভূতির দ্বন্দ্বের পাশাপাশি জমিদার চরিত্রের ভালোমন্দের দ্বন্দ্বও তার, তার সাহিত্য-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছে। এই কারণেই নাটকীয়-সংঘাত রয়েছে তার অনেক রচনায় বিশেষ করে 'জলসাঘরে'র মতো গল্পে। এই নাটকীয়তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আদিম আবেগের তীব্রতা। একজন বিস্মৃতপ্রায় সমালোচকের তারাশঙ্কর প্রসঙ্গে একটি মূল্যবান মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা চলে, "ছোটোখাটো সুখ-দুঃখ মান-অভিমান অনুরাগ-বিরাগে পূর্ণ সহজ সুরে বাঁধা জীবন তারাশঙ্করের জন্য নয়। জীবন যেখানে প্রচণ্ড আবর্ত সৃষ্টি করেছে, আবেগের সঙ্গে আবেগের সংঘাত যেখানে

প্রলয়ের মেঘ ডেকে এনেছে, সেখানে তারাশঙ্করের প্রতিভা সহজে নিশ্বাস ফেলে। সূক্ষ্মতা, প্রশান্তি ভাবাবেগের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ তারাশঙ্করের সাহিত্যে অনুপস্থিত।"

মানবচরিত্রের আদিম আবেগের তীব্রতা কিভাবে হঠাৎ নাটকীয় সংঘাতের সৃষ্টি করে 'জলসাঘর' থেকে তার উদাহরণ দেওয়া যায়। গল্পের কাহিনিতে তিনি কতগুলি আকস্মিক ঝাকুনির সাহায্য নিয়েই নাটকীয় সংঘাত ও গতিবেগ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। বিশ্বম্ভরের যন্ত্রণা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্রতা বাে◌ঝানাে◌র জন্য তিনি ধাপে ধাপে একটির পর একটি ঘটনা সাজিয়েছেন। পতন ও পরিবর্তনকে মেনে নিয়েই বিশ্বম্ভর নিজের গন্ডীর মধ্যে নিঃসঙ্গ গতানুগতিকে জীবনযাপন করে চলেছিলেন। পুত্রের উপনয়ন উপলক্ষে যখন রায়বাড়ির জাঁকজমক চূড়ান্ত পর্যায়ে তখনই দুরন্ত কলেরার আক্রমণে বিশ্বম্ভর পুত্র, কন্যা এবং স্ত্রীকে হারিয়ে যথার্থই নিঃসঙ্গ । এটি তার জীবনের প্রথম আঘাত। এই আঘাতে তার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তখনও তার মাথা উঁচু ছিল। এর পরেও জলসাঘরে বাতি জ্বলেছে, সেতার সারেঙ্গ ঘুঙুরের শব্দ শোনা গেছে। কিন্তু প্রিভি কাউন্সিলের রায়ে যেদিন রায়বংশের সমস্ত ভূ-সম্পত্তি চলে যায় সেই আঘাত প্রথম আঘাতের চেয়েও মারাত্মক। কলেরায় স্ত্রী-পুত্র-কন্যা হারিয়ে বিশ্বম্ভরের মানবিক সত্তা বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। রায়-বংশের বিলুপ্তি তিনি বিধাতার অমোঘ নির্দেশ বলে মেনে নিয়েছিলেন বলেই পূর্বপুরুষ রাবণেশ্বর রায়ের মতো তিনি পুনর্বিবাহ করেন নি। কিন্তু যেদিন বাকী ঋণের দায়ে সমস্ত সম্পত্তি মহাজনের গ্রামে চলে যায় সেদিন তার জমিদার-সত্তায় কম আঘাত লাগে। জলসাঘরের দরজাই যে আবার বন্ধ হয়ে যায় তাই নয়, দু বছর ধরে তিনি নীচে নামাই বন্ধ করে দেন। কিন্তু অত সহজে আবার বিশ্বম্ভর পরাজয় মেনে নেন না। বিশেষ করে যে গাঙ্গুলীবংশ চিরকাল রায়বাড়ির কর্তাদের কাছে মাথা নত করে এসেছে তারা। তে ধনীই হোক না কেন তিনি কখনো তাদের রায়বংশের সমকক্ষ বলে মেনে নেবেন না। তাই মহিম যখন তার দারিদ্রকে ব্যঙ্গ করার জন্যই বাইজীদের রায়বাড়িতে জলসার জন্য পাঠায় তখন যেন তার অন্তরের আদিম প্রবৃত্তিরই বিস্ফোরণ ঘটে। মহিনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে গিয়ে তাকে শেষ সম্বলটুকুও হারাতে হয়, কিন্তু পতনের পূর্বমুহূর্তেও তিনি উন্নতশিরই হয়ে থাকেন।

মহিমকে মুখের মতো জবাব দিয়ে আত্মতৃপ্ত বিশ্বম্ভর যখন গৌরববোধের শীর্ষদেশে দাঁড়িয়ে আছেন তখনই আকস্মিক ভাবে যেন বিপরীত দিক দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত আসে। এই শীর্ষে দাঁড়িয়েই বিশ্বম্ভরের মনে আসন্ন অনিবার্য পতনের আতঙ্কও ঘনীভূত হয়। যাকে তিনি চূড়ান্ত সাফল্য বলে মনে করেছিলেন তা আসলে ভয়াবহ ব্যর্থতা। অতীত গৌরবাে্জ্বল দিনগুলির প্রত্যাবর্তন আর কোনদিন ঘটবে না, তাঁদের সকলেরই এখন সাড়ে সাত গণ্ডার জমিদারের করুণ ও হাস্যকর পরিণতি ঘটতে চলেছে। আত্মগৌরবের চূড়ান্ত মুহূর্তে বিশ্বম্ভরের এই বেদনাময় পরাজয়ের অনুভূতি তারাশঙ্কর অসাধারণ নাটকীয় দক্ষতার সঙ্গে উপস্থিত করতে পেরেছেন। তাই বিশ্বম্ভর-মহিমের সংঘাতের মধ্য দিয়ে নয়, বিশ্বম্ভরের অন্তর্দ্বন্দ্বের ওপরই জলসাঘরের শিল্পোৎকর্ষ দাঁড়িয়ে আছে।

৪.২ তারিণী মাঝি : গল্পের জীবন জীবনের গল্প

আধুনিক সাহিত্যের নবপর্যায়ে মানব চরিত্রের কঠিন সংস্পর্শের বিচিত্র প্রয়োগ-পদ্ধতি লক্ষ করে জীবনের প্রান্তসীমায় রবীন্দ্রনাথ নিজের লেখা 'শাস্তি' গল্পের উল্লেখ করে বলেছিলেন, এর 'লেখনী সংসারের রূঢ় স্পর্শ এড়িয়ে যায়নি' এবং তা 'নির্মম সাহিত্যের' পর্যায়েই পড়ে। ছোটগল্পের ক্ষেত্রে মানব বিধাতার এই নির্মম সৃষ্টি প্রক্রিয়ার বিবরণ নিয়ে বিশ্ব ও ত্রিশের দশকে বেশ কয়েকজন কথাসাহিত্যিক আবির্ভূত হয়েছিলেন। 'কল্লোল' এবং 'কল্লোলেতর' সাহিত্যে নিষ্ঠুরতা ভয়ানক রসের গল্প-আধারে মানব জীবনের বিচিত্র রহস্যকে করেছিল উদঘাটিত। 'নারীর মন' (শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়), সংসার সীমান্তে', 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' (প্রেমেন্দ্র মিত্র), 'প্রাগৈতিহাসিক' (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়), 'বেদিনী', নারী ও নাগিনী', ডাইনী', পরিণী মাঝি' (তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রভৃতি গল্পে সেই জৈব-জীবন ও জান্তবতার নির্মম সৃষ্টি প্রক্রিয়ার বিবরণ। ধাতুপ্রকর্ষ ও চিৎপ্রকর্ষের টানাপোড়েনে এই গল্প লেখকেরা সমগোত্রীয় হলেও জীবনদর্শনের মনোভঙ্গিতে প্রত্যেকেই ছিলেন ভিন্ন পথের পথিক। প্রেমেন্দ্র মিত্র যেমন খুঁজেছিলেন পুরো জীবনের মানে', তেমনি জীবদেহের সরোবরে পদ্মের মত জীবনের অন্বেষণ করেছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭২)। জীবনের সারস্বত জিজ্ঞাসার রহস্যটিকে যথার্থভাবে চিনে নিয়ে শেষোক্ত শিল্পী বলেছিলেন: "জীবদেহ

আশ্রয় করেই জীবনের বাস। কিন্তু সে তো তাকে অতিক্রম করার চেষ্টার মধ্যেই মানব ধর্মকে খুঁজে পেয়েছে। সেইখানেই তো নিজেকে পশুর সঙ্গে পৃথক বলে জেনেছে। ইচ্ছে হল এমনি গল্প লিখব। সত্যকারের রক্তমাংসের জীবদেহে ক্ষুধা আর তৃষ্ণাতার কামনার ধারার সঙ্গে মিশেই চলেছে। জীবন চলেছে একটি স্বতন্ত্র ধারায়। কোথাও জিতেছে কোথাও হেরেছে।"

মানবজীবনের এই মূল সূত্রটিকে অবলম্বন করেই বিকশিত হয়েছিল তারাশঙ্করের গল্পভাবনা;—জলসাঘর' (শ্রাবণ ১৩৪৪) গল্প-সংকলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প 'তারিণীমাঝি'ও (১৩৪২) তার ব্যতিক্রম নয়। প্রবৃত্তি রূপিণী নিয়তি নির্মমভাবে মানুষের জীবনে কিভাবে আবির্ভূত হয়, তারই শিল্পরূপ অঙ্কিত হয়েছে তারিণী কথায়। মর্তজীবনে স্নিগ্ধ-হিংস্রের লীলার এমন অভিনব সৃষ্টি বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। তারিণী মাঝি' মহাকাব্যিক জীবনানুভবের সিন্ধুতে নির্মম সাহিত্যের বিন্দু দর্শন। বৃহত্তর জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন, অস্থির অতৃপ্ত সমসাময়িক কল্লোলিয়ানরা (kollolean) যখন ইনটেলেকচ্যুয়ালিজম্-এর স্বকৃত বৃত্তে ঘুরপাক খেয়েছেন, তারাশঙ্কর তখন অসাধারণ জীবন সম্পৃক্ততায় বীরভূমের পল্লী অঞ্চলের মাটি ও মানুষের গন্ধে মসগুল। পশ্চিমের ধাচে নাগারিক জীবন-জটিলতার কানাগলিতে গল্প খুঁজে ফিরতে হয়নি তাকে। তিনি পলায়নবাদী নন, ব্যর্থতা কিংবা নৈরাশ্য তাঁর গল্পের পরিণতি নয়। আলোচ্য তারিণী মাঝি' গল্পেও সে ছবি নেই। জীবনের বিষমৃতকে গলাধঃকরণ করে কল্লোলপন্থীদের সঙ্গে নিজের পার্থক্য চিহ্নিত করে আমার সাহিত্যজীবন' (১ম পর্ব) গ্রন্থে তিনি বলেছেন : "আমি বিদ্রোহের ছিলাম না। বর্তমানকে ভেঙেচুরে তাকে অগ্রাহ্য করে শূন্যবাদের মধ্যে জীবনকে শেষ করার কল্পনায় আমার মনের পরিতৃপ্তি কোনদিন হয়নি। আমার রচনার সমাপ্তি পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলেই এটা বোধহয় স্পষ্ট ধরা পড়ে। আমার মনে ভেঙে গড়ার স্বপ্ন ছিল।" তারাশঙ্করের এই আত্মবিশ্লেষণের বড় প্রমাণ তারিণী মাঝি গল্পের ফল-পরিণাম। কিন্তু সে প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে। কল্লোলের involvement থেকে মুক্ত থাকতে পেরেছিলেন বলেই কল্লোলের যুগ-যন্ত্রণা বহন করেও তিনি

কল্লোলেতর। জীবন বিবিক্ত নাগরিক মনস্কতার 'বিহ্বল ভাববিলাস' তার সৃষ্টি প্রতিভাকে নিয়ন্ত্রিত করেনি। তাই রাঢ়-বঙ্গের যথার্থ রূপদক্ষ শিল্পী হয়ে উঠতে পেরেছিলেন।

রাঢ়-ভূমির জীবনের সঙ্গে তারাশঙ্করের যোগ ছিল নাড়ির। দক্ষিণ-পূর্ব বীরভূমের রুক্ষ প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে বিচিত্র অন্তেবাসী মানুষ, তাদের সুখ-দুঃখ, ভালোবাসা-বেদনা, আদিমতা জৈবতা নিয়ে এক অভূতপূর্ব শিল্পমূর্তিতে বিচরণ করেছে তার গল্পভূমিতে। জীবন অভিজ্ঞতার এই বিস্তৃত সীমাপরিধি সমকালে কোন গল্প লেখকের মধ্যেই ছিল না। সম্পূর্ণ নূতন এক ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে সহজ স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে উঠে এসেছে হাড়ি ডাোন বাগদী বাউড়ী মাঝি বেদে প্রভৃতি মৃত্তিকাসম্ভব ব্রাত্য-মন্ত্রহীন মানুষের বলিষ্ঠ জীবনকথা। আদিম এই জনজীবনে মানুষ হত্যা করে মানুষকে, নাগিনীর সঙ্গে সহবাস করে মানুষ, কুসংস্কার 'ডাইনি' করে তোলে রক্তমাংসের নারীকে। এইসব মানুষের ভাষা সংস্কৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির এক বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। অঞ্চল এখানে জীবন্ত হয়ে মানুষের জীবনকে ধারণ করে আছে। পরিশীলিত জীবনের সংযম এই জীবন-যাত্রায় দূরবর্তী। জৈব প্রাবল্যে তাদের চাহিদা এত বেশি যে, সেই চাহিদার বশীভূত হয়ে তারা মানবিক সম্পর্কগুলিকেও দলিত করতে কুণ্ঠিত হয় না। এরকম অন্ত্যজ মানুষের মহামিছিল থেকেই উঠে এসেছে গণুটিয়া ঘাটের মাঝি তারিণীর গল্প। রাঢ়-ভূমির আদিম অমার্জিত বিশেষ গোষ্ঠীজীবনের (Community life) যে বস্তুনিষ্ঠ ছবি গল্পটিতে উদঘাটিত হয়েছে, বাংলা সাহিত্যে তা অভিনব।

সত্যকারের রক্তমাংসের জীবদেহে মানব ধর্মের জয়পরাজয়ের দ্বন্দ্বই তারাশঙ্করের ছোটগল্পের প্রধান উপকরণ। সে কারণেই যে বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতার রসে পরিপূর্ণ হয়ে তার গল্পের মানসলোক গড়ে উঠেছে, তার মূল ধারাটি লোকায়ত নারী পুরুষের আদিম প্রবৃত্তির জীবন-পিপাসা পুষ্ট। এই জৈব প্রবৃত্তিই নিয়তির আমোঘ লীলারূপে পরিচালিত করেছ তাদের জীবনকে; টেনে নিয়ে গেছে এক অনিবার্য অপ্রতিরোধ্য পরিণামের দিকে। আদিমধর্মী সেই জনজাতির বাস্তব জীবনরহস্যকেই দুচোখ ভরে দেখেছেন শিল্পী 'তারিণী মাঝি' গল্পে। তারিণী মহিমময় মানুষের জীবনভাষ্য। মানুষের মধ্যে প্রবৃত্তি রূপিণী যে জৈব চেতনা, তারাশঙ্কর তার সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ করেন নি;

কেবল তারিণীর জীবনে কিভাবে নিয়তি স্বরূপ আবির্ভূত হয়েছিল, কিভাবেই বা মূহুর্তের জন্য রুদ্ধ করে দিয়েছিল তার সহজাত মানবিক চেতনা দ্বারকে, কৌতূহলী দৃষ্টিতে সেই রহস্যকেই উপভোগ করেছেন। সমালোচক যথার্থই বলেছেন, "এ গল্পে একেবারে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রেম ও আত্মরক্ষার দ্বন্দ্বে পরম নিষ্ঠুর জীবন সত্যের রহস্য উন্মোচিত হয়েছে।"

নিজের প্রাণিক অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখাই জীবজগতের প্রাথমিক শর্ত। জীবনরক্ষার জীয়ন কাঠি সেই আদিম জৈব চেতনার পাশববৃত্তিকে চকিতের মধ্যে কিভাবে স্পর্শ করা যায় মানবজীবনের সেই গূঢ় প্রহেলিকার অচিন পাখিটিকে শিল্পের মন-বেড়ি দিয়ে ধরেছেন তারাশঙ্কর আলোচ্য গল্পে। অবশ্য এর আগেই নিজের প্রথম মুদ্রিত উপন্যাস চৈতালী ঘূর্ণিতে (১৯৩১) বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছিলেন এই ভাবে: "মানুষের জন্মগত সংস্কার হইতেছে মরণ হইতে জীবনকে বাঁচানো দুনিয়ার সর্বধর্ম সর্বদ্রব্যের বিনিময়ে আপন অস্তিত্ব জীব বজায় রাখিতে চায়, সৃষ্টি হইতে এই নগ্ন সত্যটাকে মানুষের ইতিহাস প্রমাণ করিয়া আসিয়াছে।" 'তারিণী মাঝি' গল্পের দেহে মনে সে কথা পুনরুচ্চারিত হল তির্যক ভঙ্গিতে। দেশকালের বন্ধনযুক্ত চিরন্তন আদিমবৃত্তি কিন্তু যৌনতা নয়, আত্মরক্ষার প্রাণপণ প্রচেষ্টা। দারিদ্র, প্রাকৃতিক বিপর্যয় তারিণী সুখীর পরম প্রশান্তির সুখ নীড় ভেঙে দিলেও, ভাঙতে পারেনি তাদের হৃদয় বন্ধন। সে বন্ধন ছিন্ন হয় জীবজগতে টিকে থাকার আদিম লড়াইয়ে। ময়ূরাক্ষীর প্রবল বন্যায় ভাসমান সুখী পরম নির্ভরতায় স্বামীকে জড়িয়ে ধরে, তখন আলো ও মাটি'র আকুল আকাঙক্ষায় ঘূর্ণিতে তলিয়ে যাওয়া তারিণী সুখীকে গলা টিপে হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করেনি। প্রাণের অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নে আপোস করেনি প্রেমের সঙ্গে। কিন্তু নির্মম রূঢ়তায় প্রেমকে অস্বীকার করলেও জীবনকে করেনি; তাই আলো ও মাটির জন্য তার প্রার্থনা। 'জীবন রহস্যের নিগুঢ় অর্থদ্যোতনায়' তারিণী মাঝি অতুলনীয় ।

'তারিণী মাঝি' মনস্তাত্ত্বিক গল্প নয়, আখ্যানধর্মীও ততটা নয়, যতটা চরিত্র ও পরিবেশধর্মী। প্রকৃতি ও মানুষের নিগূঢ় সম্পর্কের রহস্যময় দিকটির উদঘাটনে তারাশঙ্করের শিল্প সাফল্য কোন প্রশ্ন তোলার অবকাশ রাখেনি এখানে। গল্পের

প্রেক্ষাপট প্রত্যক্ষ বাস্তব লেখকের চোখে দেখা জীবনের কাহিনি। একটি নদী ও গুটি দুই-তিন চরিত্রকে ঘিরেই সে কাহিনি আবর্তিত। প্রধান চরিত্র তারিণী ময়ূরাক্ষী নদী তীরবর্তী গুণটিয়ার ঘাটে খেয়া পারাপার করে জীবিকা নির্বাহ করে কোনক্রমে। এই কাজে তার একমাত্র সঙ্গী কালাচাদ, আর ঘরে আছে নিঃসন্তান প্রিয়তমা স্ত্রী সুখী। ময়ুরাক্ষীর সঙ্গে তারিণীর প্রাণের সম্পর্ক, সে যেন ওই নদীর জলজ জীব। তার নিজের ভাষায়—'ই আমার জলের শরীল'। ময়ূরাক্ষীর চরিত্রটিও বেশ রহস্যময়। বছরের সাত-আট মাস নদীগর্ভ রূপান্তরিত হয় একদেড় মাইল চওড়া ধূ ধূ মরুভূমিতে। রাঢ়-ভূমির অধিকাংশ নদীর বৈশিষ্ট্যই এরকম। পায়ে হেঁটে জলহীন নদী পারাপার করে মানুষ। দরিদ্র তারিণীর তখন কষ্টের চূড়ান্ত, মনের কষ্ট ও অন্নকষ্ট দুইই। তারিণীর দিন আর চলে না। সরকারী কর্মচারীদের বাইসি ঘাড়ে করিয়া নদী পার করিয়া দুই-চারিটা পয়সা মেলে, তাহাতেই সে মদ খায়। মাঝি-জীবনে এর চেয়ে বেদনাদায়ক ঘটনা আর কি হতে পারে! নদীতে অল্প জল থাকলেও তার দুঃখ ঘোচে না। হাঁটুজল ভেঙে পার না হতে চাওয়া দু'একজন ভদ্রলোকই তখন সওয়ারী হয়, তারিণী ও কালাচাঁদ ডোঙা (নৌকা) ঠেলে নদী পার করে।

বৃষ্টির চারটি মাস পারাপারের মরসুম। তারিণী প্রতি বছর দশহরার দিন তাই ময়ূরাক্ষীর পূজা করে আকাশ ভেঙে বর্ষায় আশায়। লোকে বলে, শালা বানের লেগে পূজো দেয়। অথচ ময়ুরাক্ষী এ অঞ্চলের লক্ষ্মী; তার পলিতে যেমন দেশে সোনা ফলে, তেমনি ওই ময়রাক্ষীর প্রসাদেই তারিণীর অন্নবস্ত্রের অভাব হয় না। পারানির কড়ি শুধু নয়, বানভাসী জিনিস-পত্রও কম পায় না তারা। এ নিয়ে মরসুমের প্রারম্ভে দু'এক প্রস্ত ঝগড়াও হয়ে যায় তারিণীর সঙ্গে কালাচাঁদের । উভয়ের দ্বন্দ্বে সুখী মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া সব মিটাইয়া দেয়।

বর্ষা এলেই ময়ূরাক্ষীর রূপ যায় বদলে। তারিণীও হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। বন্যার প্রথম দিন বিপুল আনন্দে সে তালগাছের মত উঁচু পাড়ের উপর হইতে ঝাপ দিয়া নদীর বুকে পড়িয়া বন্যার জল আরো উচ্ছল ও চঞ্চল করে তোলে। ময়ূরাক্ষীও ক্রমশ হয়ে ওঠে রাক্ষসীর মত ভয়ঙ্করী ও খরস্রোতা। দুই পার্শ্বে চার-পাঁচ মাইল গাঢ় পিঙ্গল বর্ণ

জলস্রোতে পরিব্যাপ্ত করিয়া বিপুল স্রোতে সে তখন ছুটিয়া চলে। এই রকম একটি নদী ও একটি মানুষের প্রাণিক সম্বন্ধ সূত্রের প্রেক্ষাপটেই বর্তমান গল্পের সূচনা। আষাঢ় মাসে অম্বুবাচীর দিন দক্ষ মাঝি তারিণী ডোঙাভর্তি যাত্রী পারাপার করছে গণুটিয়ার ঘাটে। একটু অসতর্ক হলেই ডুবে যাবার ভয়। সহসা নদীর ওপরের দিকে এলাকুড়োর ঘাটের কাছে মানুষের আর্তকলরবে সচকিত হয় সে। অভিজ্ঞ মাঝির বুঝতে অসুবিধা হয় না অন্য ডোঙায় দুর্ঘটনা ঘটেছে। মুহূর্তে কিছু একটা অনুমান করে খরস্রোতা নদীগর্ভে ঝাপ দেয় তারিণী এবং দুই তীরের আশঙ্কিত জনতার কলরোল ও দৃষ্টির সম্মুখে স্রোতের মুখে সাঁতার কেটে অবলীলাক্রমে উদ্ধার করে আনে স্থানীয় বর্ধিষ্ণু ঘোষ পরিবারের বালিকা বধূকে। নদীর করাল গ্রাস হতে প্রাণরক্ষার বিনিময়ে বকশিস হিসাবে পায় সোনার নথ, পাঁচটি টাকা এবং দশহরার পার্বণে ধুতি ও শাড়ির আগাম প্রতিশ্রুতি। এ গল্পের পটপরিবর্তন হয় ওই দিন রাত্রে, তারিণী ও সুখীর দাম্পত্য জীবনের প্রেম চিত্রণে। নিঃসন্তান স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের আশ্রয়ে গড়ে তুলেছে ভালোবাসার ছোট্ট নীড়। অগাধ নির্ভরতায় সুখী যেমন তারিণীকে আশ্রয় করে নিজের নাম সার্থক করেছে, তেমনি তারিণীও বলে, "সুখী বড় ভাল রে কেলে, বড় ভাল। উ না থাকলে আমার হাড়িক ললাটে ডোমের দুগ্রগতি হয় ভাই।" বকশিশ পেয়ে আহ্লাদিত তারিণী আকণ্ঠ মদ্যপান করে বাড়ি ফেরে রাত্রে। দরজায় অপেক্ষার স্ত্রীকে দেখে গান ধরে—'লো-তুন হয়েছে দেশে ফাঁদি লতে আমদানি।' তারপর মত্ত অবস্থায় ভাত খেতে বসে স্ত্রীকে হিসাব দেয়, কিভাবে বানে ভাসা গোরু উদ্ধার করে সুখীর শাখা-বাঁধা হয়েছিল, কিভাবেই বা হয়েছিল কানের ফুল পুলিশ, সাহেবের বকশিশে। সে তো এই ময়ূরাক্ষীর বন্যার দৌলতেই! স্বামীর গো-ধরা অনুরোধ অয়না নিয়ে 'নত' পরতে বসে সুখী! তারিণীও অবাক বিস্ময়ে খুশি হয়ে হাঁ করে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। 'সুখীর জন্য তারিণীর সুখের সীমা নাই।'—লেখকের এই মন্তব্যের পর গল্পের পট-পরিবর্তন ঘটে তৃতীয় বারের জন্য; ঠিক এক বছর বাদে তেরোশো বিয়াল্লিশ সালের জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে।

এবারেও নিয়মমত দশহরার দিন ময়ূরাক্ষীর পূজা করে বর্ষার প্রারম্ভেই ডোঙা মেরামত করে তারিণী। কিন্তু বৃথা সে পরিশ্রম। আষাঢ় মাস চলে গেল, বান আসা তো দূরের কথা, নদীর বালি ঢেকে যায় এমন বৃষ্টিও হ'ল না। খরার প্রত্যাসন্ন বিপদের আশঙ্কায় দেশে উঠল হাহাকার। শ্রাবণের প্রথম দিকে নদীতে বান এল বটে, কিন্তু দু'তিন দিন পরে যে কে সেই। চিন্তাকুল তারিণী ময়ূরাক্ষীর এমন দুরবস্থা জীবনে দেখেনি। বৃষ্টির অভাবে দুর্ভিক্ষ ভয়াল মূর্তিতে আবির্ভূত হয়। অন্নাভাবে মরতে থাকে মানুষ। অনেকের মত নিঃসম্বল তারিণীও স্ত্রীর হাত ধরে গ্রামে ছেড়ে পথে বের হয় শহরের উদ্দেশে। তিন দিন পথ চলার পর অভিজ্ঞ মাঝি পশ্চিমের বাতাস ও আনুষঙ্গিক লক্ষণ দেখে বুঝতে পারে ভারি-বর্ষা আসছে। অপরাহ্নে আকাশ মেঘে ছেয়ে যায় এবং প্রবল ঝড়-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে সেই দুর্যোগের মধ্যেই দ্রুত গ্রামে ফিরে তারা দেখে ময়ূরাক্ষী কানায় কানায় পূর্ণ। বিস্তৃতি যেন পারাপার হীন।তারিণী বলিল, ডাক শুনছিস-সোঁ সোঁ ? বান আরও বাড়বে। সত্যিই সন্ধ্যার মধ্যে প্রবল বন্যা প্রবেশ করে গ্রামে। কোমর-জলে পথ-ঘাট, ঘর-দোরের চিহ্ন মুছে যায়। পশু-পক্ষী-মানুষের ভয়ার্ত চীৎকারের সঙ্গে ময়ূরাক্ষীর গর্জন মিলিমিশে এক ভয়াল পরিবেশ। বন্যার প্রলয়ঙ্করী দাপটে তারিণীর গৃহটিও রক্ষা পায় না। সপ্তাহখানেক আগে তারা গ্রাম ছেড়ে পথে বের হয়েছিল, আজ ঘর ছেড়ে জলে ভাসতে হোল অন্ধকার দুর্যোগে। এই ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যেও প্রতিবেশী ভূপতি ভল্লার ছেলেকে জল থেকে উদ্ধার করে তারিণী সহজাত প্রবণতায়। জল ক্রমশ বেড়ে ওঠায় গতিক ভালো নয় দেখে সুখীকে পিঠে নেয় সে; কিন্তু দিভ্রান্ত হয়ে নদীর প্রবল স্রোতে পড়ে খড়-কুটোর মতো ভেসে যায়। শরীর ক্রমশ আড়ষ্ট হয়ে এলেও স্ত্রীকে অভয় দেয় বটে, অথচ শেষরক্ষা করতে পারে না। ময়ূরাক্ষীর মারণ ঘূর্ণি তাদের টেনে নেয়। প্রবল নির্ভরতায় সুখী তাকে জড়িয়ে ধরে নাগপাশের মতো। সেই কঠিন বন্ধনে তারিণীর দেহও অসাড় হয়ে আসে। দক্ষ মাঝির এবার চরম পরীক্ষা। একদিকে প্রিয়তমা স্ত্রী অপরদিকে নিজের প্রাণ-রক্ষার তাগিদ। অসাধারণ শৈল্পিক নির্লিপ্ততার তারাশঙ্কর নিমর্ম সেই পরিণতি নিপুণভঙ্গিতে ফুটিয়ে তুলেছেন – "তারিণী সুখীর দৃঢ় বন্ধন শিথিল করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সে আরও জোরে জড়াইয়া ধরিল। বাতাস— বাতাস! যন্ত্রণায় তারিণী জল খামচাইয়া ধরিতে লাগিল। পর মুহূর্তে হাত পড়িল সুখীর

গলায়। দুই হাতে প্রবল আক্রোশে সে সুখীর গলা পেষণ করিয়া ধরিল। সে কি তাহার উন্মও ভীষণ আক্রোশ। হাতের মুঠিতেই তাহার সমস্ত শক্তি পুঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। যে বিপুল ভারটা পাথরের মত টানে তাহাকে অতলে টানিয়া লইয়াছিল, সেটা খসিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে জলের উপরে ভাসিয়া উঠিল। আঃ, আ বুক ভরিয়া বাতাস টানিয়া লইয়া আকুলভাবে সে কামনা করিল, আলো ও মাটি।"

এক ভয়ঙ্কর সন্ধি মুহূর্তে যমযন্ত্রণায় কাতর ময়ূরাক্ষীসূত তারিণীর পুনর্জন্ম হয় আদিম পাশবিক সংহননের হাত ধরে। অথচ গল্প এখানে কত নৈব্যক্তিক উদাসীনতায় গড়া। এই ধরনের বর্ণনাকেই বোধ হয় বলা হয়ে থাকে 'most brutal of all brutalist' নির্মমতার দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্প অপেক্ষা 'তারিণী মাঝি' কোন অংশে কম নয়। দুঃখীরাম রুই এর হাতে রাধার মৃত্যুর মত সুখীর হত্যাও সংঘটিত হয়েছে আদিম উপায়ে। উভয় ক্ষেত্রেই কারণ ছিল জৈব-উত্তেজনা; একটিতে ক্ষুধা ও ক্রোধ,অপরটিতে প্রাণ রক্ষার মৌলিক তাগিদ। রাধার মতই সুখীর সামনে মৃত্যুর কোন বিকল্প ছিল না। পরবর্তীকালে 'বিচারক' (১৯৫৬) উপন্যাসেও একই ধরনের একটি নির্মম হত্যা দৃশ্য তারাশঙ্কর উপস্থিত করেছেন। সেখানে অবশ্য এক ভাই আত্মরক্ষার জৈব-তাগিদে নিমজ্জমান ভাইয়ের দুহাতের শ্বাসরোধী মৃত্যু শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে গিয়ে তাকে হত্যা করে। 'তারিণী মাঝি' গল্পের নির্মম পরিণাম ক্রূর ভয়াবহ হলেও লেখকের বক্তব্যের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এর মধ্যেই নিহিত। মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠতম মাপকাঠি প্রেমের চূড়ান্ত পরাজয় প্রবৃত্তির তাড়না সম্ভূত জৈব-শক্তির কাছে। অপর দিকে গল্পের পিনদ্ধ একমুখী পরিণতিতে তারিণীর জীবনে সত্যের একমাত্র উপায়টিও চিহ্নিত হয়েছে সুচারুরূপে দুটি আভিপ্রায়িক শব্দ ব্যবহারে; আলো ও মাটির জন্য তার আকুল আকাঙক্ষায়। জীবনের এই একটি মুহূর্তের অভিজ্ঞতায় 'তারিণী-মাঝি' সার্থক ছোটগল্প। সুসমালোচক বলেছেন, "তর্ক নয়, তত্ত্ব নয়, একটি চরম মুহূর্তে গল্পটিকে পৌঁছে দিয়ে জীবন সত্যের রহস্যোন্মীলন। যে-কোনো মানদণ্ডেই 'তারিণী মাঝি' ছোটগল্প হিসাবে অনবদ্য। উপসংহারে এই চমকপ্রদ অনিবার্যতা-সৃষ্টি অপূর্ববস্তু-নির্মাণ ক্ষমা-প্রজ্ঞার দ্বারাই সম্ভব। জীবধর্ম ও প্রাণধর্মের মধ্যে কোনটি বলবত্তর, লেখক তা স্রষ্টার মতো

নির্বিকার ঔদাসীন্যেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। মনে হয়, লেখকের নিরাসক্তি এই গল্পে হৃদয়হীনতার চরমে উপনীত হয়েছে।"

আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর জানিয়েছেন, সাহিত্যজীবনের ক্ষেত্রে একদিকে তিনি কল্পনাপ্রিয় কবি', অন্যদিকে নানা তথ্য সন্ধানী সামাজিক'। শেষোক্ত এই প্রবণতায় 'তারিণীমাঝি' গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে আদিমতাধর্মী জীবনের প্রতি টান ও মানবজীবনের মহিমা। তারিণী কালাচাঁদ সেই জীবনের অঙ্গনেই চলাফেরা করেছে। প্রথমটি অনাবৃত যথাতথ্য (unsophisticated reality), এদের অপরিশীলিত অমার্জিত জীবন স্বভাবে যার প্রকাশ। দ্বিতীয়টি সেই প্রবল জীবনের স্বভাব-তীব্র উদাত্ততা (grand and lofty)। 'পল্লীসমাজ'-এর আকবরের মতোই। তারিণীর বর্বরতা যেমন সহজ-স্বাভাবিক, তেমনি উদাত্ততার মহিমা-মিশ্রিত। আলোচ্য গল্পে এই দুয়ের প্রখর মূর্তিকেই শিল্প রূপে গড়েছেন লেখক মৌল প্রবৃত্তি তাড়িত আদিম জীবনের আঞ্চলিক বেদিতে।

শিল্প প্রবণতার দিক থেকে এই ধরনের বিষয় বিন্যাস মহাকাব্যিক জীবনাবেদন পুষ্ট। শূরযুগের (Heroic age) কাব্যের মতোই তারিণীর গল্প বিশেষ দেশকালের গোষ্ঠীজীবন সম্পৃক্ত। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তারাশঙ্করের 'ভেঙে গড়ার গভীর স্বপ্ন'; যাকে তিনি বলেছেন কল্পনা প্রিয় কবি দৃষ্টি। অর্থাৎ এমন সব বিষয়ে মানুষের চৈতন্যকে উদ্দীপ্ত, উদ্বোধিত বা আশ্লিষ্ট করা, যার মধ্যে নিত্যতা আছে, মহিমা আছে, মুক্তি আছে, যা ব্যাপক এবং গভীর। তারিণীর আদিমতা ধর্মী জীবনের ভয়াবহ পরিণতিতে তারাশঙ্করের যে প্রত্যয়নিষ্ঠ জীবনরসহ্য চেতনা, তা উক্ত কবি-স্বভাবের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত।

'তারিণীমাঝি' গল্পটি উপস্থাপিত হয়েছে মিশ্রধর্মী (Half narrative, half dramatic) শৈলীতে। বিবৃতিধর্মী গল্প হলেও সেই বিবৃতির মধ্যে আছে আকস্মিকতাজনিত নাটকীয় চমক। অর্থাৎ অপ্রত্যাশিত চমক দিয়ে পাঠকের মনকে জাগিয়ে রাখতে চান শিল্পী। কায়িক এই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পূর্বোক্ত দুটি চারি ধর্ম। প্রথমত মহাকাব্যিক আবেদন পুষ্ট বিন্যাসধর্ম; যার একদিকে আছে আদিম ও উদাত্ত জীবন, অপরদিকে আছে সেই জীবনের সামগ্রের প্রতি লেখকের আকর্ষণ। দ্বিতীয়ত প্রগাঢ় ও প্রযত্ন উচ্চারিত কাব্যিকতা ও কবি প্রত্যয়।

একটা নাটকীয় চমক দিয়ে কাহিনীর সত্রপাত হয়েছে গল্পের নামচরিত্র তারিণীর চেহারার বর্ণনা ও বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে। গণুটিয়ার ঘাটে সে সমালাচ্ছে অম্বুবাচী উপলক্ষে ফেরত যাত্রীর ভিড়। তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনার (imatter of fact) সঙ্গে তারিণী এবং যাত্রীদের সংলাপকে গেঁথে গল্পের পটভূমি নির্মাণ করেছেন তারাশঙ্কর। এই সংলাপে আছে নাটকীয়তা "তারিণী তামাক খাইতে খাইতে হাঁক মারিয়া উঠিল, আর লয়গো ঠাকরুণরা, আর লয়। গঙ্গাচান করে পুণ্যির বোঝায় ভারী হয়ে আইছ সব।" তারিণীকে কেন্দ্র করে একটা সামাগ্রিক জীবনকে ধরতে চান শিল্পী;—তাই গল্পে চলে আসে স্থানীয় চপলা তরুণী সাবি ওরফে সাবিত্রীর প্রসঙ্গ। আস্তে আস্তে গড়ে উঠতে থাকে মহাকব্যিক পরিমণ্ডল। এর মধ্যে লেখকের কবিধর্মও ক্রিয়াশীল। জটিলতাহীন সহজ-সরল জীবনে ওঠে কৌতুক রসের লঘু তরঙ্গ —"তারিণী জোড় হাত করিয়া বলিল, আজ্ঞে মা, একবারেই যে আপনারা গাঙের ঢেউ মাথায় করে আইছেন সব। যাত্রীর দল কলরব করিয়া হাসিয়া উঠিল। ...লগির খোঁচা মারিয়া তারিণী বলিল, হরি হরি বল সব— হরিবোল। যাত্রীদল সমস্বরে হরিবোল দিয়া উঠিল—হরিবোল। দুই তীরের বনভূমিতে সে কলরোল প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিতেছিল।" এপিক জীবনের ছবি আঁকছেন শিল্পী,— তাই সমগ্র অঞ্চলটি পরিপূর্ণভাবে দীর্ঘ ক্যানভাসে ফুটে উঠেছে কাব্যিক আড়ম্বরপূর্ণ ভাষায়। এই হরিধ্বনি তারিণীর নিজের মঙ্গলাকাঙ্খায় নয়, যে গোষ্ঠীজীবনের কথা লেখক বলতে চাইছেন, সেই জীবনের ভাষ্য। তারিণী মাঝির খুঁটিনাটি সমস্ত অভিব্যক্তিই স্থাপত্য শিল্পীর মতো কেটে দেখিয়েছেন গল্পকার জীবনের গভীরতম প্রদেশ থেকে। পাঠকের রুদ্ধশ্বাস কৌতূহলকে টান টান করে ধরে রাখার জন্য গল্পের পরের ধাপে পুনরায় নাটকীয় চমক ওলকুড়ার ঘাটে নৌকা দুর্ঘটার প্রসঙ্গে —"তারিণী বলিল, পাল খাটিওনা ঠাকুর, পাল খাটিওনা। তুমিই উড়ে যাবা। লোকটি ছাতা বন্ধ করিয়া দিল।" সহসা নদীর উপরের দিকে একটা কলরব ধ্বনিত হইয়া উঠিল— আর্তকলরব। ডোঙার যাত্রীসব সচকিত হইয়া পড়িল। তারিণী ধীরভাবে লগি চালাইয়া বলিল, "এই, সব হুঁশ করে! তোমাদের কিছু হয় নাই। ডোঙা ডুবেছে ওলকুড়োর ঘাটে। এই বুড়িমা, কাপছ কেনে ধর ধর ঠাকুর, বুড়িকে ধর। ভয় কি। এই আমরা আর-ঘাটে এসে গেইছি।" গল্পের ক্রম উন্মোচনে এইভাবে গোষ্ঠীজীবনের ভিতর থেকে

গড়ে উঠছে ব্যক্তিমানুষ। তারিণী সন্তর্পণে যেমন বিপদ থেকে যাত্রীদের সচেতন করে, অভয় দেয়, তেমনি নিজের দায়িত্ব সম্পর্কেও পূর্ণ সজাগ। আদিম জীবনসম্পৃক্ত শিল্পী ছোটগল্পের মুহূর্ত কেন্দ্রিকতার প্রতি আগ্রহে কাহিনীকে টেনে নিয়ে চলেছেন ঘটনা ও চরিত্রকে এক সূত্রে বেঁধে। হঠাৎ খরস্রোতা নদীগর্ভে ঝপ এবং অবলীলায় ঘোষ পরিবারের পুত্রবধূকে উদ্ধার করার ঘটনায় দুঃসাহসী তারিণীর চরিত্র তার চেহারার মতোই উদাত্ততায় দীর্ঘ হয়ে ওঠে। ভঁজে ভাজ উন্মোচিত হতে থাকে তার স্বভাব স্বতন্ত্র সত্তা যথাযথ আদিম পরিমণ্ডলের মধ্য থেকে। তারিণী নদীতে ঝাঁপ দিলে "কয়েকটি বৃদ্ধা কঁদিয়া উঠিল ও বাবা তারিণী, আমাদের কি হবে বাবা। কালার্টাদ বলিয়া উঠিল, এই বুড়িরা পেছু ডাকে দেখ দেখি। মরবি, মরবি, তোরা মরবি।" এই অমার্জিত (unsophisticated) নির্দয় স্থূলতা (cudity) যূথবদ্ধ প্রাকৃত জীবনের পক্ষেই বোধহয় সম্ভব!

অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্রের আকাঙ্ক্ষা ছিল মধ্যবিত্ত জীবনের প্রতি। তার মাঝির (ঈশ্বর পাটুনী) প্রার্থনা--আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে। আর বিশ শতকের শিল্পী বরাশঙ্করের তারিণী মাঝির আকাঙ্খা—'এক

হাঁড়ি মদের দাম—আট আনা।' এই আদিম চাহিদার একটিমাত্র বাক্যই সমগ্র পটভূমি থেকে তার জীবন-চরিত্রকে এক মুহূর্তে উদ্ভাসিত করে টয়েছে। ময়ুরাক্ষীর বিপদ থেকে সকলকে ত্রাণ করাটাই তার কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয় সমস্ত রকম উচ্চাশা ও আশঙ্কা রহিত ছিল তার চাওয়া। চরিত্রটিতে মাহাকাব্যিক উদাত্ততা চিহ্নিত হয়ে গেছে এরকম ভাবেই। অবশ্য এই চাহিদার মধ্য থেকেই তারিণী চরিত্রের দ্বৈত সত্তাটুকু উদঘাটিত করেছেন লেখক। প্রথমে চাই নেশার উপকরণ,-আদিম প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি।

দ্বিতীয় চাওয়াটি সচেতন মানুষের, সেখানে আছে প্রেম;- স্ত্রীর জন্য ফাদিনথ এবং চাদরের বদলে শাড়ি। প্রবৃত্তি ও প্রেমের এই টানাপোড়েনের মধ্য দিয়েই তারাশঙ্কর খুঁজে ফিরেছেন জীবনের রহস্যকে। ঘোষ পরিবারের বালিকা বধূটির সোনার নথ উপহার দেওয়ার ঘটনার মধ্যেও আছে মহাকাব্যিক জীবনের মতো মহৎ উদারতার ব্যাপার। তারিণীর হাতে নথ প্রদানের ভঙ্গিটিও বেশ নাটকীয় – "বধূটির ঘোমটা খুলে

নাই, দীর্ঘ অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে তাহার গৌরবর্ণ কচি হাতখানি বাহির হইয়া আসিল—রাঙা করতলের উপর সোনার নথখানি রৌদ্রাভায় ঝকঝক করিতেছে।" মহিমাময় এই ঔদার্যের ছবি পরিস্ফুট হয়েছে কাব্যিক ভাষায়। অন্যপক্ষে আকণ্ঠ মদ্যপানে চুর তারিণীর উক্তি ও আচরণের মধ্য দিয়ে তার জীবনের মূল সুরটিকে ধরিয়েছেন লেখক। "তারিণী বলিল, জলাম্পয়সব জলাম্পয় হয়ে যায়, সাঁতরে বাড়ি চলে যাই। শালা খাল নাই, নেলা নাই, সমান সব সমান। টলিতে টলিতেই সে শূন্যের বায়ুমণ্ডলে হাত ছুঁড়িয়া ঘুড়িয়া সাঁতারের অভিনয় করিয়া চলিয়াছিল।"—একেই বলে মহাকাব্যিক করণকৌশল (Epic craftsinanship)। মাঝি জীবনের আদিম চেতনায় তার মৌলিক রূপটি উদঘাটিত হয়। মত্ত অবস্থায় তারিণীর হাঁটার চেয়ে সাঁতার দিতেই মন চায় বেশি। অথত সাঁতার দিতে গিয়েই সে জীবনের সব হারিয়ে বসে আছে। গল্পের পরিণতিতে তারিণী চরিত্রের সেই ড্রামাটিক আয়রনির (Dramatic irony) মূল সুরটি তারে বাঁধা হয়ে যায়। আদিমতার পরের ধাপেই আসে প্রেম। বাড়ির দরজায় অপেক্ষারত স্ত্রীকে দেখে জড়ানো গলায় মাঝি গান ধরে ফাদি লতে'র আমদানি'র উল্লাসে। একদিকে প্রবৃত্তি অপরদিকে হৃদয়বৃত্তি—এই দুই পরস্পরবিরোধী সংশয়ের মধ্য দিয়ে গল্প পৌঁছে যায় চড়ান্ত পরিণতিতে।

তারাশঙ্করের যে দৃষ্টি 'তথ্য সন্ধানী সামাজিক', সেই দেখায় গল্পের আঞ্চলিক পটভূমি ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে লঙঘন করে যায় না। এই কারণেই সাল-তারিখের আভিপ্রায়িক উল্লেখ। ময়ূরাক্ষীর পরিপূর্ণ ছবি তো আছেই, সমগ্রকে ধরার প্রবণতায় নদীর পারিপার্শ্বিক ভৌগোলিক ও সমাজ পরিবেশগত টুকরো বর্ণনাও লেখকের কলমে উঠে আসে অবলীলায়, গ্রামীণ সমাজ ফায়যুতার সীমান্ত-ভূমিতে যন্ত্রনির্ভর ধনতান্ত্রিক জীবন-প্রাধান্যের যুগসন্ধিতে তারাশঙ্করের অবস্থান। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মৃতপ্রায় গ্রামগুলিতে সরকারী কর্মচারীদের আসা যাওয়ার হিড়িক, তাদের 'বাইসিকল' এবং *ফেলে* দেওয়া সিগারেটের কুটি', ক্যানেল' (প্রকৃতির ওপর প্রযুক্তির প্রভাব?) প্রভৃতির উল্লেখে সেই বিশেষ যুগজীবনের ছবিও চকিতে উকি মেরে যায় গল্পে।

গ্রামীণ জীবন অভিজ্ঞতা আঞ্চলিক সীমার খণ্ডচিত্রে ধরে দিয়েছেন শিল্পীর সহানুভুতিমি অনুভবে। অর্থনৈতিক নিশ্চয়তাহীন জন-জাতির গল্পে ডোঙা ভাসলে তবেই সংসার চলে। তিন তিল করে সঞ্চিত সুখীর জমানো টাকায় কোনক্রমে তানিণীর ভাত জুটলেও সরকারী কালাচাঁদ বলে, মলাম আমরাই। অভাবের দিনে পাকা তাল তাদের উদরপূর্তির একমাত্র সম্বল। কিন্তু দারিদ্যের ছবিটাও পুরো চাই লেখকের। তাই কেবল অন্তেবাসী গরিব মানুষের কথা নয়, ভদ্র গৃহস্থের অভাবজনিত মর্মান্তিক করুণ চিত্রও অঙ্কিত হয়েছে; লিপিবদ্ধ হয়েছে পরাধীন ভারতবর্ষের দুঃস্থ গ্রামীণ প্রজার ইতিহাস।এইভাবেই ছোটগল্পের মধ্যে উঠে আসে আদিমতাধর্মী এপিক-জীবনের পরিমণ্ডল। খরা এবং বন্যার মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়। গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের কাছে ত্রাস স্বরূপ। তার ভয়ঙ্কর কনায় প্রকৃতি-মানুষ-প্রাণী সব একাকার হয়ে যায় শিল্পীর লেখনীতে ? “দেখিতে দেখিতে দেশে হাহাকার পড়িয়া গেল। দুর্ভিক্ষ যেন দেশের মাটির তলেই আত্মগোপন করিয়াছিল, মাটির ফাটলের মধ্য দিয়া পথ পাইয়া সে ভয়াল মূর্তিতে আত্মগোপন করিয়া বসিল। গৃহস্থ আপনার ভাণ্ডার বন্ধ করিল। জনমজুরের মধ্যে উপবাস শুরু হইল। দলে দলে লোক দেশ ছাড়িতে আরম্ভ করিল।.... “পরদিন ঘটে এক বীভৎস কাণ্ড। মাঠের পাশেই এক বৃদ্ধার মৃতদেহ পড়িয়াছিল। কতকটা তার শৃগাল-কুকুরে ছিড়িয়া খাইয়াছে। তারিণী চিনিল, একটি মুচি পরিবারের বৃদ্ধা মাতা ও হতভাগিনী। গত অপরাহ্নে চলচ্ছক্তিহীনা বৃদ্ধার মৃত্যু কামনা বারবার তাহারা করিতেছিল।”

কিংবা এর বিপরীত পরিবেশের চিত্রঃ “গ্রামের মধ্যেও বন্যা প্রবেশ করিয়াছে। এক কোমর জলে পথঘাট ঘরদ্বার সব ভরিয়া গিয়াছে। পথের উপর দাঁড়াইয়া গ্রামের নরনারী আর্ত চীৎকার করিয়া এ উহাকে ডাকিতেছে। গরু ছাগল ভেড়া কুকুরের সে কি ভয়ার্ত চীৎকার। কিন্তু সে সমস্ত শব্দ আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল ময়ূরাক্ষীর গর্জন, বাতাসের অট্টহ্য আর বর্ষণের শব্দ; লুণ্ঠনকারী ডাকাতের দল অট্টহাস্য ও চীৎকারে যেমন করিয়া ভয়ার্ত গৃহস্থের ক্রন্দন ঢাকিয়া দেয়, ঠিক তেমনই ভাবে।”

প্রগাঢ় ও প্রযত্ন উচ্চারিত এই ধরনের গদ্যায়ত কাবিকতায় রচিত হয়েছে গল্পের চূড়ান্ত মুহূর্তগুলি। চিত্রধর্মী শিল্পী ভয়ানকতার ছবি এঁকেছেন ছোট ছোট প্যারাগ্রাফে এবং

চরিত্রের সংলাপের মধ্য দিয়ে। অনুপ্প ও যথাযথ বাস্তবতায় সমগ্রের পরিচয় বহন করে গল্প অগ্রসর হয়েছে চূড়ান্ত ক্লাইম্যাক্সের (climax) এক কেন্দ্রিকতার দিকে। খণ্ড খণ্ড বিষয়ের রূপচিত্র ও ঘটনাকে ধারণ করে আছে সহজ-সরল প্লটের চরিত্রধর্মী গল্প। যেখানে অনবৃত আদিমতা ও উদার ব্যাপ্তির মহাকাব্যিক পরিমণ্ডলের মধ্য থেকে বিশেষ এক অনুভবের মুহূর্তে আবিষ্কার করে দিয়েছেন গঙ্গাকার তারিণীর জীবনের অপার রহস্যকে।

গল্পটিতে কল্লোলের লেখকদের মতো তীক্ষ্ণবুদ্ধির চমকপ্রদ (intellectual brilliancy) নেই, চকিত সংক্ষিপ্ত বা গভীর অর্থগৌরবও' নেই, কিন্তু যা আছে তা সমকালীন অন্যান্য গল্পকারদের কাছে ঈর্ষণীয়;—সেটি হল সুগভীর জীবন রস-রসিকতা। বিলম্বিত লয়ে কাহিনী আরম্ভ হলেও ঘটনাগুলি বিন্যস্ত হয়েছে মূল লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখেই। প্রতিটি ঘটনার পরিমণ্ডল রচিত হয়েছে সুন্দরভাবে। শেষদিকে তারিণী ও সুখী গ্রামে ফিরে আসার পর বর্ণনা দ্রুত লয়ে অগ্রসর হয়েছে। ময়ূরাক্ষীর করাল বিভীষিকার মতোই প্রবল গতিবেগের চাপ ও আততি (Tension) পাঠককে করেছে বিস্ময়-বিমূঢ়। আকস্মিকতাজনিত নাটকীয় চমক আছে সমাপ্তি বাক্যটিতে, বিশেষ করে শেষ দুটি ইঙ্গিতধর্মী শব্দে। "আঃ, আঃ বুক ভরিয়া বাতাস টানিয়া লইয়া আকুলভাবে সে কামনা করিল, আলো ও মাটি।" বর্ণনামূলক আখ্যান দিয়ে সূচনা হলেও ছোটগল্পের পরিণামী ব্যঞ্জনায় 'তারিণী মাঝি'র পরিসমাপ্তি। কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে, গল্পটি পরিণামধর্মী কোন দিক দিয়ে? স্ত্রীকে ত্রাণ' করার অক্ষমতাতেই কি তারিণীর চূড়ান্ত ট্রাজেডি?—এবার সে আলোচনায় আসা যেতে পারে।

মানবিক বৃত্তির সঙ্গে জৈব বৃত্তির সংঘাতের জটিলতা নিয়েই গড়ে উঠেছে তারাশঙ্করের গল্পজগৎ। জীবনের বিপূল অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তার মধ্য থেকে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন তিনি তারিণীর আদিমতাধর্মী জীবন রহস্যকে। সে কারণেই গল্পটি যেমন জৈব প্রবৃত্তি নির্ভর, তেমনি উদার অনাবৃত সেই জীবনের ছবি। তারিণীর মধ্যে Primitive জীবনের মহিমাময় দীপ্তির উজ্জ্বল প্রকাশ। এমন একটি মানুষের পরিণতি কোথায়? গল্পের শেষে তার জীবনের ভয়াবহ ট্রাজেডি পাঠককে বিমূঢ় স্তব্ধ করে দেয়।

ময়ূরাক্ষীর জলের রাজত্বে যে মানুষ জীবকুলের একমাত্র ত্রাণকর্তা, সেই মানুষটিই এক সময়ে নিজের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে ভয়ঙ্কর জলস্রোতে ছেড়ে দিয়েছে নিজের প্রিয়তমাকে। কিন্তু এ ট্রাজেডির স্বরূপ কি? তারিণীর ট্রাজেডি নিজের স্ত্রীকে ত্রাণ করার অক্ষমতায় নয়, নিজেকে ত্রাণ করতে গিয়ে স্ত্রীর দৈহিক বিনাশেও নয়, তারচেয়ে বড়াে কথা যে বিনষ্টি তার হাতে ঘটেছে, তা হল মনুষ্যত্বের। অথচ এই মানুষটি কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত নিজের বিপদের কথা বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে অন্যদের বাঁচিয়েছে। পরিণামে তাকেই হত্যা করতে হয় নিজের জীবন সঙ্গিনীকে আত্মরক্ষার অন্য উপায় দেখে।তারাশঙ্করের 'শ্রেষ্ঠ গল্পে'র ভূমিকায় অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "আত্মরক্ষার আদিম প্রবৃত্তির হাতে মানুষের প্রেমনির্ভরতার চরম পরাভবের ট্রাজেডিই এ গল্পের উপজীব্য। নিয়তির লীলা-রহস্য একেবারে অন্তিম মুহূর্তে, একাগ্র অনিবার্যতায় আত্মপ্রকাশ করেছে।" এই প্রসঙ্গে তিনি আত্মরতি'র জয়যুক্ত হওয়ার কথাও বলেছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে গল্পের সমাপ্তি লগ্নে লেখকের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রশ্রয় পেয়েছে বলে মনে হলেও, বস্তুত তা নয়। যাবতীয় বিশ্বাসহীনতায় গল্প শেষ হয়নি, বা কোন 'নৈরাশ্য' বা 'হতাশা'ও তেমন আবিষ্ট করে না আমাদের। শেষ দুটি শব্দে গল্পটি উত্তীর্ণ হয়ে যায় জীবনধর্মের জয়বাতায়। কল্লোলের শিল্পীরা যেখানে জৈবিক দেহকে আশ্রয় করে জীবনকে খুঁজতে বেরিয়েছিলেন, তারাশঙ্কর সেখানে জীবদেহেই বাঁধা পড়েন নি, তার থেকে উত্তরণের চেষ্টাও করেছেন বারে বারেই; এমনকি আলাে্চ্য গল্পেও। "মানুষ আছে তার দুই ভাবকে নিয়ে, একটা তার জীবভাব, আর একটি বিশ্বভাব। জীব আছে আপন উপস্থিতিকে আঁকড়ে, জীব চলেছে আশু প্রয়োজনের কেন্দ্র প্রদক্ষিণ করে। মানুষের মধ্যে সেই জীবকে পেরিয়ে গেছে সে সত্তা সে আছে আদর্শকে নিয়ে।" তারণা মাঝি গল্পে সেই জীবন আদর্শের জয়ধ্বজাই উত্তোলিত হয়েছে।

'শ্রেষ্ঠ গল্পে'র ভূমিকায় সম্পাদক আরও জানিয়েছেন, তারাশঙ্করের ছাে্টগল্পের প্রাণ মানুষের ধাতু প্রবৃত্তি। 'ধাতু-প্রবৃত্তি' বলতে বোঝানো হয়েছে মানুষের আদিম বৃত্তি অর্থাৎ 'Elemental passion'কে। মানুষের মধ্যে যে জৈবিক বেগের প্রাবল্য, তারই মৌলিক

স্বভাবের কাছে সে অসহায়। তারিণী মাঝি' গল্পেও সেই ধাতু-প্রকৃতির দুর্দমনীয় বিকাশ; এমন ধারণাই প্রচলিত। কিন্তু এলিমেন্টাল প্যাসন বা মানুষের আদিম ধাতু প্রবৃত্তিই

কি শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে তারিণীর জীবনে? তা বোধহয় না, গল্পের অন্তিম দুটি শব্দ আলো ও মাটি'র সংকেতময় ব্যঞ্জনা এ ক্ষেত্রে অনেক না বলা কথার বাণী বহন করে আনে। জল থেকে ভূমিতে, জলের গভীরে মৃত্যুর অন্ধকার থেকে প্রাণের আলোতে পৌঁছাতে চাওয়ার আকুল আর্তিতেই গল্পের পরিসমাপ্তি। তারিণী আগে চেয়েছিল নিজের জন্য 'মদ', তারপর সুখীর জন্য 'নথ'; আগে জৈব প্রবৃত্তি তারপর মানবিক হৃদয় বৃত্তি। প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টিতে উত্তীর্ণ হতে চাওয়াই তো মানুষের ধর্ম।

জগতের অভিব্যক্তি চলেছিল মূলত প্রাণীর দেহকে নিয়ে, মানুষের আবির্ভাবে তার ঝোক পড়ল চিত্তবৃত্তির দিকে। দেখা গেল দ্বন্দ্ব। "দেহে দেহে জীব স্বতন্ত্র; পৃথভাবে আপনার দেহরক্ষায় প্রবৃত্ত, তা নিয়ে প্রবল প্রতিযোগিতা। মনে মনে সে আপনার মিল পায় এবং মিল চায়, মিল না পেলে সে অকৃতার্থ।" মানুষের জীবনে 'দেহরক্ষা'র প্রতিযোগিতায় সেই মৌল প্রবৃত্তি এবং মনে মনে মিল চাওয়ার আকাঙ্খায় হৃদয় বৃত্তি,—দুইই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। টিকে থাকার চেষ্টায় রিণী প্রেমকে হত্যা করেছে, অপর দিকে জীবনে 'আলো ও মাটি'র প্রত্যাশা তার মন-বৃত্তির চূড়ান্ত আশ্রয়। এইভাবেই শিল্পী তারাশঙ্কর প্রবৃত্তির তাড়না থেকে রক্ষা করেছেন গল্পের নায়ককে। 'তারিণী মাঝি'তে কেবল সার্থক ছোটগল্পের পরিণামী ব্যঞ্জনাই নয়, আছে লেখকের কবি-চিত্তের বিশ্বাসী প্রত্যয়। সুখীর হত্যা ঘটনাতেই গল্প থেমে যায়নি, জৈব প্রবৃত্তিই শেষ কথা নয়; নতুন করে জীবনের আলো দেখবে তারিণী, স্পর্শ করবে মাটিকে মানুষের এই চিরন্তন কামনাতেই গল্পের অ-শেষ বিরতি। এ জীবন তো আসলে নানা বৈপরীত্যের সমষ্টি;- 'তারিণী মাঝি' গল্পে সেই জীবন রহস্যই তারাশঙ্করের অন্বিষ্ট। মানুষ শেষ পর্যন্ত তার আদিম জৈব প্রবৃত্তির কাছে অসহায়, আলোচ্য গল্পে মানব জীবনের সেই অন্ধকার দিকটির কথাই শুধু বলেন নি তিনি, অন্ধকারের অপর পিঠ আলোয় দিকেই মুখ ফিরিয়েছেন শেষ পর্যন্ত। মানুষের দ্বৈত সত্তা,—একটা জৈব সত্তা অপরটি মানব সত্তা। মানুষ বেঁচে থাকতে চায়, জীব চায় টিকে থাকতে। দেহকেন্দ্রিক টিকে থাকার লড়াই

(Struggle for existence) জীবজগতে, অপর পক্ষে চিৎবৃত্তির মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে মানুষ। সুন্দর করে বিষয়টি বুঝিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ –"জীবধর্ম রক্ষার চেষ্টাতেও মানুষের নিরন্তর একটা দ্বন্দ্ব আছে। সে হচ্ছে প্রাণের সঙ্গে অপ্রাণের দ্বন্দ্ব। অপ্রাণ আদিম, অপ্রাণ। বিরাট, তার কাছ থেকে রসদ সংগ্রহ করতে হয় প্রাণকে, মালমসলা নিয়ে গড়ে তুলতে হয় দেহ যন্ত্র। সেই অপ্রাণ নিষ্ঠুর মহাজনের মতো, ধার দেয় কিন্তু কেবলই টানাটানি করে ফিরে নেবার জন্যে, প্রাণকে দেউলে করে দিয়ে মিলিয়ে দিতে চায় পঞ্চভূতে।" তারিণীর জীবনেও এই 'প্রাণ' অর্থাৎ প্রেম ধর্মের সঙ্গে আদিম নিষ্ঠুর 'অপ্রাণের' দ্বন্দ্ব। তারাশঙ্কর দেহভিত্তিক মানব জীবনের আধারে মন-ভিত্তিক মানব জীবন-রহস্যকে খুঁজে ফিরেছেন এই গল্পে। একটা সীমানা পর্যন্ত ভালবাসা হ'ল জৈব প্রবৃত্তি প্রেমের এই অংশ সহজাত এবং দেহভিত্তিক। অপর পক্ষে জীবের প্রাথমিক ধর্ম আত্মরক্ষা ও প্রজনন (to exist to multiply) । একে উত্তীর্ণ হতে পারলেই তার হৃদয়বৃত্তি বা মনোবৃত্তি। রবীন্দ্রনাথ 'মানুষের ধর্ম' বলতে বুঝিয়েছেন এই বিষয়টিকেই। জৈব ধর্ম থেকে মানব ধর্মে উত্তরণ ঘটলেই মানুষের মনুষ্যত্বের স্থান হয় সভ্যতার ইতিহাস। কিন্তু শেষপর্যন্ত মৌলিক প্রবৃত্তি থেকে মানুষ মুক্ত নয় এবং সেখানেই মানব জীবনের রহস্য। মানুষের অস্তিত্বের দ্বৈত সত্তার এই রহস্যই তারাশঙ্করকে বিস্মিত করেছে প্রতি মুহূর্তে; তার ফলেই এক আশ্চর্য কৌতূহলে মানুষের জৈব রূপের বিচিত্র উৎসমুখ আবিষ্কারে হয়েছেন সচেষ্ট। তারিণী নিজেকে রক্ষার জন্যে সুখীকে হত্যা করে। কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়; এর পর চাই 'আলো ও মাটি'। শেষ মুহূর্তে বেরিয়ে আসে মানুষ আদিম জন্তুর মধ্য থেকে।

গল্প রচনার ক্ষেত্রে নিজের এই জীবন দর্শনের কথাই বলেছেন তারাশঙ্কর। জীবদেহের আধারে যে জীবন, সেখানে জৈবতাকে অতিক্রম করার চেষ্টার মধ্যেই মানব ধর্মকে খুঁজে পাওয়া যায়। সেখানেই মানুষ নিজেকে পশুর সঙ্গে পৃথক বলে জানে। প্রবৃত্তির মৌলিক প্রয়োজনে চূড়ান্ত মুহূর্তে তারিণীর হাতে পরাজয় ঘটেছে মানুষের হৃদয় বৃত্তির। কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য; পুনরায় যখন সে জেগে ওঠে, তখন তার একমাত্র কাম্য হয় অন্ধকার থেকে। মুক্তির এবং পায়ের তলায় একটু মাটি। নতুন করে বাঁচার প্রত্যাশা

যুক্ত মানবিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার জীবনাকূতি। প্রবৃত্তির বীভৎসতাকে শেষ পর্যন্ত অস্বীকার করে মানবিক হৃদয় বৃত্তিরই জাগরণ ঘটেছে গল্পে।

'জৈব প্রকৃতির বৃন্তেই' যেহেতু 'জীবন ধর্মের পুষ্পিত' বিকাশ, তাই তারাশঙ্করের আরাধ্য জীবনের বিভ্রষণা নগ্নিকা কালিকামূর্তি। জীবনের বিচিত্র অভিঘাত তার নির্মম আত্মপ্রকাশ। "জীবনসন্ধানী তারাশঙ্কর তাকে অস্বীকার করতে পারেন নি, বরং তারিণী মাঝি'র ঐ অতিমানুষিক আত্মরক্ষণের মধ্যেও 'জীবনের জয়ই' ঘোষিত হয়েছে বৈকি?— নিরাবরণ নিরাভরণ সেই জীবন ধর্মের জয়,—যার জন্যে প্রেম, প্রীতি, আত্মত্যাগ ইত্যাদি সকল মহৎ মূল্যবোধের লালন ও বর্ধন মানুষের ইতিহাসে অনিবার্য হয়ে পড়ে।...এই গল্পের ফলশ্রুতি জীবনের প্রতি ঔদাসীন্য অথবা ব্যথা-বিরাগ সৃষ্টি করে না; বরং স্তব্ধ বিস্মিত, বিমূঢ় অন্তকরণকে আকর্ষণ করে সেই অমোঘ দুয়ে জীবন রহস্যের প্রতি, তারিণীর মধ্যে যা উন্মত্ত আত্মরক্ষার প্রলয়ঙ্কর বুভুক্ষু মূর্তিতে হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে সুখীকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। শক্তির সেই অনাবৃত আদিম উদাও স্বরূপের জয়গান লক্ষ্য করি আদিম মহাকব্যে।"

তারাশঙ্করের জীবনদর্শন বিশ্বাসহীনতায় মগ্ন নয়, জীবনের প্রবল ভাঙনের মধ্যেই গড়ার স্বপ্নে তিনি নিষ্ঠাবান শুধু নয়, প্রত্যয়বান শিল্পী। তারিণীর বাঁচবার প্রত্যাশাই ওইটুকু তরঙ্গের ইঙ্গিত তুলেছে। এর মধ্য দিয়ে জীবনের কোন্ পরিণামকে মানুষ খুঁজে ফিরছে, কোথায় তার পরিণতি কেউ জানে না। জীবন রহস্যের এই জিজ্ঞাসাই তারিণী মাঝি গল্পের প্রাণ।

গল্পটি পরিণামধর্মিতায় প্রকৃতি ও প্রেমের একটা বড় ভূমিকা আছে। তারিণীর জীবন রহস্য উদঘাটনেই এর অবতারণা। একদিকে পারিবারিক জীবনের ছবি,-তারিণী-সুখীর দাম্পত্য জীবনের মধুরতা; অপরদিকে সেই পরিবারের অন্নদাত্রী নিয়তিস্বরূপা ভয়ঙ্করী ময়ূরাক্ষী নদী। নদীর জটিল চরিত্র প্রকৃতির রহস্য পাঠককে কৌতূহলী করে। লেখক তার যেকোন উপন্যাসের মতোই ময়ূরাক্ষীর সম্পূর্ণ ছবিটি তুলে ধরে তার প্রেক্ষাপটে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন তারিণী উপাখ্যানকে। নিখুঁত পরিবেশ বর্ণনার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে কাহিনি। প্রকৃতির বিরূপতা ও রূঢ়তাই চরিত্রকে টেনে নিয়ে গেছে চরম

পরিণতির দিকে একের পর এক ঘটনা ঘটিয়ে। পরিবেশ ও চরিত্রচিত্রণের বেণীবন্ধন এতই নিখুঁত যে, পরস্পরকে একাত্ম বলেই মনে হয়। উভয়ে উভয়ের পরিপূরক। ময়ূরাক্ষীকে বাদ দিয়ে যেমন তারিণীর কথা ভাবা যায় না, তেমনি তারিণীকে বাদ দিয়ে ময়ূরাক্ষীও অসম্পূর্ণ। মাবির সঙ্গে নদীর সম্পর্কটিও হয়েছে মানবায়িত। ময়ূরাক্ষী তার কাছে মাতৃসমা, যত প্রলয়ঙ্করী মূর্তিই ধারণ করুক, মায়ের বুকে ভয় থাকে না তার। সেখানেই বরং স্বচ্ছন্দ। সাধক কবি রামপ্রসাদ যেমন তাঁর আরাধ্যা মায়ের সঙ্গে সহজ সম্পর্কের কথা বলতেন, তারিণীর সঙ্গে ময়ূরাক্ষীর সম্পর্কও ঠিক তেমনি। সুখীকে সে বলে, 'যা, তু যা, এখুনি ডাক্ লদীর পার থেকে—এই উঠে আয় হারামজাদা লদী। উঠে আসবে। যা যা।'

যা real, তাই হল প্রকৃতি বা নিসর্গ; গল্পের সঙ্গে তা সংযুক্ত থাকে। ময়ুরাক্ষী তীরবর্তী আদিম মনুষ্য অধ্যুষিত অঞ্চলের ছবি আঁকতে আঁকতে গিয়ে সেই real কেই তুলে এনেছেন। শিল্পী তারাশঙ্কর। বিপরীতধর্মী পরিবেশ চিত্রণের ফলে নিসর্গ প্রকৃতির বৈরীতার অখণ্ড রূপটিও দুর্লভ নয়। একদিকে তার হড়পা বানের ক্রুর কুটিল রাক্ষসী মূর্তি, অপরদিকে খরাজনিত দুর্ভিক্ষের কালান্তক রূপ। এর মধ্যেই প্রবাহিত হয়েছে তারিণী-জীবনে আদিমতার লীলা।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক যে সবসময় সুখের নয়, বরং মানুষ সেই রহস্যময় শক্তির ক্রীড়নক, আলোচ্য গল্পে যেন সেই সূত্রের সন্ধান করেছেন লেখক। জগৎ প্রকৃতির সেই অদৃশ্য ভয়াল শক্তিকে পুরাকাল থেকেই ভয় ও সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখে তাকে তুষ্ট রাখার চেষ্টা মানব সভ্যতার ইতিহাসে প্রতিনিয়ত লক্ষ করা গেছে। প্রাণধারণের জন্য মানুষ যেমন বৃষ্টি-বাদল, রৌদ্র-তাপ অরণ্য প্রকৃতির প্রার্থনা করে, তেমনি বন্যা-খরা, মারী-মড়ক-মন্বন্তর ইত্যাদি প্রাকৃতিক বৈরিতা থেকে আত্মরক্ষার জন্য তুষ্ট করে এইসব ভয়ঙ্কর শক্তির কল্পিত দেবতাকে। জীবিকা ও প্রাণধারণের জন্য তারিণী দশহরার দিন গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে জলহীন ময়ূরাক্ষীর বালুকাময় গর্ভে পাঁঠা বলি দিয়ে নদীর পূজো করে, নদী কানায় কানায় পূর্ণ হলে সে পুলকিত হয়। কিন্তু ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে ময়ুরাক্ষীর সেই প্রবল বন্যাতেই নেমে আসে তার জীবনের

চরম দুর্ভাগ্য। প্রাণধারণের জন্যে যে দশহারার পূজা, পরাক্ষে সেই পূজাই ভয়ঙ্কর নিয়তিরূপে নিঃশেষ করেছিল তার জীবনকে। মনে প্রশ্ন জাগে, পুনর্জীবন প্রাপ্ত তারিণী পুনরায় কি ময়ূরাক্ষীর পূজা করবে? 'ময়রাক্ষীর পলিতে দেশে সোনা ফলে।...এই মায়ের কৃপাতেই এ মুলুকের লক্ষ্মী।' তাই তার পূজা শেষে নেশাগ্রস্ত তারিণী স্বপ্ন দেখে নদীতে বান আসার। সঙ্গী কালাচাঁদকে বলে, 'হড়-হড় কলকল বান—লে কেনে তু দশ দিন বাদ।' দুজনের কথোপকথনে যেমন উদঘাটিত হয়ে যায় বন্যাজনিত প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা, তেমনি উন্মোচিত হয় ময়ূরাক্ষীর ভয়াল মারণরূপের ছবি "কালচাঁদ বলিল, এবার মাইরি তু কিন্তু ভাসা জিনিস ধরতে পাবি না। এবার কিন্তুক র ধরব, হা! তারিণী মত্ত হাসিয়া বলিল, বড় ঘুরণ-চাকে তিনটি বুটবুটি, বুক-বুক-বুক বাস কালাচাঁদ কালাচাঁদ ফরসা।" কিন্তু কালাচাঁদ নয়, সে বছরের বন্যায় 'বড়-ঘুরণ চাকে' পড়ে তারিণীর জীবনই ফরসা হয়ে যায়। ময়ুরাক্ষীর মাতৃরূপ নিষ্ঠুর রাক্ষসীতে পরিণত হয়ে তার নদী নিভরতাকে মুহূর্তেই ট্রাজেডির পাষাণ তলে আছড়ে ফেলেছিল। গল্পের পাকতিক সংকট এইভাবেই তারিণীকে ঠেলে দিয়েছিল এক ভয়ঙ্কর মানবিক সংকটের দিকে। চালের ঘূর্ণি এক অর্থে প্রকৃতির বৈরীতা তথা তারিণীর নিয়তিরূপে তাদের ভালোবাসার বন্ধনকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। আর প্রাকৃতিক তাণ্ডবেই যেন তার মধ্যে সঞ্চারিত হয় প্রকৃতিজাত আদিম পাশাবক শাক্ত;—সে গলা টিপে ধরে সুখীর। প্রকৃতির অশুভলীলা মানুষের ওপর ভর করে গল্পের পরিণতিকে করে তোলে শ্বাসরোধকারী।

ময়ূরাক্ষীর ভয়ঙ্কর সৌন্দর্যের প্রেক্ষাপটে তারিণী-সুখীর মধুর দাম্পত্য প্রণয়ের ছবিটি যথাযথভাবে উপস্থাপিত না হলে স্বাভাবিকভাবেই গল্পের পরিণাম এত গাঢ়বদ্ধ তীক্ষ্মহয়ে উঠত না।এদিক থেকে অন্তেবাসী মানুষের প্রেমলীলা অঙ্কনে লেখকের স্বভাবপটুত্বের সার্থক দৃষ্টান্ত 'তারিণী মাঝি'। অন্যপক্ষে তারাশঙ্কর তাঁর গল্পে প্রেমচিত্র অঙ্কনে বড় কৃপণ,—এরকম অভিযোগ করেছেন কেউ কেউ। বুদ্ধদেব বসু তার লেখায় আদিরসের অভাব সম্পর্কে সরাসরি অনুযোগ জানিয়েছেন। আদিরস' বলতে বুঝিয়েছেন, "The mutual attraction of the two sexes." আদিম বৃত্তির প্যাসন (Passion) তাঁর গল্পে হয়তো আছে, কিন্তু প্রেমের বিচিত্র লীলা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ নেই, এমন কি

দাম্পত্য প্রণয়-জাত উজ্জ্বল রসের ছবিও তেমনভাবে পরিস্ফুট হয়নি। এরকম মতামত আরও দৃঢ় হয়েছে তারাশঙ্করের নিজের একটি বক্তব্য সূত্রে। তিনি বলেছেন, "প্রেমের গল্পে আমি কিছু আড়ষ্ট।" মনে হয়, এই মন্তব্য বিশুদ্ধ প্রেমের গল্প সম্পর্কে, যা তিনি খুব বেশি লেখেন নি। সমাজের ভদ্র নরনরীর বিরহ-মিলনের রঙিন ছবি হয়তো তার গল্পে তেমন নেই, কিন্তু প্রেম চিত্রণে তিনি আড়ষ্ট একথা মানা যায় না। বরং বলা ভালো, ভালোবাসার ছবি আঁকায় তিনি স্বতন্ত্র পথের পথিক। বুদ্ধদেবীর প্রেমভাবনা থেকে তাঁর প্রেমচেতনা ভিন্ন গোত্রর। জীবন রহস্যের সামগ্রিক রূপটিকে আবিষ্কার করতে গিয়ে স্বাভাবিক প্রবণতায় প্রেম যতটুকু এসেছে, ততটুকুই গ্রহণ করেছেন, অতিরিক্ত গুরুত্ব দেননি। বলা যেতে পারে, প্রেমের মার্জিত বিন্যাস নয়, মানুষের ধাতু প্রবৃত্তির কথা বলতে গিয়ে প্রেমের বলিষ্ঠ আদিম রূপটিকেই উদঘাটিত করেছেন এবং এখানেই তিনি বেশি সাবলীল।।

'তারিণী মাঝি' এক অর্থে প্রেমের গল্পই; তা না হলে প্রেমের পরাভবের ট্রাজেডি কিভাবে অঙ্কিত হবে সেখানে? তবে এ প্রণয়ের স্বাদ সম্পূর্ণ ভিন্ন;আদিম অমার্জিত কিন্তু জীবনসম্পৃক্ত। সুখী-গরিণীর ভালোবাসার নীড় গড়ে উঠেছে পরস্পরের প্রতি অগাধ নির্ভরতায়। তারিণী নিজের জন্য কিছু চায় না, সবই স্ত্রীর জন্য। ফাঁদিনাথ শুধু নয়, ঘোষমশাই তাকে চাদর দিতে চাইলে, সে তার পরিবর্তে চায় স্ত্রীর জন্য শাড়ি, বন্যায় গোরু উদ্ধারের প্রাপ্য থেকে মদন গোপ তাকে পাঁচ টাকা ঠকিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু তাতে তার আপেক্ষ নেই; 'সুখীর শাখা বাঁধা তো হয়েছে, বাস, আমাকে দিস আর না দিস?' গ্রামে ফেরার পথে টিপি টিপি বৃষ্টিতে নিজের 'জলের শরীল'-এর দোহাই দিয়ে স্ত্রীর মাথায় তুলে দেয় মাথালি। শেষোক্ত এই ছোট্ট প্রসঙ্গটিতেই উভয়ের দাম্পত্য সম্পর্কের গভীরতাটুকু পরিস্ফুট হয়ে যায়। আর দাম্পত্য প্রণয়ের মধুর চিত্রটুকু পাওয়া যায় নেশাগ্রস্ত তারিণীর ঘরে ফেরার পর উভয়ের সংলাপে এবং স্ত্রীকে 'নথ' পরানোর দৃশ্যে - "সুখী বলিল, দাঁড়াও আয়নাটা লিয়ে আসি, লতটা পরি। তারিণী খুশি হইয়া নীরব হইল। সুখী আয়না সম্মুখে রাখিয়া নথ পরিতে বসিল। সে হাঁ করিয়া তাহার মুখের

দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল, ভাত খাওয়া তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নথ পরা শেষ হইতেই সে উচ্ছিষ্ট হাতে আলোটা তুলিয়া ধরিয়া বলিল, দেখি দেখি।"

"সুখীর মুখে পুলকের আবেগ ফুটিয়া উঠিল, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মুখখানি তাহার রাঙা হইয়া উঠিল।"ব্রাত্য অসংস্কৃত জীবনে এর চেয়ে সাবলীল স্বচ্ছন্দ দাম্পত্য প্রণয়ের চিত্র আর কি হতে পারে! অতি বড় নিন্দুকও এর মধ্যে এক বিন্দু আড়ষ্টতা খুঁজে পাবেন না। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রেমচিত্রণের ব্যাপারে তারাশঙ্করের নিজের প্রতি আস্থা না থাকলেও 'তারিণী মাঝি' গল্পে প্রেম এসেছে নিঃশব্দ চরণে, স্বাভাবিক নিয়মে; কল্লোলীয়দের মতো উচ্ছ্বাস-অতিশয্যের ঢাক-ঢোল পিটিয়ে নয়।

'স্বামী সোহাগিণী সুখীও স্বামীর প্রতি একান্ত নির্ভরশীলা।' প্রচণ্ড বন্যায় ঘর পড় পড় হলেও এক হাঁটু জলে চালের বাঁশ ধরে দাঁড়িয়ে উদ্বিগ্ন চিত্তে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করে সে। তারিণী "বাড়ির দরজায় আসিয়া ডাকিল সুখী-সুখী!....অপরিমেয় আশ্বস্ত কণ্ঠস্বরে সুখী সাড়া দিল, এই যে, ঘরে আমি।...তারিণী তাহার হাত টানিয়া ধরিয়া বলিল, বেরিয়ে আয়, এখন কি ঘরে থাকে, ঘরচাপা পড়ে মরবি যে!

সুখী বলিল, তোমার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি। কোথা খুঁজে বেড়াতে বল দেখি?"—মধুর দাম্পত্য সম্পর্কের মহিমান্বিত চিত্রের উপরেই গড়ে উঠেছে গল্পের ট্রাজিক পাষাণ সৌধ। প্রেম চিত্রণের ব্যাপারে তারাশঙ্করের তিনটি বৈশিষ্ট্য অন্তত এই গল্প থেকে উঠে আসে। প্রথমত গল্পের মূল বক্তব্য বিষয়ের ভাবনুষঙ্গে সুখী—

তারিণীর গাঢ় প্রেম সম্পর্কের অবতারণা। দ্বিতীয়ত এই প্রেমে তারুণ্যের রহস্যময় চল-চপলতা নয়, প্রৌঢ় প্রণয় অনুভবের স্থিতিশীল গাম্ভীর্য। তৃতীয়ত নায়ক-নায়িকার ট্রাজিক পরিণতি দেখিয়েই জীবন রহস্যের মূল ধরে নাড়া দিয়েছেন শিল্পী। একদিকে সুখীকে কেন্দ্র করে কোমলতা নমনীয়তা মাধুর্য, অপরদিকে রুক্ষতা কাঠিন্য প্রলয়ঙ্করী নগ্নিকা ময়ূরাক্ষী নদী—এই দুয়ের ঘাত-প্রতিঘাতেই নির্মিত হয়েছে তারিণী কথার ভূগোল।

তারাশঙ্করের গল্প বিচিত্র 'চরিত্রের চিত্রশালা' হলেও সেখান পুরুষেরাই দলে ভারি। অথচ রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পঞ্চভূত' (১৩০৪) গ্রন্থের নরনারী' প্রবন্ধে সমীরকে দিয়ে

বলিয়েছিলেন, মধ্যযুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে নারী চরিত্রেরই প্রাধান্য। তারাশঙ্কর বিপরীত পথে হেঁটেছিলেন বলেই তাক চরিত্র সৃষ্টির শোভাযাত্রায় বিচিত্র পুরুষ চরিত্রেরাই আছে পুরোভাগে। তারিণী মাঝি তাদের অন্যতম। চরিত্র সৃষ্টিতে তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর আঞ্চলিকতায় এবং সহানুভূতিতে। নানা প্রসঙ্গে বলেছেন, আমার বই বলুন, আর যাই বলুন, সেটা হচ্ছে আমার রাঢ় দেশ। এর ভেতর থেকেই পর যা কিছু সঞ্চয়। এখানকার মানুষ এখানকার জীবন নিয়ে লিখেছি।' এই গল্পতেও ননীর মধ্য দিয়ে যেমন পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে রাঢ়ের লোকজীবন, ধর্মবিশ্বাস, লৌকিক ভাষা সবকিছু, তেমনি সজীব হয়ে উঠেছে ময়ূরাক্ষী নদী, তার রুদ্র রূপ নিয়ে। স্মরণ রাখতে হবে ময়ুরাক্ষী এখানে একটি প্রধান চরিত্র। তাকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে তারিণীর ঔরন। অভিজ্ঞ মাঝি হিসাবে ময়ূরাক্ষীর মতিগতি সে যেমন বোঝে, অন্য কেউ নয়। পশ্চিমা বাতাসে কখন বর্যা নামবে, হড়পা বানের ক্রুর কুটিল গতিপ্রকৃতি তার নখদর্পণে। নদীতে জলের প্রবাহ এলে তারিণীর প্রাণ ওঠে ভরে, নদী শুকিয়ে গেলে তার কষ্টের শেষ থাকে না। সমগ্র গল্পে ময়ূরাক্ষী নদী এবং সেই নদীর মাঝি পরিণীকে আলাদা করা যায় না এক মুহূর্তের জন্য। যেমন আলাদা করা যায় না পদ্মানদীর সঙ্গে কুবের মাঝির। নদীর সঙ্গে উভয়ের নাড়ির বন্ধন, প্রাণের সম্পর্ক;- নদীই তাদের অন্নদাত্রী। পার্থক্য এইটুকুই; একজনের কাছে নদীমা, আর একজনের কাছে প্রিয়া। তারিণী যেমন দামাল ছেলের মতো নদীর বুকে নিয়ে খেলা করে, কবের তেমন পদ্মার সুবিশাল প্রবাহে আবিষ্কার করে কপিলার জীবন ছন্দকে।

অন্যপক্ষে তারিণীর মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে লেখকের শ্রদ্ধামিশ্রিত সহানুভুতি ও বিস্ময়। চোখে দেখা জীবনের চরিত্রকে নিজের ভাব-ভাষা, আচার-আচরণ নিয়ে ফুটে উঠতে দিয়েছেন স্বতস্ফূর্ত ভাবে। বলেছেন —"কেমন করে জানি না শিল্পী সাহিত্যিকের আসে একটা তন্ময়তার যোগ; তখন পাত্র-পাত্রীর জীবনের সুখ দুঃখের মধ্যেই ডুবে যায় শিল্পী; তখনই জেগে ওঠে, ফুটে ওঠে।" তারিণীও ফুটে উঠেছে সৃষ্টি প্রক্রিয়ার এই তন্ময়তার যোগে'। তারাশঙ্করের গল্পের বেশিরভাগ চরিত্রই যেমন শারীরিক এবং মানসিক দিক দিয়ে অদ্ভুত, তেমনি সভ্যসমাজ থেকেও যেন অনেকটা দূরে। খোঁড়া শেখ

বা ডাইনী সোরধনির মতো না হলেও তারিণীর চেহারাটি বিচিত্র। গল্পের আরম্ভেই সে বর্ণনা আছে—"তারিণীমাঝির অভ্যাস মাথা হেঁটে করিয়া চলা। অস্বাভাবিক দীর্ঘ তারিণীঘরের দরজায়, গাছের ডালে, সাধারণ চালাঘরে বহুবার মাথায় বহু ঘা খাইয়া ঠেকিয়া শিখিয়াছে। কিন্তু নদীতে যখন যে খেয়া দেয়, তখন সে খাড়া সোজা।" ভয়াল ময়ূরাক্ষীর বুকে তারিণী সকলের ত্রাণকর্তা। চরিত্রের এই মূল বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তার নামের তাৎপর্যটিও সরস ভঙ্গিতে ধরে দিয়েছেন লেখক গল্পের গোড়ায়। "তারিণী এবার হাসিয়া বলিয়া বসিল, আমার নাম করলেও পার, আমিই তো পার করছি।"

"এক বৃদ্ধা বলি তা তো বটেই বাবা। তারিণী নইলে কে তরাবে বল?" প্রাত্যহিক জীববি গতিকতায় ধাবমান সাদামাটা চরিত্রের মানুষ নয় সে। তার মধ্যে একদিকে প্রেম ভালবাসা করুণা পরোপকার বৃত্তি, অপরদিকে আদিম জৈবতা। রাঢ় অঞ্চলের অমার্জিত অথচ উদাও এক চারিত্র-বৈশিষ্ট্য তারিণীর মধ্যে ভর করে আছে। ক্ষুধা-তয়া-নেশায়। আদিম ও উদ্র হলেও, স্বাভাবিক অবস্থায় সে বেশ পরিশীলিত ও মার্জিত মানুষ। মাঝিবলি তাকে বিচিত্র মানুষের সংস্পর্শে এনেছে খেয়া পারাপারের সূত্রে। নিম্ন শ্রেণীর হলেও যেমন পিরশ্রমী দায়িত্ববান ভদ্র, তেমনি সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষের সঙ্গে সম্ভ্রম ও পরিহাস রসিকতায় পটু। এই মধুর ব্যবহারকে মূলধন করেই সে যাত্রীদের আকর্ষণ করে ডোঙায়। "তারিণী জোড় হাত করিয়া বলিল, আজ্ঞে মা, এবারেই যে আপনারা গাঙের ঢেউ মাথায় করে আইছেন সব। যাত্রীর দল কলরব করিয়া হাসিয়া উঠিল।"—কথায়-বাতায়, হাব-ভাবে, আচার-আচরণে সে ষোল আনাই রাঢ় দেশের মানুষ। লেখক স্থানীয় প্রচলিত প্রবচনগুলি মাঝির মুখে বসিয়ে তার সংলাপকে আরো বেশি জীবন্ত করে তুলেছেন। নদীর করাল গ্রাস থেকে উদ্ধার পাওয়া ঘোষ মহাশয়ের পুত্রবধূ স্বামী শ্বশুরকে দেখে লজ্জা পেলে তারিণী বলে,"আর সান কেড়ো না মা, দমলাও দমলাও। সেই যে বলেজে মা কুঁকড়ি বেপদের ধুকড়ি।"—তারিণী যথার্থই রসিক, তার হিউমার বোধ প্রবল। নিজেকে নিয়ে যে যেমন কৌতুক করে, তেমনি তাকে নিয়ে অপরের রসিকতাও প্রফুল্লচিত্তে উপভোগ করে সকলের সঙ্গে। কিন্তু এই মানুষটিই যখন ধাতু প্রকৃতির দাস, তখন সে তার জীবনপালিনী

ময়ূরাক্ষীর মতোই আদিম উদ্দাম বৃত্তিসমূহ নিয়ে হাজির হয়। প্রেমের ব্যাপারে যেমন আবেগ উচ্ছাস প্রবণ হয়ে ওঠে, তেমনি অসংযত ক্রোধের বশবর্তী হয়ে সামান্য ব্যাপারে নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ করে সহকর্মী কালাচাঁদ সঙ্গে। এর পিছনে আছে মদ্যাসক্তি,—আদিম ও অসংস্কৃত জীবনের প্রধান উপকরণ। উৎসবে আনন্দে তো বটেই, চরম দুর্দিনেও স্ত্রীর আঁচলের খুঁট খুলে পয়সা যোগাড় করে নেশা করা চাই। তখনই তার রক্তমাংসের জীবদেহে পাশব বৃত্তির সঙ্গে মানব বৃত্তির লড়াই প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। অত্যন্ত জৈব অথচ আশ্চর্য সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ তার জীবন পিপাসা। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে বিনা কারণে যাকে চপেটাঘাত করে, পরমুহূর্তেই সস্নেহে তাক মদ খাওয়ার নিমন্ত্রণ জানায়। এ চরিত্র যেমন কোন বিবেক-নীতির ধার ধারে না, তেমনি যাবতীয় সংকীর্ণ ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্ত তার ঔদার্য। আদিমতার বলিষ্ঠ জীবনোল্লাসে তারিণী ঘোষবাবুর কাছে পাওয়া পাঁচ টাকা থেকে দু'টাকা অবলীলাক্রমে সঙ্গী কালাচাঁদকে দিয়ে দেয়। "সুখী প্রশ্ন করিল, আর দু'টাকা কই?"

"তারিণী বলিল, কেলে, ওই কেলে, দিয়ে দিলাম কেলেকে—যা লিয়ে যা।"— এ মহৎ উদাত্ততা এবং বৈপরীত্য মহাকাব্যিক চরিত্রেই সম্ভব। তারাশঙ্করের গল্পে মানব জীবনের এই মহিমার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মাটির প্রতি মমত্ব। প্রকৃতি ও মাটির বন্ধনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা বলেই তারিণী গ্রাম ছেড়ে শহরে যেতে যেতেও ফিরে আসে মাটির টানে। এ সমগ্র গল্পে যে ভূমিকাটি সবচেয়ে বড় হয়ে উঠেছে তারিণীর, তা হল ভীষণা ময়ূরাক্ষীর হাত থেকে সকলের একমাত্র ত্রাণকর্তারূপে। মারাত্মক বন্যায় বিপদ যখন তার ঘাড়ের উপর নিশ্বাস ফেলেছে, তখনও সে ত্রাতা মাঝির ব্রতধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়নি। "অন্ধকারে কোথায় বা কাহার কণ্ঠস্বর বোঝা গেল না, কিন্তু নারী কণ্ঠের কাতর ক্রন্দন ধ্বনিয়া উঠিল, ওগো, খোকা পড়ে গেইছে বুক থেকে। খোকা রে! "তারিণী বলিল, এই খানেই থাকবি সুখী, ডাকলে সাড়া দিস। সে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।"—নিঃশঙ্কচিত্ত নির্বিকায় তারিণী এই ভাবেই ত্রাণ করেছিল প্রতিবেশীর সন্তানকে। এমনটিই লক্ষ করা গিয়েছিল ঘোষ পরিবারের বালিকা বধূকে উদ্ধার করার সময়। কিন্তু জীবনে একবারই ব্যত্যয় ঘটে এই চারিত্র-ধর্মের। গল্পের পরিণতিতে নিজেকে ত্রাণ করতে গিয়ে সে হত্যা

করে প্রিয়তমা স্ত্রীকে। এক অদম্য আদিম জীবন পিপাসা প্রবল প্রাণশক্তি রূপে ভয় করেছিল তার মধ্যে; প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে কোন জীবন সত্যকেই তখন গ্রাহ্য করেনি তারিণী। শ্রীকুমার ব্যন্দ্যাপাধ্যায় এর মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক রহস্যের উদঘাটন লক্ষ্য করে বলেছেন, "স্ত্রী সুখীর প্রতি তাহার প্রেম আত্মরক্ষার ভীষণ প্রয়োজনে অন্তর্হিত হইয়াছে—যে প্রেমালিঙ্গন আমাদের শ্বাসরোধ করে, তাহার কবল হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রিয়াকে মৃত্যুমুখে ঠেলিয়া দিতেও আমাদের বাধে না। জীবনের সহিত প্রেমের বিরোধের এই বাস্তব দিকটা মনস্তত্ত্বের এক কৌতূহলোদ্দীপক রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়াছে।" শেষ মুহূর্তে পর্যন্ত স্বাভাবিক প্রবণতায় সে ভরসা দিয়েছে সুখীকে, তার ভয় দূর করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই সুখীর কালাওক ভয় হয়ে উঠতে হয়ে তাকে আত্মরক্ষার মৌলিক তাগিদে; এই বৈপরীত্যের দ্বন্দ্বেই তারিণী মাঝ খর। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "সহজ প্রবৃত্তি, যাহাকে ইংরেজিতে ইটিংকট (instirect) বলে, তাহার ভালো আছে মন্দও আছে। ....এই সমস্ত অন্ধপ্রবৃত্তি কত ঘরে কত অসহ্য দুঃখ কত একণ সর্বনাষ ঘটায়।" তারিণীরও সর্বনাশ ঘটিয়েছিল এই অন্ধ প্রবৃত্তি। মানুষের শোচনায় দুর্ভাগ্যের ট্রাজেডিতেই তার জীবন পরিণাম।

এখন প্রশ্ন তারিণী কি সার্থক ট্রাজিক চরিত্র ? মহৎ জীবনের মহওম বিনষ্টি-জনিত যে যন্ত্রণাবোধ, তার রসপরিসুতিকেই সাধারণভাবে ট্রাজেডি বলে। 'মেঘনাদ বধ কাব্যে' ইন্দ্রজিতের জীবন মহৎ, কিন্তু তার বিনষ্টি মহৎ নয়। তারিণী কি মহৎ ? মহৎ জীবনের মাহাত্ম্যের ধারণা কালে কালে পাল্টায়। প্রাচীনকালে মহৎ মানুষ সৃষ্টি করতে গেল বড়ো মানুষ আঁকতে হোত, সাধারণ্যে বড়ো মানুষ তেমন মিলত না। আধুনিককালে মহৎ মানুষের সংজ্ঞা বদলে গেছে; যে কোন সাধারণ মানুষ তার ব্যক্তিত্বেই মহৎ। যেমন রবীন্দ্রনাথের চন্দরা কিংবা শরৎচন্দ্রের কুসুম;-সাধারণের মধ্যে এরা অসাধারণ সৃষ্টি। মহৎ বলতে বোঝানো হয়েছে এদের ভালোত্বকে। আরো পরবর্তীকালে কল্লোলের যুগে ভালো মানুষ প্রায় খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু তারাও মহৎ; এত ভঙ্গুরতা, এত অন্ধকারের মধ্যে তাদের মনুষ্যত্বটুকু হারায়নি বলেই। সাধারণ মানুষের অতি সাধারণ জীবন-চর্যায় মানব মহিমার আশ্চর্য প্রকাশেই তারিণী মহৎ। সে তার পেশায় সং; জলের

মানুষ বলেই জলের বিপদ থেকে সকলকে রক্ষা করাই তার ব্রত। এর থেকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিচ্যুত হয়নি যে, এমন চরিত্রকে মহৎ না বলে উপায় থাকে না। কিন্তু এই অসাধারণ মানুষের পতন কোথায়? কোথায় তার মহত্তম বিনষ্টি? তা হল আত্মরক্ষার তাগিদে নিজের প্রিয়তমাকে হত্যা করায় ততটা নয়, যতটা জীবন-ব্রত থেকে বিচ্যুত হয়ে মনুষ্যত্বকে দলিত করায়।

তারিণী চরিত্রের স্বভাব পরিণতি গল্পের মূল উপকরণ হওয়ায়, চরিত্র ধরেই গল্পের নামকরণ। এ নাম সার্থক। 'তারিণী' নামের অর্থ গল্পে ধরে দেওয়া হয়েছে। সেই অর্থের ব্যপ্তি ও বিনষ্টি কাহিনীর প্রধান সুর। গল্পের নাম যদি 'মরূরাক্ষীর মাঝি' হোত, তাহলে সাধারণ বিষয়টিই উপস্থাপিত হত, সংকেতধর্মী গভীর ব্যঞ্জনাটুকু থাকত না। তারিণীর ত্রাণের ব্রত, এবং নিজেকে ত্রাণ করতে গিয়ে সেই ব্রত থেকে বিচ্যুতি; এই বৈপরীত্যের মধ্যেই গল্পের জীবনদর্শনটি অভিব্যক্ত। সুতরাং সব অর্থেই এ নামকরণ সার্থক।তারিণীর যোগ্যা সহধর্মিণী সুখী গল্পের রক্তমাংসের মানবী নায়িকা। তারাশঙ্কর সহানুভূতির কোমল রসদৃষ্টিতে তাকে গড়েছেন। মুখরা সুখীকে দেখতে চাইলে তারিণী কৌতুক করে বলেছিল, "নেহাত কালো কুচ্ছিত মা"। এবং তার স্ত্রীর নাক নেড়ে কথা কওয়ার অভিযোগটিও সহাস্যে উপভোগ করেছিল সকলের সঙ্গে। কিন্তু সুখী এর সম্পূর্ণ বিপরীত। গল্প কিছুটা অগ্রসর হতেই তারাশঙ্কর জানিয়েছেন, "রিণী সাবি-ঠাকরুণকে মিথ্যা কথা বলিয়াছিল। সখী ,তন্বী, সুখী সুশ্রী, উজ্জ্বল শ্যামবর্না। সুখীর জন্য তারিণীর সুখের সীমা নাই।" সন্তানহীনা হলে দাম্পত্য জীবনে সে নিজের নামকে সার্থক করেছে। সুখী তারিণীর জীবনে সুখের মধুভান্ড। সে কেবল স্বামী সোহাগিনী নয়, স্বামীর প্রতি একান্ত বিশ্বাসপরায়ণ ও নির্ভরশীলা রমণী। নারীর ধর্ম যদি রক্ষা বা নীড় রচনা করা হয়, তাহলে সুখী তা করেছে, সে আশ্রয় চায় পুরুষের শক্তির কাছে, যার ওপর দাঁড়িয়ে সে রক্ষা করবে নীড়। এই আশ্রয়-দেবার ক্ষমতাই পুরুষের মধ্যে কামনা করে নারী,সুখীও করেছে। সুখী শান্ত, ধীর স্থির যুক্তিপরায়ণ। সে না থাকলে সত্যি তারিণীর হাড়ির ললাটে ডোমের দুর্গতি হোত। গৃহিণী, সচিব, সখীর ভূমিকায় যথার্থই সে সহধর্মিণী। নিজের স্বামিটিকে ভালো করে জানে বলেই তার কাজকর্ম

কথায় তেমন বাদপ্রতিবাদ করে না। লেখক জানিয়েছেন, সে তাহার অভ্যাস নয়। কিন্তু তারিণীর খাওয়া-দাওয়া, রোগ-ব্যামো, বিপদ-আপদ-সম্পর্কে সর্বদাই যেমন সজাগ, তেমনি অর্ধাঙ্গিনী হিসাবে গনুটিয়ার খেয়াঘাটে স্বামীর সঙ্গে অন্নদাত্রী ময়ূরাক্ষীর পূজাতেও রত হয়। আবার বানে ভেসে আসা জিনিস ধরা নিয়ে সহকর্মী কালচাদের সঙ্গে তারিণীর বিবাদের উপক্রম হলে, সুখী মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া সব মিটিয়ে দেয় সহজ যুক্তিতে। অভিভূত কালাচাঁদ খুশি হয়ে তার পায়ের ধুলো নেয়। কেঁদে বুক ভাসিয়ে বলে,- "বউ লইলেও বলে কে?" সুখী সুগৃহিণীও বটে। নদী পালিত অনিশ্চিত অর্থনৈতিক জীবনে বহু কষ্টে সংসার তরণীটি ভাসিয়ে রাখে, যাতে একমুঠো ভাতের অভাব না হয়। দুর্ভিক্ষের চরম দুর্দিনে স্বামী সোহাগে প্রাপ্ত গহনাগুলিও সে বিক্রয় করেছে একটি একটি করে। "জিনিসপত্র বাঁধিবার সময় তারিণী দেখিল, হাতের শাঁখা ছাড়া কোন গহনাই সুখীর নাই। তারিণী চমকিয়া উঠিয়া প্রশ্ন করিল, আর? সুখী ম্লান হাসিয়া বলিল, এতদিন চলল কিসে বল ?" স্বামীর প্রতি তার বিশ্বাস এবং নির্ভরতা এতটাই গভীর যে, প্রবল বন্যাতেও ঘর ছেড়ে বের হয়নি, অপেক্ষা করেছে তার ফিরে আসা পর্যন্ত। একবারের জন্যেও তার মনে হয়নি ঘর চাপা পড়ে মারা যেতে পারে। তারিণী ফিরে এসে তাকে ডাকলে, "ঘরের মধ্য হইতে সাড়া আসিল—অপরিমেয় আশ্বস্ত কণ্ঠস্বরে সুখী সাড়া দিল, এই যে, ঘরে আমি।" এত বড় বিপদের মধ্যেও সে নিরুদ্বিগ্নমনা, কেননা সুখী জানে, যার ওপর নির্ভর করে আছে, সেই তারিণী ময়ূরাক্ষীর বন্যায় সবচেয়ে বড় ত্রাতা।

'শান্তি' গল্পের চন্দরার মতো সুখী রসোচ্ছল নয় বটে, তবে প্রাণচঞ্চল, প্রাণের অপার মহিমায় ভরপুর। সকলের কল্যাণ ও মঙ্গল কামনায় ঘোর বিপদেও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস হারায় না। তারিণী বন্যা ক্রমশ বেড়ে ওঠার কথা বললে, "সুখী বলিল, আর কি বান বাড়ে গো? আর বান বাড়লে দেশের কি থাকবে? ছিষ্টি কি আর লষ্ট করবে ভগমান?" প্রাণের এরকম বিশ্বাস নির্ভরতায় স্বামীকে আশ্রয় করে সে জলে ভেসেছিল। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সে বিশ্বাস ছিল অটুট। কেননা চন্দরার মতো সুখীও স্বামী রাক্ষসের হাত হইতে বাহির হইয়া আসিবার' চেষ্টা করেনি একবারের জন্যেও। এখানেই তার

ট্রাজেডি। তারিণী চরিত্রকে পূর্ণতা দেওয়ার আকাঙ্খায় গল্পে সাবি এবং কালাচাঁদ চরিত্রের অবতারণা। "সাবি ওরফে সাবিত্রী তরুণী, সে তাহাদের পাশের গ্রামের কয়টি তরুণীর সহিত রহস্যালাপের কৌতুকে হাসিয়া যেন ভাঙিয়া পড়িতেছিল।" সাবি মুখরা পল্লীরমণী হলেও বুদ্ধিমতী ও হাস্যপরিহাসে পটু। সে তারিণীকে পরামর্শ দিয়েছিল ঘোষ মহাশয়ের কাছে দামী কিছু চেয়ে নেওয়ার। অন্যপক্ষে কালাচাঁদ ওরফে কেলে তারিণী মাঝির 'সহকারী' আদিম অমার্জিত স্বভাবের নেশাখোর মানুষ। তার কাজ যাত্রীদের কাছ থেকে পানির পয়সা সংগ্রহ করা এবং ডোঙার দাঁড় ধরে থাকা। তারিণীর মতো দক্ষ মাঝি সে নয়, পরিহাস পটুও নয়, তবে তার রসবোধ আছে; আর আছে অন্নদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা। মাবির অমঙ্গল হয় এমন কোন ঘটনাই সে সহ্য করে না। তবে তার দারিদ্র তারিণী অপেক্ষাও বেশি, কিন্তু মান-অপমান টনটনে। এ নিয়ে উভয়ের ঝগড়া মারামারিও হয়, আবার একসঙ্গে মদ খেতে গিয়ে ভাবও হয়। মদীমাতৃক আঞ্চলিক জনজীবন থেকেই উঠে এসেছে এইসব অসংস্কৃত চরিত্র। এদের সঙ্গে কথাবার্তা, আচার-আচরণের মধ্য দিয়েই তারিণী চরিত্রের সামগ্রিক রূপটি উদঘাটিত হয়েছে। আর একটি বিষয় লক্ষ করার যে, রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্পের ছিদাম-এর সঙ্গে তারিণীর কয়েকটি বিষয়ের সাদৃশ্য আছে। উভয়ের চেহার বর্ণনাতেই শুধু নয়, লগি দিয়ে নেকিা ঠেলা ও নদীর উঁচু পাড় হতে লাফানোর যে ছবি ছিদাম প্রসঙ্গে পাওয়া যায়, তারিণীর ক্ষেত্রেও তার প্রযুক্ত হয়েছে। উভয়েই আদিম অমার্জিত জীবনের মানুষ। মৃত্যুদন্ডের দিকে ঠেলে দেওয়া চন্দরাকে ছিদাম আশ্বস্ত করে বলেছিল, তোমার কিছু ভয় নাই। তারিণীও সুখীকে বারংবার বলেছে, ভয় কি তোর, আমি সঙ্গে রইছি। সুখী ও চন্দরা দুজনেই স্বামীর প্রতি অগাধ বিশ্বাসে নির্ভর করেছিল। কিন্তু দু'জনেরই মৃত্যুর জন্য দায়ী তাদের 'স্বামী রাক্ষস'। পার্থক্য এইটুকু, সুখী নিহত হয়েছিল আদিম উপায়ে, চন্দরা সভ্য-সমাজের নিষ্ঠুর বিচার-প্রহসনে। আঞ্চলিক মৃত্তিকার চরিত্র বলেই তারিণীকে তার পারিপার্শ্বিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ধরা যায় না, যেমনটি আমরা লক্ষ্য করি রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের চরিত্রগুলিতে। স্থাপত্য শিল্পীর মতই মস্ত এক পাথর কুঁদে বিশাল এক আদিম জীবনের মূর্তি গড়েছেন তারাশঙ্কর তারিণীর মধ্য দিয়ে। তবে

সবদিক থেকে আঞ্চলিক হয়েও চরিত্রটি বিশেষ কোন ভৌগোলিক সীমার আবদ্ধ নয়; তার সমস্যা চিরন্তন মানুষের জীবন সত্যের উপলব্ধি হয়ে দেশ-কালকে গেছে ছাড়িয়ে।

—যেমনটি আমরা পাই রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওয়ালা'য়।

গল্পের চরিত্রগুলিকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে কোন জটিল পথের আশ্রয় নেননি তারাশঙ্কর। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে তাদের বিশেষত্বগুলিকে তুলে ধরেছেন সযত্নে, কাজে লাগিয়েছেন নিজের জীবন অভিজ্ঞতাকে। স্বাভাবিক হয়েও তারিণী স্নিগ্ধ মাধুর্যে ভরা ব্যতিক্রমী চরিত্র। কল্পনার কোন ছোঁয়া নেই, চোখে দেখা জীবন থেকে উৎপাটিত করে এনে যেন গল্পে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য চরিত্রগুলির স্বভাব মাধুর্যেও পাঠক আপ্লুত হয়। শিল্পী তারাশঙ্কর এদের মধ্যে দিয়েই দেখতে চেয়েছেন কল্যাণ শুভবুদ্ধি ও আশার মহিমা। মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ,—এই কবি বচনের অনুসারী হয়ে এক অনাসক্ত নির্লিপ্ততায় বিচিত্র মানুষকে সৃষ্টি করেছেন নির্মম ভয়ঙ্করতায় এবং সহানুভূতির কোমল স্পর্শে। প্রজাপতি ব্রহ্মার মতোই নির্মাণ করে তুলেছেন তারিণী-সুখী কালাচাঁদের জীবনের সত্য পরিণামকে।

'তারিণী মাঝি' গল্পের ভাষাররীতির তিনটি প্রাথমিক সূত্র বেরিয়ে আসে। প্রথমত গল্পের বর্ণনায় লেখকের নিজের ভাষা, দ্বিতীয়ত চরিত্রগুলির সংলাপে আঞ্চলিক ভাষা, তৃতীয়ত মাতালের অসংলগ্ন প্রলাপোক্তি। গল্পের কথক যেহেতু লেখক নিজেই সুতরাং তার ভাষা মান্য গদ্যের। এ গদ্যের চালটা সাধু হলেও চলন চলিতের। যদিও ভাষার মান্যীকরণে (Standardization) তাকে বলা যেতে পারে শিষ্ট বা সাধু রীতির। গল্প বলার গল্প বলার ভঙ্গীটি গাঢ় বলে, ভাষার মধ্যে বিরাজ করেছে মহাকাব্যিক দার্ট এবং আড়ম্বরপূর্ণ উদাত্ততা। বক্ষমান আলাোচনার তৃতীয় পর্যায়ে এরকম ভাষার দুটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা হয়েছে, প্রথমটি খরার রুদ্র রূপ, দ্বিতীয়টি বন্যার তান্ডব। তারাশঙ্কর ভাষা প্রয়োজন বলে, বড় বড় শব্দের মধ্যে আছে কাব্যিকতার স্পর্শ। তাছাড়া গল্পের এপিক পরিমণ্ডলের জন্য ভাষা শুধু চিত্রধর্মী হয় নি, শব্দবন্ধনগুলিও ধ্বনি প্রগাঢ়। এসব ক্ষেত্রে তিনি কিছুটা

বঙ্কিমী ঢঙের অনুসারী; বিশেষ করে নারীর রূপ ও প্রকৃতির বর্ণনায় : (ক) "দীর্ঘ অবগুণ্ঠনবৃতা বধূটি ডোঙার কিনারায় ভর দিয়া সরিয়া বসিতে গিয়া এই বিপদ ঘটাইয়া বসিয়াছিল।...নিতান্ত কচি মেয়ে— তের চোদ্দ বছরের বেশী বয়স নয়; দেখিতে বেশ সুশ্রী, দেহে অলঙ্কার কয়খানা রহিয়াছে— কানে মাকড়ি, নাকে টানা-দেওয়া নথ, হাতে রুলি, গলায় হার।" কিংবা "সুখী তন্বী, সুখী সুশ্রী, উজ্জল শ্যামবর্ণা।"

(খ) "নিচে খরস্রোতা ময়ূরাক্ষী নিম্নস্বরে ক্রুর হাস্য করিয়া বহিয়া চলিয়াছে।" কিংবা

"রাঙা জলের মাথায় রাশি রাশি পুঞ্জিত ফেনা ভাসা-ফুলের মত দ্রুত বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে," শেষোক্ত প্রকৃতি-বর্ণনায় 'প্রগাঢ়' ও 'প্রযত্ন' উচ্চারিত ভাষায় লেখকের অলঙ্কার (সমাসোক্তি ও উপমা) প্রয়োগ নৈপুণ্য লক্ষ্য করার মত। বর্ণনাগুলিতে তৎসম শব্দযুক্ত এই কাব্যিকত উদ্ভূত হয়েছে গভীর জীবন সম্পৃক্ততা থেকেই। বঙ্কিমের থেকে এখানেই তিনি স্বতন্ত্র।

গল্পের শেষ অনুচ্ছেদে জীবনের সুগভর রহস্যের উপলব্ধিতে শ্বাসরুদ্ধকারী যে ভাষারূপ তা অতুলনীয়। প্রয়োজনে যে তারাশঙ্কর কতটা মিতবাক্-নির্মম ও নিরাসক্ত হতে পারেন। তারিণী-সুখীর প্রাণ বাঁচানোর দ্বৈরথের অমোঘ বর্ণনাই তার প্রমাণ। "বাতাস-বাতাস, যন্ত্রণায় তারিণী জল খামচাইয়া ধরিতে লাগিল। পরমুহূর্তে হাত পড়িল সুখীর গলায়। দুই হাতে প্রবল আক্রোশে সে সুখীর গলা পেষণ করিয়া ধরিল। সে কি তাহার উন্মত্ত ভীষণ আক্রোশ। হাতের মুঠিতেই তাহার সমস্ত শক্তি পুঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে।" ক্লাইম্যাক্সের (climax) চূড়ান্ত শীর্ষবিন্দুতে শব্দ-চয়ন ও বিন্যাসে যে কত সতর্ক ও প্রজ্ঞা-চক্ষু হতে হয়, শিল্পী তারাশঙ্কর তা আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত চরিত্রগুলির সংলাপে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহারে তারাশঙ্কর তুলনা রহিত। ভাষার এই আঞ্চলিক রূপ (Dialect) গড়েছেন স্থাপত্য শিল্পীর প্রবণতায়, যাতে আদিম অমার্জিত জীবনের মূর্তি কুঁদে তৈরী করা যায়।

(ক) "একটা ঝাঁকি দিয়া লগিটা টানিয়া তুলিয়া তারিণী বিরক্তভরে বলিয়া উঠিল, এই শালা কেলে—এঁটে ধর দাঁড়, হাসেঙাত আমার ভাত খায় না গো। টান দেখিস্ না?"

(খ) "তারিণী হাসিয়া বলিল, তাই চল বাপু। লোকে বলে কি জান দাস, বলে, শালা বানের লেগে পূজো দেয়। এই মায়ের কিপাতেই এ মুলুকের লক্ষ্মী। ধর ধর কেলে, ওরে, পাঁঠা পালাল ধর।"

(গ) "তারিণী বলিল, আকাশ দেখ কেনেফরসা লীল। পচিদিকেও তো ডাকে না।" এ প্রবৃত্তি তাড়িত যে আদিম অনগ্রসর জীবন গল্পের প্রসঙ্গ হয়ে উঠেছে, তাতে তার ভাষা এরকম অমার্জিত, অসংস্কৃত হওয়াই স্বাভাবিক। বরং তা না হলে গল্পরসের হানি হওয়ার সম্ভাবনাই থাকত।

দক্ষিণ-পূর্ব বীরভূমের এই ভাষা ব্যবহারে তারাশঙ্কর অনেক বেশী স্বচ্ছন্ন বিচরণ করেছেন। গল্প কথকের মান্য ভাষার সঙ্গে তাকে মিলিয়ে ফেলেন নি কোথাও, তারিণী ও সুখীর উচ্চারণে 'লত' কিংবা লদী' লেখকের ভাষায় যথাক্রমে 'নথ' এবং 'নদী'ই থাকে। তবে পুরুষ অপেক্ষা মেয়েদের ভাষা গল্পে আরও বেশী আঞ্চলিক। বাইরের

জগতের সঙ্গে যোগাযোগ কম বলেই সুখীর ভাষায় স্বাতন্ত্র সহজেই কানে ঠেকে। —- "সুখী বলিল, আর কি বান বাড়ে-গো? আর বান বাড়লে দেশের কি থাকবে? ছিস্টি কি আর লষ্ট করবে ভগমান?" চরিত্রগুলির মতোই তাদের সংলাপ মৃত্তিকা সম্পৃক্ত। নিজস্ব আচার-আচরণের বৈশিষ্ট্যেই শুধু নয়, মুখের কথাতেও এরা জীবন্ত রসমূর্তি লাভ করেছে। বিশেষ করে পুরানো-প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচনের ও বিশিষ্টার্থক। শব্দের স্বতস্ফূর্ত উচ্চারণে। যেমন, "ওদিক হইতে একজন ডাকিয়া উঠিল, "ওলো ও সাবি, উঠে আয় লো, উঠে আয়। দোশমনের হাড়ের দাঁত মেলে আর হাসতে হবে না।" কিংবা 'তারিণী কহিল, আর সানকেড়ো না মা, দম লাও দম লাও। সেই যে বলে— লাজে মা কুঁকড়ি বেপদের ধুকড়ি।"

অথবা "উ না থাকলে আমার হাড়ির ললাটে ডোমের দুগগতি হয় ভাই।" আরো আছে, 'পুণ্যির বোঝ', নাক নেড়ে', 'আ মরণ', 'গলায় দড়ি', 'মাথা খাবে, যে হিম', 'হাঁ করিয়া', 'তলা ফঁক', 'দিন খাটুনি' প্রভৃতির প্রয়োগ প্রযুক্তি। আর আছে এক শব্দের সাবলীল ব্যবহারে ছবি লেখার প্রচেষ্টা। যেমন 'হড়হড়', কলকল', 'ঝরঝুর', 'বুক-বুক' 'খাঁ খাঁ',

ফটফটে', চকচক', 'রিমঝিমি', 'ঝমঝম', 'সোঁ সো, ডুগডুগ', হুড়মুড়', হু হু',। বিচিত্র শব্দদ্বৈতের ব্যবহারেও ভাষা হয়েছে সজীব ও প্রাণময়।

'জলটল', 'বানটান, ফ্যালফ্যাল ইত্যাদি। বীরভূমের টিপিক্যাল (typical) কিছু আঞ্চলিক এক গল্পের চরিত্রের মুখে ধরে দেওয়ায়, সংলাপ হয়েছে বেশ জীবন্ত। যেমন—আইছেন = এসেছেন, এঁটে = শক্ত করে, পেছু = পিছনে, সানকেড়োনা = ঘোমটা দিওনা, কুঁকড়ি = কুঁকড়ে থাকা, নেলা = নালা, জলাম্পয় = জলময়, ভাপাইছে = গরমে সিদ্ধ হওয়া, কিন্তু এখানে অর্থ মষ্টির হয়ে পড়া, লেগে = জন্য, তু = তুই, নেয়ান = বাটালী, পচি =পশ্চিমপশ্চিমা, মাথালি= বাঁশের চাঁচ দিয়ে তৈরী বৃষ্টি নিবারক টোকা বা আচ্ছাদন।

তৃতীয়ত নেশাখোর মাতালের অমার্জিত, অসংস্কৃত এলোমেলো উক্তি। নেশাগ্রস্ত তারিণী ও কালার্টাদের সংলাপগুলি আসলে লেখকের সচেতন অপপ্রয়োগ (malapropism)। "তারিণী সেদিন রাত্রে বাড়ি ফিরিল আকণ্ঠ মদ গিলিয়া। এখানে পা ফেলিতে পা পড়িতেছিল ওখানে। সে বিরক্ত হইয়া কালাচঁাদকে বলিল, রাস্তায় এত নেলা কে কাটলে রে কেলে? শুধুই নেলা শুধুই নেলা—শুধুই অ্যা—অ্যাই—একটো—

কালাচাঁদও নেশায় বিভোর, সে শুধু বলিল, হুঁ। তারিণী বলিল, জলাম্পয়সব জলাম্পয় হয়ে যায়, সাঁতরে বাড়ি চলে যাই। শালা খাল নাই, নেলা নাই, সমান সব সমান।"

এ সংলাপ কিন্তু অর্থহীন নয়। জলের মানুষ বলেই স্থভূমিতেও নদী-নালার কল্পনায় বিভাে্র। সচেতন অপপ্রয়োগ হলেও এ-ভাষা বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতা বিচ্ছিন্ন নয় মোটেই। তারিণীর আদিম জৈব চেতনার অনুভবগুলি যেমন স্পষ্ট হয়েছে মত্ত অবস্থার সংলাপে, তেমনি ফ্ল্যাসব্যাক্ (Flashback) পদ্ধতি ব্যবহার করে অতীতের দৃষ্টি ঘটনাকে তুলে আনা হয়েছে তার অসংবৃত্ত উক্তির মাধ্যমে। সুসমালোচক ঠিকই বলেছেন, "এই ভাষা বলিষ্ঠ, পৌরুষদীপ্ত, কখনো অমার্জিত, গ্রীষ্মদগ্ধ বীরভূমের প্রকৃতির মতোই রুদ্ররৌদ্রোজ্জ্বল। স্বভাবতই এই ভাষার ইঙ্গিতের চাইতে বিবৃতি সার্থকতর এবং তারাশঙ্করের দীর্ঘছন্দ বিস্তৃত কাহিনী এই ভাষার মাধ্যমেই স্বাচ্ছন্দ্য

লাভ করেছে।" 'তারিণী মাঝি' গল্পে কাহিনী নির্মাণ ও পরিবেশ-পরিজনের চিত্রণে এই ভাষারীতির যোগটি হয়েছিল পার্বতী-পরমেশ্বরের।

গল্পে চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে ব্যঞ্জনা সৃষ্টির প্রয়াসও লক্ষিত হয়। প্রথম অনুচ্ছেদে তারিণীর অস্বাভবিক দীর্ঘ শারীরিক বর্ণনার পরেই দুটি শব্দ ব্যবহার এক্ষেত্রে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমটি 'তালগাছের ডোঙা' দ্বিতীয়টি সুদীর্ঘ লগি'। পাশাপাশি উচ্চতাবাচক এই শব্দ দুটি তারিণীর দীর্ঘ কাঠামোকে আরও দীর্ঘ করে পাঠকের চোখের সামনে ছবির মত লেখা হয়ে যায়। গল্পের শবে চিত্রকল্পের সুনিপূণ ব্যবহারে ময়ূরাক্ষী-কেন্দ্রিক প্রকৃতির রুদ্র ভয়াল রূপও ছবি হয়ে ফুটে ওঠে ?—"জলহীন ময়ূরাক্ষীর বালুকাময় গর্ভ গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে ঝিকিমিক করিতেছিল, কিংবা "রিণীর অট্টহাসিতে বর্ষার রাত্রির সজডল অন্ধকার ত্রস্ত হইয়া উঠিল।"

অথবা, "সমস্ত দেশটার মধ্যে একটা মৃদু কাতর ক্রন্দন যেন সাড়া দিয়া উঠিল। প্রত্যয় বিপদের জন্য দেশ যেন মৃদুস্বরে কঁদিতেছিল। কিংবা হয়তো বহু দূরের যে হাহাকার আসিতেছে বায়ুস্তর বাহিত তাহারই অগ্রধ্বনি এ।"

এইভাবেই গল্পভাষায় কাব্যিকতার আমেজ সৃষ্টি করেছেন চিত্রধর্মী শিল্পী। তারাশঙ্করের লেখায় জীবনের গাঢ় গভীর প্রতিবিম্ব পাঠককে স্পর্শ করে প্রবলভারে সেখানে আঞ্চলিক জীবনের প্রেক্ষাপটে ইতিহাসের সর্বজনীন রূপ প্রস্ফুটিত হয়। কল্লোলের নাগরিকতমনস্ক লেখকেরা যখন অবসাদ, নৈরাশ্য, মরবিডিটিতে (morbidty) আক্রান্ত, তারাশঙ্কর তখন ভাঙ্গা গড়ার স্বপ্ন'তে বিভোর। 'তারিণী মাঝি' সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের গল্প। বিশেষ অঞ্চলের প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত মৃত্তিকা সম্ভব মানব জীবন রহস্যের বাস্তব কাহিনী এখানে সত্যরূপে উদ্ভাসিত। এই অর্থে গল্পটি আঞ্চলিক। কিন্তু 'তারিণী মাঝি' শুধু তারিণী-সুখীর গল্প নয়; রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে যেমন চিরন্তন পিতৃত্বের ছবি, এখানেও তেমনি জৈবধর্মের সঙ্গে মানবধর্মের চিরকালীন টানাপোড়েনের নির্বিশেষ রূপ। "দেশকালের বৈশিষ্ট্যকে অভিভূত করে যে সাহিত্য তোলে, সে সাহিত্যকে সংকীর্ণ অর্থে আঞ্চলিত বলা অসংগত। তারাশঙ্করের সাহিত্যে মানুষ তার আদিম প্রবৃত্তি,

যুগসঞ্চিত সংস্কার এবং বংশানুক্রমিক জীবিকা অবলম্বন করেই চিরকালের মানুষ তাই তারাশঙ্কর বিশেষভাবে রাঢ়-ভূমির কথাকোবিদ হয়েও বাংলার সার্বভৌম জীবনশিল্পী।"

৪.৩ নারী ও নাগিনী : বাসনার বিষম ত্রিভুজ

রাঢ়-বাংলার খরমৃত্তিকাজাত অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষেরা—বেদে-কাহার-ঝুমুর নাচিয়ের। তারাশঙ্করের গল্প-উপন্যাস তাদের জৈব-আসক্তির অনুষঙ্গী জীবনাচরণের আশ্চর্য অদিম মত্ততায় উন্মোচিত করেছে। প্রেম ও বাসনা, আদিমতা ও লালসার তাড়নায় বিপন্ন, কিন্তু অমোঘ, এ জীবনবাস্তবতা শিহরিত করেছে পাঠককে। যে রাঢ় দেশের রুক্ষ লালমাটিতে তারাশঙ্করের জন্ম, যে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলের তার বিকাশ ও আবর্তন, সেই আঞ্চলিক বৃত্তে সজীব ও স্পন্দিত লোকজীবন তারাশঙ্করের গল্প-উপন্যাসে নানা রূপে-রসে উজ্জ্বল। ভাষ্যকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথায়—"রাঢ়ের কঙ্করাকীর্ণ জলহীন প্রান্তরে মধ্যাহ্ন সূর্যের যে অসহ দাহ—যে বুকফাটা পিপাসা, তাঁর গল্পের মধ্যে তারই জ্বালাভরা এক শুষ্ক লেলিহ রসনার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে। লোভ, লালসা, কামনা ও স্নেহ,সব কিছুই যেন এই খররৌদ্রের রৌদ্ররসে অভিষিক্ত। বিশাল মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে তারা মৃদু কণ্ঠে দূরের মানুষকে ডাকতে পারেনা তাই তারা প্রায়শ উচ্চকণ্ঠ; নিজেদের আবেগকে তারা সংযত করতে পারে না—সে। মনঃপ্রকর্ষ তারা পায় নি, প্রায়ই তারা extreme character রূপে দেখা দেয়।

উদ্ধৃত মন্তব্যের নিরিখে নারী ও নাগিনী' (প্রকাশকাল : 'দেশ', শারদীয়া, ১৩৪১) গল্পটির আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যেতে পারে। রাঢ়-বঙ্গের খরতপ্ত প্রান্তরের অন্তবর্তী মানবীয় আসক্তির যে দাবদাহের কথা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, সাপুড়িয়া খোঁড়া শেখ, তার বিবি জোবেদা, আর এক সর্পিণীর ত্রিভুজ প্রেমের গল্প 'নারী ও নাগিনী' তারই জ্বলন্ত উদাহরণ। একদিকে স্ত্রী, অন্যদিকে ফণায় ঘনকালো চক্রচিহ্ন আঁকা এক অপূর্বসুন্দর সাপিনী— এ' দুয়ের মাঝে দ্বিধা-বিভক্ত, লালসা-তাড়িত খোঁড়া শেখ ক্রমবিলীয়মান ওঝা সম্প্রদায়ের এক স্মরণীয় চরিত্র, নারায়ণবাবুর কথানুযায়ী 'extreme character.' এমন বিষম, বিপর্যয়কর টানা-পোড়েন, আদিমতার এমন লেলিহ রসনার প্রকাশ, রাঢ়বঙ্গের ভদ্রেতর জনজীবনে বিরল ছিল না।

সাপের ওঝা খোঁড়া শেখ। খোঁড়ার বিশ্বাস ছিল যে, সাপও পোষ মানে এবং ভালবাসে। নিজের আসল নামটাই ভুলে গেছে যে খোঁড়া শেখ, শুধু পা-খানিই তার খোঁড়া নয়, যৌবনকালে স্বেচ্ছাচারিতার ফলে কোন এক বদরোগে তার নাকটি বসে গিয়ে সেখানে দেখা দিয়েছে এক বীভৎস গহ্বর। এই কদাকার মুখাবয়ব আরো ভয়ঙ্কর কুৎসিত হয়ে উঠেছে বসন্তের নিষ্ঠুর ক্ষতচিহ্নে। তার জীবিকার সঙ্গে তার এই রূপের যেন এক অদ্ভুত সাদৃশ্য। ইটের পাঁজা থেকে ইট ছাড়াতে ছাড়াতে একদিন অকস্মাৎ খোঁড়া শেখ দেখতে পায় এক রক্তবর্ণ ফণাধর, প্রজাপতির লাল পাখার কালো বর্ণলেখার মতো চক্রচিহ্ন আঁকা, কিশোর উদয়নাগ সাপকে। তাকে দেখায় অদাই, যার গরুর গাড়ীর সামনে ফণা তুলে নাচছিল এই মনোহর উদয়নাগ। অদাই সাপটিকে মারতে উদ্যত হলে খোঁড়া শেখ সকাতরে তাকে নিরস্ত করে; সে মুগ্ধ হয় কিশোর সর্পের সির্দুরের মত টকটকে লাল মুখ আর মাথার বাহারী চক্করে, তার ফণা তুলে দুলতে থাকার মোহিনী ভঙ্গীতে। কিন্তু অদাইয়ের তাড়া খেয়ে নাগ খোঁড়া শেখের নাগাল এড়িয়ে লুকিয়ে পড়ে ইটের পাজায়।ঘরের চালের ফাক-ফোকরে মুখটাকা হাঁড়িতে রাখা সাপেদের নিয়ে ওঝা খোড়া শেখের এর। ঢাক আর বাঁশি বাজিয়ে সাপখেলা দেখিয়ে চলে রুজি-রোজগার, যার অনেকটাই উড়ে ভয় নেশার জোগানে, গাঁজা-আফিম-মদের বেপরোয়া বরাদ্দে। সাপের হাঁড়ি শূন্য হয়ে গেলে - তার কদাকার অবয়ব নিয়ে ঘোরে গৃহস্থের দোরে দোরে মজুর খাটার ধান্দায়। তাও না জোটে তো ভিক্ষে করে যা পায় তাই দিয়ে খানিক পচাই গিলে বাড়ি ফিরে জোবেদা বিবির পায়ে পড়ে কাঁদতে থাকে। নেশাগ্রস্ত স্বামীর ও হেন আচরণে জোবেদা হাসে। আশ্বস্ত করে খোঁড়াকে সকৌতুকে। সে যাই হোক, ইটের পাঁজায় লুকিয়ে পড়া নয়নলোভন উদয়নাগ খোড়াকে টেনে আনে তার আস্তানায় পরদিন সকালে। পুব আকাশে প্রাতঃসূর্যের রক্তাভায় উদীয়মান অগ্নিগোলকের দিকে ফণা তুলে নৃত্যেরত উদয়নাগের সৌন্দর্য মুগ্ধ করে তাকে। গাঢ় লাল আর ঘন কালোর বর্ণময়তা সূর্যোদয়ের ক্রমবিস্তারী বর্ণচ্ছটার সঙ্গে মিলেমিশে মোহিত করে সাপুড়িয়াকে। তার দক্ষ হাতে লাঠির কায়দায় সাপটিকে ধরে ফেলে খোঁড়া শেখ। ভাল করে দেখে বুঝতে পারে এ সাপ নয়, সাপিনী। আর এখান থেকেই আসল শুরু গল্পের। এই সর্পিণীর প্রতি এক বিচিত্র জৈব আসক্তি খোঁড়া শেখকে তাড়না

করতে থাকে। গলায় জড়ানো 'বিবি'কে সোহাগভরে চুমো খেয়ে তার নাকে বাহারী অলংকার পরিয়ে খোঁড়া নিকে করে সর্পিণীকে। তার সিঁথিতে সিঁদুর পরায়, আয়না এনে 'বিবি'কে দেখায় তার নববধূর রূপ। গলায় ঝুলিয়ে, হাতে জড়িয়ে খোঁড়া আস্বাদন করে আলিঙ্গন-সুখ; অদ্ভূত আসঙ্গ-লিপ্সা অনুভব করতে করতে, জোবেদার তিরস্কার অগ্রাহ্য করে সে বলে ওঠে—"দেখ দেখ, কেমন আমার হাতটা জড়িয়ে ধরছে, দেখ দেখি! জানিস, সাপিনী আর সাপে যখন খেলা করে, তখন ঠিক এমনই করে জড়াজড়ি করে ওরা। দেখেছিস কখনও? আঃ সে যে কি বাহারের খেলা, মাইরি! জোবেদাকে জানের চেয়েও বেশি ভালবাসে ওঝা। তবু গূঢ় বাসনার আমোঘ টানে তার জীবনে নারীর প্রতি আসক্তি তার বিবি আর এই সপিণীর মধ্যে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে দেখা দেয়। এক অদ্ভুত উন্মাদনায় অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে খোঁড়া–ওয়াকে আমি নিকা করলাম জোবেদা, ও তোর সতীন হল। বিষম-ঢাকির তালে কর্কশ নাকি সুরে গান ধরে

জানি না গো এমন কে হবে

গোকুল ছাড়িয়া কেষ্ট মথুরাতে যাবে।

ও জানি না গো ।

এর কয়েক মাস পরে বর্ষার ঘোর বাদলাদিনে দুর্যোগ মাথায় করে বাড়ি ফিরে ঘরে এক অনেচা গন্ধ পায় খোড়া। এক নতুন মিষ্টি গন্ধ; জোবেদা ক'দিন ধরেই টের পাচ্ছিল এ গন্ধ। মিলনঋতুতে সাপের দেখা পাওয়ার সময় হলে সাপিনীর শরীর থেকে বেরোয় এমন ঘ্রাণ যা' আকৃষ্ট করে পুরুষ-সর্পকে। বর্ষার দুরন্ত দিনে দু'দিন বাদে খেতে বসা ওঝার পাতের পান্তাভাতের গন্ধ আর তার বিবির দেহের মিলন-লিপ্সার গন্ধ একাকার হয়ে যায়। ওঝা জানে এমন সময় সাপিনীকে ধরে রাখতে নেই, ছেড়ে দিতে হয়ে খোলা মাঠে, বনে। জোবেদাও তার সতীনের ওপর খোঁড়ার টানের কথা ভেবে ঈর্ষায় বলে—সেই ভাল বাপু, ওটাকে আমি দু চক্ষে দেখ পারি না। এত সাপ মরে, ওটা মরেও না তো!' খোড়া ঝাপিরে ভেতর থেকে বার কত বিবিকে; সোহাগ ভরে কত কথা বলে তার সঙ্গে; তারপর তাকে ছেড়ে দিয়ে আসে জঙ্গলে, কিন্তু বিবিকে ভুলতে পারে না খোড়া; মনমরা হয়ে বসে থাকে। না গাঁজা-আফিমের নেশা জোবেদার সান্নিধ্যের

মাদকতা, কোন কিছুতেই নাগিনীর বিরহ ভুলতে পারে না সে। জোবেদা সাপিনীর মতো বেষ্টনীতে খোঁড়া শেখের গলা জড়িয়ে স্বামীর মনভোলানোর চেষ্টা করলে খোঁড়া চুম্বনে ও আশ্বাসে তাকে নিরস্ত করে। কিন্তু পরক্ষণেই জলনিকাশী নালিপথে উদয়নাগকে ফণা উঁচিয়ে ফিরতে দেখে ছোটে তাকে ফের ধরতে। স্বামীর এই অদ্ভুত আসক্তিতে ঈর্ষাপরায়ণা জোবেদা ব্যস্ত হয়ে পড়ে সাপিনীকে তাড়াতে । তার তাড়নায় উদয়নাগ যে পথে ঢুকেছিল সে পথেই পালায়।

সেদিনই রাতদুপুরে জোবেদা চীৎকার করে ডাকে খোঁড়াকে। তাকে সাপে কেটেছে। খোঁড়া শেখের বিবিরই ছোবল পড়েছে জোবেদার বাঁ পায়ের আঙুলে। একটা হাঁড়ির গা দিয়ে পাক খেয়ে সে চলে যেতে থাকে তার বিষচিহ্ন এঁকে দিয়ে। খোঁড়া ঝাঁপিতে বন্ধ করে তাকে। জোবেদার কিছু হলে সপিণীকেও শেষ তকে দেবে বলে ভয় দেখায়। রাত পোহালে জোবেদার মৃত্যু হয়। মনস্তাপে ঘর ছেড়ে ফকিরি নেয় খোঁড়া। সাপিনীকে কিন্তু মারতে পারে নাকো ঝাঁপি থেকে তাকে মুক্ত করে দিয়ে বলে—'তোর দোষ কি, মেয়েজাতের স্বভাব ওই। জোবেদাও তোকে দেখতে পারত না।'

ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বে যে অবচেতন যৌনআকাঙ্ক্ষার কথা বলা হয়েছিল 'নারী ও নাগিনী'র খোঁড়া শেখ তারই উদাহরণ। হরেক সাপের পরিচর্যা করে ও খেলা দেখিয়ে দিনযাপন যে ওঝা, উদয়নাগ-সপিণীর প্রতি জৈব আসক্তি তার পারিবারিক জীবন ও পেশাকে তছনছ করে দেয়। জোবেদা তার নারীসুলভ আদর-সোহাগ, ক্ষোভ-অভিমানে স্বামীকে জড়াতে চায়, নাগিনীর আকর্ষণ থেকে সরাতে চায় তার মন। খোঁড়াও চুম্বন ও আশ্বাসে জোবেদাকে ভালবাসার কথা বলে ও 'জোবেদা এবার স্বামীর পাশে আদর করিয়া গলা জড়ইয়া ধরিয়া বলিল, কেনে রে, আমাকে তোর ভাল লাগে না? সাদরে তাহাকে চুম্বন করিয়া খোঁড়া বলিল, তোর জোরেই তো বেঁচে রইছি জোবেদা। তু আমার জানের চেয়ে বেশি।' তবু যখন সর্পিণী চুপিসাড়ে এসে জোবেদাকে কাটে ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসায়, খোঁড়া তাকে ঝাঁপিবন্দী করে রাখে, মেরে ফেলবে বলে শাসায়, শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দেয় এই যুক্তিতে যে নাগিনীর প্রতিহিংসা তো নারীর ঈর্ষারই ফলশ্রুতি। জোবেদা তো সর্পিণীকে তাড়াতে ও মারতেই চেয়েছিল। রক্তবর্ণ ও চিত্রিত

সপিণীর প্রতি এক আশ্চর্য জৈবিক মোহে খোড়া হারায় তার স্ত্রী, সংসার, ভিটেমাটি। নারী ও নাগিনীর পরস্পর-বৈরীতার মধ্যে পড়ে খোঁড়া বোঝে নারী ও সপিণীর মধ্যে আসলে কোন তফাৎ নেই। জোবেদা যতখানি নারী, প্রায় ততটাই নাগিনী; আবার খোঁড়ার নিকে করা বিবি যতখানি নাগিনী, ততটাই নারী সে। 'নারী ও নাগিনী' নামের তাৎপর্যেই নিহিত আছে তারাশঙ্করের এই গল্পের 'leit motif; বাহারী উদয়নাগ সপিণী, ঘন কালো চক্রচিহ্নযুক্ত তার গাঢ় লাল ফণা, উদায়মান সূর্যের রক্তরাগে তার ফণা দুলিয়ে খেলা ইত্যাদির উল্লেখ থেকে এই মোটিফ' নিরূপণে খুব বেগ পেতে হয় না। জনৈক সাপুড়িয়া যে গল্পের মুখ্য চরিত্র সে গল্পে স্বাভাবিকভাবেই সাপ, পখেলা, তার বিষ-বিষদাঁত ছোবল ইত্যাদি বারবার এসেছে। সাপ তথা উদয়নাগ সপিণীর শাভা শেখের হাত জড়িয়ে 'বাহারের খেলা', যেমনটা সাপিনী করে থাকে মিলনের পূর্বরাগ হিসেবে, এই মোটিফ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। জোবেদার তিরস্কার অগ্রাহ্য করে খোঁড়া তার প্রিয় সর্পিণীর সঙ্গে খেলা করতে করতে এক আশ্চর্য সঙ্গসুখ ভোগ করে 'জোবেদা বিস্মিত হইল না, কারণ ও দৃশ্য তাহার নিকট নূতন নয়। কিন্তু সে বিরক্তিভরে বলিল, ছি ছি ছিঃ ! তোর কি ঘেন্না পিত্তিও নাই? কত বার তোক বারণ করেছি, বল তো? সে কথায় খোঁড়া কানই দিল না। সে বলিল দেখ দেখ, কেমন আমার

হাতটা জড়িয়ে ধরেছে, দেখ দেখি! জানিস, সাপিনী আর সাপে যখন খেলা করে, ওখন ঠিক এমনই করে জড়াজড়ি করে ওরা। দেখেছিস কখনও? আঃ সে যে কি বাহারের খেলা মাইরি!' এভাবেই সাপিনী হয়ে ওঠে যৌবনের কদাচারে' কুৎসিত-দর্শন সাপুড়িয়ার দেহজ বাসনার প্রতিরূপ। খোড়া শেখের আসক্ত দৃষ্টিতে, তার মগ্নচৈতন্যে নাগিনী রূপান্তরিত হয় নারীতে।

আবার সপিণীকে জঙ্গলে ছেড়ে এসে খোঁড়া শেখ যখন মনমরা হয়ে বসে থাকে, জোবেদা তাকে চাঙ্গা করে তুলতে চায় সান্নিধ্যের প্রগলভ উত্তাপে-জোবেদা এবার স্বামীর পাশে বাসিয়া আদর করিয়া গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, কেনে রে, আমাকে তোর ভাল লাগে না? নারী এখানে নাগিনীর মতো; নিবিড় আকর্ষণে জড়াতে চাইছে,

তার ভালবাসার পুরুষকে। এভাবেই তো বিবি' জড়িয়েছিলো খোঁড়াকে, তার গলায়, কাঁধে, হাতে। জোবেদাকে সাদরে চুম্বন করে খোঁড়া, ঠিক যেমনভাবে তার আদরের সর্পিণীর ঠোটে সে একেঁ দিয়েছিল চুম্বন চিহ্ন। গল্পের শেষে নারীর অপঘাত মৃত্যু ও নাগিনীর ঝোপ-জঙ্গলে ফিরে যাওয়ায় খোড়ার কামনার করুণ যবনিকা।এ গল্পে খোঁড়া শেখের উত্তরণ নেই; অসংযমী ও স্বেচ্ছাচারী সাপুড়িয়ার রুদ্ধ বাসনার দহন, বিপর্যয় ও আত্মনিগ্রহ এক অন্ত্যজ মানুষের ট্র্যাজিক পরিণতিকে ফুটিয়ে তুলেছে এ গল্পে। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা ও কুশ্রীতার সঙ্গে যেন

মানানসই তার সপিণীর প্রতি অদম্য আসক্তি, যে আসক্তির পরিপূরণ অসম্ভব, আবার যার হাত থেকে মুক্তি প্রবৃত্তিনির্ভর খোঁড়া শেখদের কর্ম নয়। গল্পের শেষ লাইনে নাগিনীর প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট মন্তব্যে নারীবিদ্বেষের ছাপ যেমন রয়েছে, তেমনি খোঁড়ার বিপর্যস্ত মনের প্রচ্ছন্ন দহন কি নেই? পড়া যা আর একবার-বিবিবে খোঁড়া বধ করিতে পারে নাই। তাহাকে সে ছাড়িয়া দিয়াছিল। বলিয়াছিল, শুধু তোর দোষ কি, মেয়েজাতের স্বভাবই ওই। জোবেদাও তোকে দেখতে পারত না।

তারাশঙ্করের অনুজপ্রতিম বন্ধু অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য মানবীয় আসক্তির এই আশ্চর্য সম্বন্ধে যা বলেছেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য : নারী ও নাগিনী' গল্পে মানবীয় আসক্তির লীলা মানবেতর জগতে সম্প্রসারিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ 'বসুন্ধরা' কবিতায় তার সর্বানুভূতিকে ভাষা দিয়ে বলেছিলেন—

হিংস্র ব্যাঘ্র অটবীর

আপন প্রচণ্ড বলে প্রকান্ড শরীর

বহিতেছে অবহেলে,—দেহ দীপ্তোজুল

অরণ্য-মেঘের তলে প্রচ্ছন্ন-অনল

বজ্রের মতন, রুদ্র মেঘমন্দ্র স্বরে

পড়ে আসি অতর্কিতে শিকারে' পরে

বিদ্যুতের বেগে, অনায়াস সে মহিমা,

হিংসাতীব্র সে আনন্দ, সে দৃপ্ত গরিমা,

ইচ্ছা করে একবার লভি তার স্বাদ।

এই সর্বানুভূতির স্তরেই তারাশঙ্করের 'নারী ও নাগিনী'র রসলীলা বিলসিত।"

অধ্যাপক ভট্টাচার্যের বিচারে কোন 'জৈব আসক্তি' নয়, মানবিক হৃদয়াসক্তিই তারাশঙ্করের এই গল্পের সারবস্তু। গল্পের শেষে জোবেদা ও নাগিনী বিবিকে নারী হিসেবে খোঁড়া শেখের চোখে এক করে দিয়ে লেখক যে ইঙ্গিতময়তার সৃষ্টি করেছেন তার ব্যঞ্জনা আমাদের চমৎকৃত করে।

'নারী ও নাগিনী' গল্পটি প্রথম পুরুষ বিবরণদাতা' (third person narrator)-র জবানীতে লেখা। ফলে গল্পের বিশ্বাসযোগ্যতা ও অবজেকটিভিটি কোনওভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নি। আগাগোড়াই বেশ কাছ থেকে খোঁড়া শেখ-জোবেদা-নাগিনীবিবির ত্রিকোণ টানাপোড়েনকে। দেখেছেন ও বস্তুনিষ্ঠভাবে উপস্থাপনা করেছেন ন্যারেটার; গল্পকার এখানে যে সময় কাঠামো বা time-frame ব্যবহার করেছেন সাধারণভাবে ত' ছোটগল্পের পক্ষে কিছুটা বড়মাপের বলে মনে হয়। ইটের পাঁজার অদূরবর্তী খোলা মাঠ থেকে ওঝা সাপিনীকে বন্দী করে ঘরে নিয়ে আসার ছ'মাস পরে তার নাকে গয়না পরিয়ে তাকে নিকে করে। এরও কয়েক মাস বাদে এক বাদলদিনে তাকে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসে খোঁড়া। সেইদিনই ফিরে আসে সর্পিণী; তাকে তাড়ায় জোবেদা এবং সে রাতেই নাগিনী বিবি দারুণ প্রতিহিংসায় দংশন করে জোবেদাকে। পরদিন সকালে মৃত্যু হয় তার। গল্প শেষ হয় এরও অনেক পরে, যখন খোড়ার ভিটে ধ্বংসস্তুপে পরিণত আর খোঁড়া নিয়েছে ফকিরি। এই লম্বা সময়-কাঠামো গল্পটিকে প্রোয়োজনীয় বিস্তার ও বাস্তবতা দিয়েছে। কিশোর উদয়নাগের যৌবনবতী সপিণী হয়ে ওঠা, তার প্রতি খোঁড়ার আসক্তি এবং খোঁড়ার অন্তিম বিপর্যয় একটি বড়মাপের উপন্যাসোপম time-frame ব্যতিরেকে হতে পারে না। রাঢ় বাংলার যে তপ্ত, রুক্ষ আঞ্চলিক প্রকৃতি তারাশঙ্করের এই গল্প ও অন্যান্য প্রধান রচনার পটভূমি তাতে কামনা-বাসনার তীব্র

দহন আছে। ক্ষিপ্ত নাগিনীর দংশনে জোবেদার মৃত্যুতে প্রকট যে প্রতিহিংসা, নারীর সপিণীসুলভ আক্রোশ আর নাগিনীর আগ্রাসী নারীত্ব, খোঁড়া শেখের বিপর্যয় ও তার ফকিরি-গ্রহণ সেই প্রতিহিংসার মারক জ্বালানী ও করুণ ভস্মশেষ। মানুষ ও পশু-প্রকৃতি এইভাবে মিলে মিশে এক হয়ে গেছে 'নারী ও নাগিনী' গল্পে। সুপ্ত প্রাগৈতিহাসিক কামনার তাড়নায় সর্বস্ব খুইয়েছে খাঁড়া শেখ; লৌকিক জীবনের আদিমতা থেকে নিখিল ও উদার জীবনবৃত্তের বিশালতায় উত্তীর্ণ হতে না পারলেও সে সজীব। রক্ত-মাংসের মানুষ। অপঘাতে মৃত জোবেদাও নারীর অচরিতার্থ বাসনার অসহায় পরিণতি ফুটিয়ে তোলে। রাঢ়বাংলার কাকুরে লাল মাটির তপ্ত আশ্লেষে আশ্লিষ্ট নারী-পুরুষদের চরিত্র রূপায়ণে, সাপুড়িয়া-বেদে সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের জীবনচিত্রে তারাশঙ্কর উত্তরণের মাত্রা আরোপ করতে গেলে বাস্তবতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুন্ন হতো।

এবার আসছি 'নারী ও নাগিনী'র ভাষা-রীতি-নির্মাণ ইত্যাদি প্রসঙ্গে। ভাষা, রচনারীতি নির্মাণকৌশলের ত্রহস্পর্শে একটি সাহিত্যকর্ম সমাদৃত হয়ে থাকে।

মোটের ওপর সাধু গদ্যরীতির প্রতি তারাশঙ্করের এক ধরনের পক্ষপাত ছিলো এবং ১৩৩৪ থেকে গল্প প্রকাশিত হতে শুরু করলেও চলিত ভাষায় তারাশঙ্করের প্রথম গল্প ছাপা হয় ১৩৪৪ সালের 'শনিবারের চিঠি'র কার্তিক সংখ্যায়। গল্পটির নাম 'তিন শূন্য'। পরের মাসেই ঐ একই পত্রিকায় প্রকাশিত তার 'সন্তান' গল্পটি সাধুগদ্যে লেখা। শুধু তাই নয়, ১৩৫০ সালে 'ইস্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগান'-এর আগে চলিত গদ্যে ফেরেননি তারাশঙ্কর। আবার এর পরেও সাধুভাষায় লিখেছেন 'যাদুকরী', 'প্রত্যাবর্তন', 'শ্যামাদাসের মৃত্যু' প্রভৃতি গল্প। ১৩৫৩-এর থেকে অবশ্য প্রধানত চলিত গদ্যরীতিতেই গল্প লিখেছেন তারাশঙ্কর।

'নারী ও নাগিনী' সাধু গদ্যে লেখা। তবে একে হয়তো নির্ভেজাল সাধু গদ্য বলা যাবে না, কারণ এখানে বিবৃতি বা বর্ণনা অংশে সাধু ব্যবহৃত হলেও তার সঙ্গে সংলাপগুলি চলিত গদ্যে লেখা। সাধু-চলিতের এই মিশ্ররীতি তারাশঙ্করের অনেক গল্পেই প্রযুক্ত হয়েছে। সাধু ক্রিয়াপদ ও গম্ভীর তৎসম শব্দের পাশাপাশি লৌকিক ও আটপৌরে শব্দ

ও রাঢ় অঞ্চলের আঞ্চলিক ইডিয়ম (idiom) যে স্বাভাবিক দক্ষতায় বিন্যস্ত করেছেন তারাশঙ্কর তা বিশেষ প্রসংসনীয়, ধরা যাক, ইটের পাঁজার কাছেই খোলা মাঠে সূর্যোদয়ের মুহূর্তে উদয়নাগিনীর নাচের এই বিবৃতিটি; সাধু গদ্যরীতির রক্ষণশীলতার উদাহরণ: "ঈষদূরে প্রান্তরের বুকে বোধ হয় সেই কিশোর সাপটিই পূর্বাকাশের দিকে মুখ তুলিয়া ফণা নাচাইয়া খেলা করিতেছিল। প্রাতঃসূর্যের রক্তাভায় তাহার রঙ দেখাইতেছিল যেন গাঢ় লাল।" আবার এরই পাশাপশি গাড়োয়ান অদাইকে বলা খোঁড়ার এই কথাগুলি স্বাভাবিকভাবেই নির্ভার চলিত কথ্যরীতির নিদর্শন :

"খোড়া হাঁকিল, দে তো অদাই তোর পাচন খানা ছুঁড়ে। যাঃ রে, ঢুকে পড়ল পাঁজার ভেতর! উদয়নাগ রে সাপটা, এ সাপ বড় পাওয়া যায় না। ধরতে পারলে কিছু রোজগার হত রে।"

সাধু গদ্যের লাগোয়া আঞ্চলিক উপভাষার গ্রাম্য শব্দগুলি তারাশঙ্করের গল্পের ভাষাকে এক বিশেষ মাত্রা দিয়েছে। নীচের বাক্য/বাক্যাংশসমূহ এই সুমিত প্রয়োগের নিদর্শন হিসেবে ধরা যায় –

(ক) জোবেদা হাসিতে হাসিতে স্বামীর মাথায় হাত বুলাইয়া বলে, লে-লে, খেপামি করিস ...'

(খ) খোঁড়ার কান্না বাড়িয়া যায়, সে এবার জোবেদার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলে, একজেরা নতুন কানি কখনও দিতে পারলাম। পুরনো তেনা পরেই তোর দিন গেল।

(গ) জোবেদা বলিল, লারব আমি।

(ঘ) খোঁড়া কহিল, বিবির লেগে মন কি করছে রে।

(ঙ) জোবদা এবার স্বামীর পাশে বসিয়া আদর করিয়া গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, কেনে রে, আমাকে তোর ভাল লাগে না?"

(চ) সাদরে তাহাকে চুম্বন করিয়া খোঁড়া বলিল, তোর জোরেই তো বেঁচে রইছি জোকো, তু আমার জানের চেয়ে বেশি।

(ছ) ওয়াকে আমি নিকা করলাম জোবেদা...' (খোঁড়া শেখ, অদাই, জোবেদারা দরিদ্র, অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ। তাদের মুখে স্ল্যাং' (Slang) ও গ্রাম্য অভব্যতার দু-একটি উদাহরণ তো থাকতেই পারে –

(ক) অদাই একটা ঝাকানি খাইয়া গান ছাড়িয়া বলিয়া উঠিল, শালার গরু, কিছ ৯ বলেছি ।

(খ) জানিস, সাপিনী আর সাপে যখন খেলা করে, তখন ঠিক এমনই করে জড়াজড়ি করে ওরা। দেখেছিস কখনও? আঃ সে যে কি বাহারের খেলা মাইরি!

এছাড়া কয়েকটি ভিন্‌দেশী বা অন্য ভারতীয় ভাষার শব্দ তারাশঙ্কর ব্যবহার করেছেন খোঁড়া শেখের মুখে, যেমন, 'খুবসুরৎ', 'মেহেরবানি', 'বড়া ভুখ', 'জান' ও 'মাইরি'। মুসলমান সাপের ওঝার শব্দভাণ্ডারে এ জাতীয় শব্দের উপস্থিতি মুখের ভাষাকে বাড়তি সজীবতা দেয়। তারাশঙ্করের ভার আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো কতকগুলি ভাষণভঙ্গী বা বাচনিক উক্তির দ্বারা বাক্যের উপরি-স্তরে নারী-চরিত্র চিহ্নিত করা :

(ক) 'লে-লে খেপামি করিস না, ছাড় আমাকে—দুটো চাল দেখে আনি।

(খ) "জোবেদা হাসিয়া বলিল মর মর। তোর কথা শুনে কি হয় আমার!

জোবেদার মুখে সোহাগ-প্রকাশক 'লে-লে' আর 'মর মর'-এর মতো 'মেয়েলি শব্দ' থেকে জোবেদার বাসনাতাড়িত নিয়তির কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যায়। তার নারীত্বের দাবী, স্বামী-সোহাগের আকাঙক্ষা এবং চটুলতার ছাপ রয়েছে তার মুখের ভাষায়। 'আম্বনিয়ক বিচ্যুতি' (Syntactic deviation) অর্থাৎ স্বাভাবিক বাক্যবিন্যাসের কোনো ব্যতিক্রম সৃজনী-সাহিত্যের ভাষার এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। অন্বয় বা পরক্রমের স্বীকৃত রীতিকে লঙ্ঘন করে আম্বয়িক বিচ্যুতি ঘটানো হয় বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে। তারাশঙ্করের গল্পে এই ধরনের বিচ্যুতি আছে। যেমন নিম্নলিখিত বাক্যগুলিতে কর্তৃপদ তার প্রথম-অবস্থান থেকে সরে গেছে। 'বিপর্যাস' (Inversion) গুলি লক্ষ করুন :

(ক) ইটের পাঁজা হইতে খোঁড়া শেখ ইট ছাড়াইতেছিল।

(খ) বাঁ হাতে করিয়া একখানা খুঁটে খুঁড়িয়া সে বিবিকে মারিল।

(গ) একটা হাঁড়িতে বেড় দিয়া নাগিনী ধীরে ধীরে চলিয়াছিল।

(ঘ) উদয়নাগ রে সাপটা, এ সাপ বড় পাওয়া যায় না।

আবার কখনো ক্রিয়াপদ তার স্বাভাবিক স্থান থেকে সরে এসে বিপর্যাস তৈরী করেছে: 'সেখানে দেখা যায় শুধু একটা বীভৎস গহ্বর।

তারাশঙ্করের গদ্যের দুটি স্তর।একটি স্তরে সাধুভাষায় লেখকের নিজস্ব বিবৃতি, আর অন্য স্তরে কথা বা চলিত ভাষা যা' ব্যবহৃত হয়েছে কথোপকথন অংশে। তবে সংলাপের ভাষাও বলতে গেলে এক মিশ্রভাষা, কখনো স্ট্যাণ্ডার্ড কথ্য ভাষারীতি, আবার কখনো উপভাষা বা বিভাষার প্রয়োগ। এই উদ্ধৃতিগুলি থেকে বিষয়টি বোঝা যাবে :

(ক) হাসিয়া খোঁড়া বলিল, বিশ্বাস নাই ওদের বিষদাঁতকে। নইলে ওরাও তো ভালবাসে জোবেদা। বিষদাঁতই নাই, কিন্তু আর দাঁত তো রয়েছে, কই আমাকে তো কামড়ায় না। (আদর্শ ভাষার এই নমুনায় সাধু-রীতির ছোঁয়া রয়েছে অধধারেখ অংশগুলিতে)

(খ) জোবেদা বলিল, এমন করে বসে কেনে বলত? গাঁজা-টাজা খা কেনে। খোড়া কহিল, বিবির লেগে মন কি করছে রে। (এই সংলাপ বাঁকুড়া-বীড়ভূমের উপভাষায় রচিত) ও সাহিত্যে উপভাষার ব্যবহারের সীমা নিয়ে বিতর্ক আছে। তাছাড়া গ্রামের সাধারণ মানুষেরা হন শহুরে শিক্ষিত লোকদের সঙ্গে কথা বলে তখন মিশ্র ভাষায় কথা বলাটা তাদের পক্ষে অসঙ্গত নয়। কিন্তু খোড়া শেখ ও জোবেদা যখন তাদের নিজেদের মধ্যে কথা বলে, তখন কখনো আদর্শ কথ্যরীতি, আবার কখনো ঔপভাষিক রীতির ব্যবহার গল্পলেখকের ভাষাপ্রয়োগে দোটানার পরিচায়ক । এছাড়া জোবেদা ও খোঁড়া শেখ এই গল্পে বরাবর কথোপকথনের সময় তুই-তোকারি করেছে একজন অন্যজনের সঙ্গে। গ্রামীণ অন্ত্যজ দাম্পত্যে অন্তরঙ্গতার এ এক স্বাভাবিক রূপভেদ –

(ক) জোবেদা বিস্মিত হইল না, কারণ এ দৃশ্য তাহার নিকট নূতন নয়। কিন্তু সে বিরক্তিভারে বলিল, ছি ছি ছিঃ ! তোর কি ঘেন্না পিত্তিও নাই? কত বার তোকে বারণ করেছি, বল তো?

(খ) খোঁড়া বলিল, দেখ দেখ, কেমন আমার হাতটা জড়িয়ে ধরেছে দেখ।
একইরকমভাবে তার নিকে করা নাগিনী বিবিকে খোঁড়া সম্বোধন করেছে কখনো সোহাগভরে, কখনো ভীতিপ্রদর্শনের সুরে —

(ক) ...বিবিকে বলিল, দেখ দেখ বিবি, কি বাহার তোর খুলেছে দেখ দেখি!

(খ) খোঁড়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া সাপটাকে আঁপিতে বন্দী করিয়া বলিল, জোবেদা যদি না বাঁচে, তবে তাকেও শেষ করব আমি।

ছোটগল্প শুরু হয় চকিত চমকে, একেবারে প্রথম বাক্য থেকেই একটিমাত্র বক্তব্যের সামগ্রিক উন্মেচনের সুনিশ্চিত লক্ষ্যে তার যাত্রা। তার শুরু মাঝখানে থেকে, শেষও মাঝপথের আকস্মিকতায়। প্রতীতির খণ্ডতার মধ্যেই ছোটগল্প আভাসিত হয় বিশাল ও গভীর জীবনসত্য। কোন একটি ঘটনা, পরিবেশ বা মানসিকতাকে অবলম্বন করে ছোটগল্প দ্রুত উপনীত হয় তার মহামুহূর্ত' বা Climax-এ। হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো খণ্ডচিত্রের ভেতরে উদ্ভাসিত হয় এক গূঢ় উপলব্ধি। 'নারী ও নাগিনী' শুরু হয়েছে মাঝখান থেকেই—ইটের পাঁজা হইতে খোঁড়া শেখ ইট ছাড়াইতেছিল। এরপর চারটি বাক্যে খোঁড়া শেখের একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিকৃতি। আর তারপরই গাড়ি নিয়ে গান গাইতে গাইতে আসতে থাকা অদাইয়ের হঠাৎ ঝাঁকুনি খেয়ে থেমে যাওয়া ও ভয়ার্ত চিৎকার— 'খোঁড়া, খোঁড়া সাপসাপ!' এই উদয়নাগ সর্পিণী ও তার প্রতি ওঝা খোঁড়া শেখের অদ্ভুত আসক্তিই এ গল্পের এক ও একমাত্র বিষয়। 'প্রাতঃসুর্যের রক্তাভা'য় গাঢ় লাল ফণার ওপর ঘন কালো চক্র-চিহ্নের অপূর্ব বর্ণলেখা দেখে ঘোর লেগে যায় খোঁড়ার মনে। সর্পিনীর প্রেমে পড়ে সে। সোহাগভরে তার নাকে মিনি পরিয়ে, মুখে চুম্বন এঁকে, মাথায় সিদুর দিয়ে আদরের বিবিকে নিকা করে খোড়া। এইভাবে এক আশ্চর্য আসক্তির স্তরভেদ চিহ্নিত করে তারাশঙ্কর তার গল্পকে নিয়ে যান চরম মুহূর্তের দিকে। দুরন্ত বাদলা দিনে বন্ধ ঝাঁপি থেকে বিবির গায়ের গন্ধ বেরোলে খোঁড়া তাকে পাশের জঙ্গলে

ছেড়ে দিয়ে আসে। মিলননান্মুখ সপিণী জড়িয়ে ধরতে চায় খোঁড়ার হাত। বিবিকে ছেড়ে এসে বিমর্ষ খোঁড়া ক থাকে মনমরা হয়ে। উদয়নাগিনী কিন্তু ফিরে আসে জলনিকাশী নালিপথ ধরে। নাগিনী ক্রুরতায় তাকে আঘাত করে জোবেদা। ব্যর্থ আক্রোশে কয়েকটা ছোবল মেরে উদয়নাগিনী চলে যায়। কিন্তু সেই রাতেই ফের আসে প্রতিশোধ নিতে। মাঝরাতে দংশন করে জোবেদাকে। এই সেই মহামুহূর্ত বা climax। নাগিনীর প্রতিহিংসার এবং এ গল্পের অমোঘ নিয়তির চরমক্ষণ। নাগিনীকে ঝাপিতে বন্ধ করে রাখে খোঁড়া। তার 'জানের চেয়ে বেশি জোবেদার কিছু হয়ে গেলে সপিণীকেও শেষ করে দেবে বলে শাসায়। কিন্তু জোবেদা মারা গেলে পর বিবিকে সত্যি সত্যিই কিছু করতে পারে না সে। তাকে সে মুক্ত করে দেয়। সংসার, দাম্পত্য, ঘর-গেরস্থালী খুইয়ে ফকিরি নেয় খোঁড়া। গল্পের শেষে যে উপলব্ধিতে পৌঁছোয় খোঁড়া তা প্রতীতির খন্ডিত সীমারেখাকে অতিক্রম করে এক সমগ্রতার চকিত আভাস দেয়: বিবিকে খোঁড়া বধ করিতে পারে নাই। তাহাকে সে ছাড়িয়া দিয়াছিল। বলিয়াছিল, শুধু তোর দোষ কি, মেয়ে জাতের স্বভাবই ওই। জোবেদাও তোকে দেখতে পারত না। গল্পের অন্তিমলগ্নে এই ইঙ্গিতময়তা ও ব্যঞ্জনার উদ্ভাস গল্পটিকে এক স্বতন্ত্র মাত্রায় চিহ্নিত করে।

মনুষ্যের প্রাণীদের প্রতি মানুষের প্রেম নিয়ে বাংলা ভাষায় অনেকগুলি স্মরণীয় গল্প আছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের আদরিণী', শরৎচন্দ্রের 'মহেশ', তারাশঙ্করেরই 'কালাপাহাড়' ও 'গবিন সিংহের ঘোড়া' ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে 'নারী ও নাগিনী' ঠিক এদের গোত্রভুক্ত নয়। অবদমিত কামনা ও জৈব আসক্তির যে চিত্র আলচ্য গল্পে পাই তা অন্যত্র পাওয়া যায় না। 'কালাপাহাড়' গল্পে রংলাল চরিত্রের আধারে মানবসত্যের যে সন্ধান

তারাশঙ্কর করেছেন তাতে দেখতে পাই মানুষের সঙ্গে পশুর মানবিক সম্পর্কের বলিষ্ঠ স্বাভাবিকতা। 'গবিন সিংহের ঘোড়া'-য় একইভাবে পশু মনস্তত্ত্বের চিত্র দেশ ও কালকে অতিক্রম করে গেছে। অনুরূপ সম্পর্কের যে ব্যাপ্তি ও মর্মস্পর্শী আবেগ 'মহেশ' ও আদরিণী'র মতো গল্পে পাই তাও 'নারী ও নাগিনী'তে পাওয়ার কথা নয়। মনুষ্যেতর

প্রাণীর প্রতি আসঙ্গলিপ্সা তথা 'প্যারাফিলিয়া' (paraphilia)-র এক বিচিত্র কাহিনী নারী ও নাগিনী', যা রাঢ়মৃত্তিকার বাস্তবতা থেকে এক জীবনসমগ্রে ব্যঞ্জিত।

পাঠক ও সমালোচকেরা নারী ও নাগিনী'র সঙ্গে মপাসাঁর 'মারোকা' এবং ব্যালজাকের 'এ প্যাশন ইন দ্য ডেজার্ট' গল্প দুটির সাদৃশ্য খুঁজে পান। বর্তমান নিবন্ধের শেষে এ বিষয়ে দু'চার কথা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। রাতের খররুক্ষ উত্তাপের 'রৌদ্ররসে অভিষিক্ত' যেমন খোঁড়া শেখ-জোবেদারে জীবন, তেমনি আফ্রিকার মরুদেশের দহনজ্বালা নারীরূপী নাগিনী মারোকার শিরায়-ধমনীতে। কামনার প্রখর দাবদাহ আর তৃষ্ণা মারোকার বক্ষজুড়ে। উত্তম পুরুষে বলা এই গল্পে লেখক এই মূর্তিমতী কামনার ভয়ঙ্কর আকর্ষণ ও নিষ্ঠুরতার চমকপ্রদ কাহিনী শুনিয়েছেন আমাদের। সমুদ্রতীরে পাথরের আড়ালে স্নানরতা মারোকার নগ্ন রূপ দেখে আকৃষ্ট হয়েছিলেন লেখক। স্পেনীয় উপনিবেশকারীদের কন্যা ও জনৈক ফরাসী উচ্চপদহের ভাষা এই মারোকা তার কামনার অপ্রতিরোধ্য আগ্নেয় টানে লেখককে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল তার ঘরে। তাদের উন্মত্ত নিশিযাপনের ঠিক পূর্বগ্নে ফিরে এসেছিল মারোকার স্বামী, তার ফেলে যাওয়া মানিব্যাগ নিয়ে । খাটের নীচে রুদ্ধশ্বাসে লুকিয়ে বসেছিল মারোকার প্রেমিকপুরু। তার কে দুলা-কলায় ভুলিয়ে বিদায় করার পর সন্ত্রস্ত প্রেমিকপুরুষ। তাকে ছলাকলায় ভুলিয়ে বিদায় করার পর সন্তস্ত্র প্রেমিক পুরুষ জানতে চেয়েছিল যদি তাকে ফরাসী রাজ প্রতিনিধি তবে কি করত মারোকা? তার ঝকঝকে দাতের মাদর ও লাসের আগ্রাসী ভঙ্গীতে লেখকতে বিদ্ধ করে মারোকা জানায় যে একটি ধারালো এর তৈরী রেখেছিল সে; যদি তার স্বামীর মাথার টুপিটা পড়ে যেত মেঝেয় আর সেটা তুলতে ঝুঁকত সে এবং দেখতে পেত প্রেমিক-পুরুষটিকে মাথা আর তুলতে হত না তাকে। কি অসম্ভব কুটিল জিঘাংসা মিশে ছিল মারোকার বাসনাতাড়িত সত্তায়। তারাশঙ্করের খোঁড়া শেখ মারোকার মত অস্বাভাবিক কামনার শিকার হলেও সে জোবেদাকে ভালবাসতো না, এমন নয়। খোঁড়ার পরিণতি তাই অনেক বেশি করুণ।

আসার গল্পে প্রেমের আদিম রূপের প্রতীক নারী; ব্যালজাকের 'এ প্যাশন ইন দ্য ডেজার্ট' - এ তার প্রতিরূপ বাঘিনী। মানবেতর হিংস্র জীবের সঙ্গে মানুষের অ-সম

প্রেমের গল্প হিসাবে বালজাকের কাহিনীর সঙ্গে নারী ও নাগিনী' তুলনীয়। কিন্তু তারাশঙ্করের গল্পে খোঁড়ার দুই বিবি জোবেদা ও উদয়নাগিনী দুই সতীনের মতোই পরস্পরের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণা। জোবেদা সপিণীর কামড়ে মারা গেলেও খোঁড়া উদয়নাগিনীকে মারতে পারল না কিছুতেই। সে বিপর্যস্ত হল সর্বস্ব হারিয়ে। অথচ ব্যালজাকের গল্পে আমরা দেখি সৈনিকপুরুষকে বাঘিনীকে হত্যা করে আসক্তির মোহজাল থেকে মুক্ত হতে। ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ ও লৌকিক ঐতিহ্যে সাপ বারবার অশুভ শক্তি, গোপন কামনা বাসনা ইত্যাদির প্রতীক রূপে উল্লেখিত হয়েছে। তারাশঙ্করের গল্প উপন্যাসে

কালনাগিনী, নাগকন্যা, যাদু-সাপ, নাগচক্র প্রভৃতির মোটিফ ও চিত্রকল্প বহুবার বহুভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, বিশেষত নাগিনী কন্যার কাহিনী' ও 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'-য়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে, রাঢ়বাংলার সমাজ-পরিবেশ, লৌকিক ঐতিহ্যের বাতাবরণ ও সর্বোপরি লেখকের শিল্পবোধ একটি সাপিনীকে অবলম্বন করে মানব-অভিজ্ঞতার এক দুরধিগম্য অন্তর্জগৎ উন্মোচিত করেছে 'নারী ও নাগিনী' গল্পে।

৪.৪ কালাপাহাড়

বীরভূম তথ্য রাঢ় অঞ্চলের কথাকার তারাশঙ্করকে 'স্বক্ষেত্রে স্বরাট' বলে সম্বোধিত করেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। বাংলা ছোটগল্প ও উপন্যাসে আঞ্চলিকতার রস পরিবেশন করেও আঞ্চলিকতাকে অতিক্রমণের সাফল্যের উৎসে তারাশঙ্করের প্রভূত জীবনাভিজ্ঞতা নিহিত। তাঁর জীবনাভিজ্ঞতার শিল্পায়ন ঘটেছে নানাভাবে। বীরভূম তথা রাঢ় অঞ্চলকে চিনতে বা জানতে হলে কোনো ট্যুরিষ্ট গাইডের প্রয়োজন হয় না, তারাশঙ্করের গল্প-উপন্যাস পড়লেই জানা যায়। উত্তর-শরৎচন্দ্র যুগে তার মতন ব্যাপক অভিজ্ঞতার অধিকার, জীবনকে দেখার ধরন ও ধারণ এবং সমাজদ্বন্দ্বের স্বরূপটি অনুধাবন করার ক্ষমতা অনেকেরই ছিল না। তবে তার পাশাপাশি আরও দুজন অসাধারণ শিল্পীর নাম মনে পড়বে অনিবার্য কারণেই; এঁরা হলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই দুজন তো বটেই এবং তারাশঙ্করও কেউই কল্লোলীয় ছিলেন না। এঁরা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র; এঁরা স্বকীয়তায় উদ্ভাসিত।

মানিককে বুদ্ধদেব বসু 'Belated Kallolean' বলে যেমন সুবিচার করেন নি, অচিন্ত্যকুমারের কথায় মানিক যেমন কল্লোলের কুলবর্ধন' নন, তেমনি আমাদের বিবেচনায় বিভূতিভূষণও কল্লোলের আদর্শকে আঁকড়ে ধরেন নি। তারাশঙ্কর তো ননই।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন—"তারাশঙ্কর এসেছিলেন কল্লোলের'র কলধ্বনির ভেতর। তখন বুদ্ধিজীবী তরুণ মনের ক্ষোভ-যন্ত্রণা-নৈরাশ্য-প্রতিবাদ এক নতুন নেতিবাদী আন্দোলন গড়ে তুলছে। গ্রামের মানুষ তারাশঙ্কর এই আন্দোলনের অংশীদার ছিলেন না। সংক্ষিপ্ত একটি রাজনৈতিক জীবন সমাপ্ত করে দেশের দুঃখীজনের সেবাব্রতের ফাঁকে ফাঁকে কিছু কিছু সাহিত্য সাধনায় তিনি ব্রতী। কিন্তু তাঁর সাহিত্যসত্তার প্রথম বোধন ঘটল এই কল্লোলীয়দেরই একটি গল্পে। গল্পটির নাম 'পোনাঘাট পেরিয়ে', লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র। তৎক্ষণাৎ তারাশঙ্কর এই নতুন লেখকদের সঙ্গে একটা আত্মিক যোগ অনুভব করলেন।" নারায়ণবাবু 'আত্মদীপ তারাশঙ্কর' প্রসঙ্গে এভাবে আলোচনা করেও এই মন্তব্য করতে ভোলেন নি—"তবু তারাশঙ্কর কল্লোলের দ্বারপ্রান্ত পর্যন্তই পৌঁছেছিলেন—ভেতরে প্রবেশ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।" কল্লোলের ভেতর মহলে প্রবেশ করা তাঁর পক্ষে সম্ভবও ছিল না। এটি তার ব্যর্থতা নয়। এর জন্য দায়ী। তারাশঙ্করের মনোগঠন ও জীবনদৃষ্টি। একথা ঠিকই, তারাশঙ্কর প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পোনাঘাট পেরিয়ে' গল্পে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, এ ব্যাপারে তার স্বীকারোক্তিও আছে। এও সত্য, 'কল্লোল' ও 'কালি-কলম' পত্রিকায় তিনি পথনির্দেশই পেয়েছিলেন, কিন্তু তার পক্ষে মনেপ্রাণে কল্লোলীয় হয়ে ওঠা সম্ভব হয় নি। 'কল্লোলে'র নাগরিকমানস' ও তারাশঙ্করের পল্লীপ্রাণতায় ব্যবধান বিস্তর। এমনকি কল্লোলের 'নাগরিকমানস' ও তারাশঙ্করের পল্লীপ্রাণতায় ব্যবধান বিস্তর। এমনকি কল্লোলে'র পল্লীজীবন ও সমাজসম্পর্কিত ধারণার সঙ্গে তারাশঙ্করের গ্রামীণ চেতনার পার্থক্যও বিস্তর। কল্লোলে'র লেখক-গোষ্ঠী পল্লীবাংলা নিয়ে গল্প লিখলেও সেসব গল্পে গল্পীবাংলার রক্তমাংসের গন্ধ বা এই নেই, যা পেয়ে যাই তারাশঙ্করের গল্পে। কল্লোলের রবিদ্রোহিতা, প্রথানুগত্যের বিরুদ্ধে মনত ইংরেজী-ফরাসী রুশ, কন্টিনেন্টাল, তথা

স্ক্যান্ডেনিভিয়ান সাহিত্য পাঠের কলরব থেকে না তারাশঙ্কর তার গভীর জীবনবোধ থেকেই স্বীকার করেছেন--"বিদ্রোহ ও বিপ্লবে প্রভেদ আছে। আমি বিদ্রোহের ছিলাম না। বর্তমানকে ভেঙেচুরে তাকে অগ্রাহ্য করে শূন্যবাদের থে জীবনকে শেষ করার কল্পনায় আমার মনের পরিতৃপ্তি কোনদিন হয় নি। আমার রচনার সমাপ্তি পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলেই সেটা বোধহয় স্পষ্ট হবে। আমার মনে ভেঙে গড়ার গভীর অপু ছিল।" (আমার সাহিত্য জীবন)।যে জীবন ও সমাজকে তারাশঙ্কর দু'চোখ মেলে দেখেছেন, অর্জন করেছেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, জেনেছেন অন্তর দিয়ে, তাঁর উপন্যাসের মতনই ছোটগল্পেও তার প্রাতফলন ঘটেছে। কিন্তু শুধু বস্তুপুঞ্জ সঞ্চয়ন নয়, তার রসায়নে তারাশঙ্করের কবিধর্ম সহায়ক হয়েছে। এই ধারণা অসঙ্গত নয় যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মাটি ও মানুষের শিল্পী, প্রবৃত্তি ও নিয়তির অপার লীলার রূপকার এবং সেই সঙ্গে যে জীবন জীবদেহকে অতিক্রম করে মানবধর্মকে খুজে পায়, তারও শিল্পী। গল্পকার তারাশঙ্কর গ্রাম্যজীবনের সহজ সুরের মধ্যেই তার শিল্পরচনার উপকরণাদি কুড়িয়ে পেয়েছিলেন, সেই গ্রামজীবন তার রাঢ়বাংলার গ্রামজীবন, সর্বোপরি সমগ্র বীরভূম, সেই গ্রামজীবন তার রাঢ়বাংলার গ্রামজীবন, সর্বোপরি সমগ্র বীরভূম এবং আংশিক বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদের গ্রাম্যজীবন।" (তারশঙ্কর : সময় ও সমাজ—আদিত্য মুখোপাধ্যায়) তারাশঙ্করকে মৃত্তিকাসম্ভব জনজীবনের অবিস্মরণীয় কথাকোবিদ' রূপে কেন চিহ্নিত করেন সমালোচক জগদীশ ভট্টাচার্য, তারও সারার্থ খুঁজে নিতে কষ্ট হয় না। রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতিতেও জানা যায়, মাটিকে, মাটির মানুষকে ও জানে, এর সঙ্গে ওর যাোগ আছে। এই বিষয়টি বুঝে নিতে একেবারেই অসুবিধা হয় না, যখন আমরা তারাশঙ্করের গল্পমালা পাঠ করি। তাই সমালোচকমহলে বারে বারে এধরনের মূল্যায়ন ঘুরেফিরে দৃষ্টিগোচর হয়েছে, গ্রামজনপদের লেখক তারাশঙ্করের "গল্পমালা বিশাল বনস্পতির মতন দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মূল মানবজীবনের সেই আদিম মহাশক্তিস্বরূপিনী ধাতুপ্রবৃত্তির উৎসকেন্দ্রে নিহিত, তাদের পত্রপল্লবে রাঢ়ভূমির উত্তপ্ত ধূলি; জ্বালাময় অবকাশের রৌদ্ররসে তারা সমৃদ্ধ। আঙ্গিকের দুর্বলতা, শিল্পগত ত্রুটিবিচ্যুতি সেখানে বড় কথা নয় কারণ তারা বিলাসী ধনীর টবের গাছ নয়।" (গল্পকার তারাশঙ্কর : ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায়)। তারাশঙ্করের গল্পের ব্যাপক বৈচিত্রের মূলে

তার ব্যাপক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। তার উপন্যাসসমূহের মতন তার গল্পসমূহের পরিমাণ কম নয়। তার দীর্ঘ ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যজীবনে উপন্যাসের সংখ্যা যদি সওরের অধিক ধরা যায়, তবে গল্প-গ্রন্থের সংখ্যা পঁয়ত্রিশটি, গল্পের সংখ্যা একশত নব্বই বা তার কিছু বেশি। তিয়াত্তর বৎসরের জীবৎকালে (১৮৯৮-১৯৭২) তারাশঙ্করের সাহিত্যসাধনার কাল পঁয়তাল্লিশ বৎসর (১৮২৬-১৯৭১)। তাঁর সৃষ্টিকর্মের প্রাচুর্য লক্ষ্য করে ডঃ ভূদেব চৌধুরী তারাশঙ্করকে বলেছেন 'বহুপ্রজ' লেখক। প্রচলিত গল্প সংকলনগুলি থেকে নির্বাচিত করে জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদনা করেছেন তারাশঙ্করের 'গল্পগুচ্ছ'। সংকলন থেকে কোনো সমালোচকের অভিমত অনুযায়ী সঙ্গত কারণেই বাদ পড়েছে আত্মকথামূলক' রচনার সংকলন 'আয়না' (১৯৬৭) এবং 'স্মৃতিকথা'র সংকলন 'নারী রহস্যময়ী', (১৯৬৭) ও 'মিছিল' (১৯৬৯)। তারাশঙ্করের উল্লেখযোগ্য গল্পসংকলনগুলি হল—জলসাঘর (১৯৩৭) রসকলি' (১৯৩৮), 'তিনশূন্য' (১৯৪১), 'প্রতিধ্বনি' (১৯৪৩), 'বেদেনী' (১৯৪৩)। 'যাদুকরী' (১৯৪৪), 'হারানো সুর' (১৯৪৫), 'কামধেনু' (১৯৪৮), 'বিষপাথর' (১৯৫৭), 'তপোভঙ্গ' (১৯৬৬), 'দীপার প্রেম' (১৯৬৭), 'এক পশলা বৃষ্টি' (১৯৬৭) প্রভৃতি।

বৈষ্ণবরসাশ্রয়ী 'রসকলি', 'হারানো সুর' আর 'স্থলপদ্ম' কল্লোল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে ১৯২৮-২৯-এ। অবশ্য এরও আগে বেনামিতে তার চারটি রচনা-মুলক কথিকা প্রকাশিত হয়েছে 'পূর্ণিমা' পত্রিকায় এবং 'স্রোতের কুটো' গল্প। কিন্তু নানা সূত্রে তারাশঙ্কর নিজেই ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন কেন তিনি রসকলি'কে প্রথম গল্পের মর্যাদা দিয়েছেন। আচম্বিতে পৃথিবীর মায়াপুরীতে এটা ওটা নাড়তে নাড়তে সোনার কাঠি ('রসকলি') কুড়িয়ে' পেলেন তারাশঙ্কর। 'রসকলি', 'হারানো সুর' আর 'স্থাপদ্ম' পড়ে কল্লোলীয়রা তারাশঙ্করের প্রতি আকৃষ্ট হলেও, আত্মীয়তা বোধ করলেও, গভীরতর বিশ্লেষণে তিনি ভিন্ন মনোভঙ্গির লেখক; তাঁর বৈষ্ণব চরিত্র ভেকধারী' নয়, 'গৃহস্থ' বৈষ্ণব; এইসব গল্পে নিছক রোমান্স রস নয়, মানবিকতার ফল্গুধারা প্রবাহিত। আমরা মনে রাখব, তারাশঙ্কর কল্লোলে'র বিদ্রোহ চপলতার কালেই লিখেছেন এইসব বৈষ্ণব রসাশ্রয়ী গল্প। 'সন্ধ্যামণি'র মতন গল্পে প্রকাশ করেছেন পিতৃহৃদয়ের বেদনা। তাঁর

উপন্যাসে রাজনীতি যেমন প্রাধান্য পেয়েছে, ছোটগল্পে সেভাবে প্রাধান্য না পেলেও সমাজকেন্দ্রিকতা হারিয়ে যায় নি, বরং গল্পে গল্পে তার ডাইমেনশন বেড়েছে। শ্রেণীগতভাবে তিনি ছিলেন বীরভূমের পতনোম্মুখ জমিদার বংশের সন্তান। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন বিলীয়মান সামন্ততন্ত্র তথা জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে উদীয়মান বণিকতন্ত্রের সংঘাত। স্বকাল ও কালান্তরের মহিমা তাঁর অনুভবগোচর হয়েছিল। আমার সাহিত্যেকর্মের মধ্যে কালের বিবর্তন সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে বিলীয়মান গোষ্ঠী, বিশেষ ধারার ব্যক্তিত্ব, একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।ক্রমশ বিলীয়মান জমিদার শ্রেণী আমার সাহিত্যে খুব বড় অংশ জুড়ে রয়েছে।" (আমার সাহিত্য জীবন),—বলেছেন তারাশঙ্কর। এই স্বীকারেক্তির প্রমাণ পাই 'রায়বাড়ি', জলসাঘর' সাড়ে সাতগণ্ডার জমিদার', 'বন্দিনী কমলা', 'চারহাটির স্টেশন মাষ্টার', 'ময়দানব', 'রাজা রাণী ও প্রজা', 'সমুদ্রমন্থন' প্রভৃতি গল্পে।।

তারাশঙ্করের গল্পে শুধু জমিদারশ্রেণী বা জমিদার ব্রাক্ষ্মণ সম্প্রদায়ই স্থান পায়নি, সমাজের তলদেশের ব্রাত্য, অন্ত্যজ শ্রেণীও স্থান পেয়েছে। অনায়াসে তাঁর গল্পে পাওয়া যায় বেদে, পটুয়া, মালাকার, লাঠিয়াল, চৌকিদার, ডাকহরকরা, চাষী, হাড়ি, বান্দী। তাঁর গল্পে নীচুতলার মানুষের মিছিল, গল্পের চরিত্র জীবন ও সমাজ থেকেই জেঁকে নেওয়া—বাজিকর শ্যু-রাধা কিষ্টো, তারিণীমাঝি-সুখী, খোঁড়া শেখ-জোবেদা, দীনু ডোম, রতন বাগদী, বিলাসপুরী কামিন চুড়কী, ট্যারা বাউরী, বাবাজী, গোপিনী, রংলাল, পদ্ম, দুর্গা, জগন ডাক্তার, মঞ্জরী, অনিরুদ্ধ কর্মকার প্রভৃতি। আর এদের নিয়ে গড়ে ওঠে গল্প 'বেদেনী', 'নারী ও নাগিনী', 'তারিণী মাঝি', 'ডাকহরকরা', 'আখড়াইয়ের দীঘি', 'কালাপাহাড়', 'ঘাসের ফুল', 'বাউল' ইত্যাদি।

তারাশঙ্কর সমাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন নি। হতে পারে তাঁর শেষ পর্বের কিছু গল্পে আধ্যাত্মিক ভাবনার প্রভাব লক্ষ করা কঠিন নয়, তা তাঁর জীবনদর্শনেরই অন্য এক দিক, সেখানে অকারণ বৈরাগ্য নয়, সেখানে অসৎ ও সত্য, হিংসা ও ক্ষমার মধ্যে শেষোক্ত গুণ দুটি বেছে নেওয়া—শ্যিামাদাসের মৃত্যু', 'দেবতার ব্যাধি', 'বোবা কান্না', না ইত্যাদি এ রকমই গল্প। মন্বন্তর-আগষ্ট আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ধরা রয়েছে ইস্কাপন'

‘মরামাটি, বোবা কান্না’, ‘পৌষলক্ষ্মী’, ‘শেষ কথা’, ‘শবরী জাতীয় গল্পে। তারাশঙ্কর তথাকথিত বিশুদ্ধ প্রেমের গল্প লেখেন নি। প্রেমের গল্পে তিনি কিছুটা অড়ষ্ট’ বলে স্বীকার করেছেন। একথা তার নিজের হলেও সম্পূর্ণ মান্য করা যায় না। অপরদিকে স্নেহবাৎসল্য বিষয়ক তাঁর কিছু গল্প—পুত্রেষ্টি’ মালাকার’ ‘বাবুরামের বাবুয়া’ ইত্যাদি উল্লেখ করা যেতে পারে।

ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় জানিয়েছেন—“তারাশঙ্করের অনেকগুলি গল্পে আদিম জৈবজীবন ও পশুকল্প মানুষের যে কাহিনী আছে, তা যেমন বিস্ময়কর, তেমনি অসাধারণ। মানবসভ্যতার অনেকগুলি স্তর অতিক্রম করে তিনি সেই জৈবানুভূতিসর্বস্ব জীব-জীবনের গহনে প্রবেশ করেছেন। কয়েকটি গল্পে পশুকল্প মানুষের পাশে সত্যিকারের পশুকেও দাঁড় করানো হয়েছে, তাদের সগোত্রীয়তা দেখানোর জন্য। পশুর চেয়েও পশুকল্প মানুষ বীভৎস। তারাশঙ্কর পশুকল্প মানুষ চিত্রণে প্রবৃত্তির আদিম প্রবলতাকেই এক বিশাল ও মহিমান্বিত রূপ দিয়েছেন।” (“গল্পকার তারাশঙ্কর’, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘তারাশঙ্কর অন্বেষা')। এই সূত্রে জৈব আসক্তির অসামান্য দৃষ্টান্তরূপ স্বীকৃতি পেয়েছে ‘নারী ও নাগিনী’, ‘বেদেনী’ প্রভৃতি গল্প। আবার, প্রবৃত্তি তাড়িত জীবনের উদ্দাম রূপ ও মানুষের জৈব সত্তার আদিম’ প্রকাশের ভিন্ন ভঙ্গি লক্ষ করা যায় ‘তারিণী মাঝি’ গল্পে। অপরদিকে পশু ও মানুষের নিবিড় আসক্তির রূপায়ণ ঘটেছে ‘কালাপাহাড়’ গল্পে। মেনে নিতে আপত্তি থাকে না, গল্পটিতে জৈব আসক্তি পরিশেষে সুস্থ মানবিক মমতায় রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু পশুকল্প মানুষ ও পশুর সম্পর্ক, পশু ও মানুষের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সূত্রে গল্পের লক্ষ্য ও বক্তব্য বোধহয় এক হয়ে যায় না। ‘নারী ও নাগিনী’, ‘বেদেনী’র গল্পরস ও ‘কালাপাহাড়’-এর গল্পরস একপ্রকার নয়।

নিছক পশু চরিত্র নিয়ে তারাশঙ্করের যেসব গল্প আছে সেখানে পশুর স্নেহ-দুর্বলতা, আত্মচেতনা, মানুষের জন্য ব্যাকুলতা। অনায়াসে ধরা যায়। এ ধরনের গল্পের আবেদনও অস্বীকার করা সম্ভব নয়। যেমন, তারাশঙ্করের ‘গবিন সিংয়ের ঘোড়া’ আফজল খেলোয়াড়ী ও রমজান শের আলি’, সুকু ও ভুকু’, ‘চিনু মন্ডলের কালাদ, ডগি

এ্যালশেসিয়ান নয়' কালাপাহাড়', কামধেনু'। আমরা 'কালা-পাহাড়' আলোচনা সূত্রে যেমন এইসব গল্পের কথা বলব, তেমনি অবশ্যই প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতেই হবে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'আদরিণী' এবং শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্প দুটি। কিন্তু তারও আগে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। সাধারণভাবে কালা-পাহাড় আলোচনায় অগ্রসর না হয়ে ডঃ ভূদেব চৌধুরী 'নারী ও নাগিনী' 'তারিণী মাঝি' বা বেদেনীকে পাশাপাশি রেখে ভাবতে চেয়েছেন। একান্ত বাস্তব অভিজ্ঞতার জীবন্ত পূজি জাত বলেই 'নারী ও নাগিনী'তে বাস্তব স্বভাবের এক অস্বাভাবিক চিত্র লক্ষ করা যায়, ডঃ চৌধুরীর মতে কালাপাহাড়-এ রয়েছে ঐ একই উপাদানের বৈভবমহিম রূপায়ণ।

'নারী ও নাগিনী' গল্পে কুৎসিতদর্শন খোঁড়া শেখের নাগিনীর প্রতি অমোঘ রহস্যময় আকর্ষণে প্রকাশ পেয়েছে জীবনসত্যেরই এক অপূর্ব রূপ, যা অবাস্তব নয়। যে দুর্লভ উদয়নাগকে শেখ ধরে আনে, তার নাকে পরায় মিনি' অলঙ্কার, তাকে নিকা করে, প্রেমিকের মতন চুমা খায়, বিশ্বাস করে এরাও ভালোবাসে; সেই সর্দিনীকে হিংসা করত শেখের স্ত্রী জোবেদা। সর্পিনীটীকে সে আঘাতও করেছে। কিন্তু জোবেদারও প্রতি শেখের আসক্তি ছিল চূড়ান্ত, তাই চুমু খেয়ে তাকে বলতে পারে 'তোর জোরেই তো বেঁচে রইছি জোবেদা। তু হামার জানের চেয়ে বেশী। একদিন সাপটাকে ছেড়ে দেওয়া হল। আর সেই সাপ, জোবেদার কাছ থেকে আঘাত পাওয়া সাপ, ফিরে এসে জোবেদাকে দংশন করল। জোবেদার মৃত্যু ঘটল। শেখ উদয়নাগকে মেরে ফেলেনি। তাকে ছেড়ে দিয়ে বলেছিল—"তোর দোষ কি, মেয়ে-জাতের স্বভাবই এই। জোবেদাও তোকে দেখতে পারত না। এই যে সাপ ও জোবেদার প্রতি সমানুভূতির পরিবেশ সৃষ্টিতে অভাবনীয় সংযম ও কুশল' এ কি কেবল মামুলী স্তরের মানুষ ও পশুর সম্বন্ধে অন্বিত ? মনে হয় না। 'কালাপাহাড়' গল্প আলোচনাসূত্রে 'নারী ও নাগিনী', 'বেদেনী', 'তারিণীমাঝি'র বিশ্লেষণ অন্য মাত্রা পায়। ডঃ ভূদেব চৌধুরী বিশ্লেষণ করেছেন— 'পশুজগতের বিবর্তন পরিণামেই নাকি মানবজীবনের অভ্যুদয়। প্রথম সেই বিকাশ লগ্নে মানবপ্রকৃতি আর জৈবপ্রকৃতিতে ধাতুগত পার্থক্য খুব দূরপ্রসারী ছিল না। সেই আদিম সংযোগভূমিতেই গল্পের বর্ণিত জীবনকে আঁকড়ে ধরেছেন তারাশঙ্কর। ফলে 'বেদনী'

রাধিকার মধ্যে নাগিনীর ক্রুর সর্পিল স্বভাবই যেন মানবায়িত হয়ে উঠেছে—তারিণী মাঝি'তে কালাপাহাড়ের ক্ষিপ্ত আক্রুষ্ট জীবনপিপাসা ধরেছে এক পৌরুষ-দৃঢ় কঠিন রূপ।" (বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার')। এই বিষয়টিরই ব্যাখ্যা অত্যন্ত নিজস্ব স্টাইলে উপস্থাপিত করেছেন ডঃ গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, যার উল্লেখ এখানে অবশ্য প্রাসঙ্গিক"তারাশঙ্কর মানুষের মধ্যে যে আদিম জৈব-রহস্যের সন্ধান পেয়েছেন, তারই আর এক মূর্তি ফুটে উঠেছে জীবজগতে। বস্তুত আদিম জৈব-প্রবৃত্তি-সর্বস্ব মানুষ ও জীবজন্তুর মধ্যে স্বভাবগত যে নিগূঢ় ঐক্য-বন্ধন আছে, তারাশঙ্করের এই ধরনের গল্পে তারই লীলারহস্য ফুটে উঠেছে। তাই দেখতে পাই, নারী ও নাগিনী' (জলসাঘর) গল্পে সর্পিনীর প্রতি বিকলাঙ্গ নেশাখোর সাপুড়ে শেখের ঘৃণা লজ্জাহীন এক রহস্যময় তীব্র আসক্তি, 'কালাপাহাড়' (রসকলি) গল্পে মনিব রংলাল চাষীর প্রতি কালাপাহাড় নামে বিশালকায় মহিষের উন্মত্ত ভালবাসার মর্মান্তিক পরিণামের চিত্রকারের জীবনরহস্যের ব্যঞ্জনায় স্পন্দিত হয়ে উঠেছে।"

তারাশঙ্করের সৃষ্টির উপাদান, সমালোচকের মতে, একান্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষ জগৎ থেকে আহৃত। কালাপাহাড় গল্পটিও এরকমই এক দৃষ্টান্ত। এই গল্পে 'পশুতে মানবধর্ম আরোপ কিংবা পশুকে 'মানুষের ঘনিষ্ঠ জন' হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে। ইতিপূবে পশু ভবন নিয়ে শৈলজানন্দের লেখা 'জনি ও টনি' গল্প পড়ে তারাশঙ্কর অভিভূত হয়েছিলেন।

'কালাপাহাড়' তারাশঙ্করের 'রসকলি' গল্পের অন্তর্গত। ১৯৩৮-এ রঞ্জন পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত 'রসকলি' গল্পসংকলনে নয়টি গল্প আছে—'কালাপাহাড়', 'তাসের ঘর মতিলাল', মুশাফির খানা শ্মশানবৈরাগ্য' নুটু-মোক্তারের সওয়াল' 'অগ্রদানী প্রতিমা,' 'রসকলি'।

'কালাপাহাড়' গল্পের বস্তুবিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, গল্পের সূত্রপাতেই কালাপাহাড়ের উপস্থিতি লক্ষ করি না। বিত্তবান চাষী রংলালেরে মনে হয়েছিল "ভালো গোরু না হলে চাষ হয়? লাঙল মাটিতে ঢুকবে এক হাত করে, এক হেঁটো মাটি হবে গদগদে মোলাম ময়দার মতৈ, তবে তো ধান হবে, ফসল হবে।" আসলে চাষের প্রতি ও গোরুর প্রতি

তার অপরিসীম টান। একজোড়া গোরু গতবার কেনা হলেও তার প্রতি ও গোরুর প্রতি রংলালের টান বা মমতা নেই। "তাহার গোরু চাই সর্বাঙ্গসুন্দর কাঁচা বয়স, বাহারে রং, সুগঠিত শিং, সাপের মত লেজ এবং আরও অনেক কিছু গুণ থাকিলে গোরু তাহার পছন্দ হয়না। আরও একটা কথা— এ চাকলার মধ্যে তাহার গোরুর মত গোরু যেন আর কাহারও না থাকে। শুধু গোরুর উপর নির্ভরশীল নয় রংলাল, সে নিজেও শ্রমশীল, চাষের কাজে একনিষ্ঠ। "রংলাল বেশ বড় চাষী, তাহার জোতজমাও মোটা, জমিগুলিও প্রথম শ্রেণীর। যেমন বলশালী প্রকাণ্ড তাহার দেহ, চাষের কাজে খাটেও সে তেমনই অসুরের মত—কার্পণ্য করিয়া একবিন্দু শক্তিও সে কখন অবশিষ্ট রাখে না। বোধহয় এই কারণেই গোরুর উপরেও তাহার প্রচণ্ড শখ।" গতবার মাত্র গোরু কেনা সত্ত্বেও এবার নূতন করে আরও ভালো গোরু কেনার যৌক্তিকতা নিয়ে রংলাল ও তার পুত্র যশোদানন্দনের সঙ্গে তীব্র মতভেদ দেখা দিল। কিন্তু বহু যুক্তিতর্ক দিয়েও রংলালকে সে বোঝাতে পারল না। গত কয়েক বৎসর অজন্মা ও পুত্র যশোদার স্বলে পড়ানোর খরচ বহনের জন্য অবস্থা কিছু অসচ্ছল হয়ে পড়লেও রংলাল আপন সিদ্ধান্তে অটল। যশোদা তার চাকরি-বাকরি ও এবারের ধানের ফলনের প্রত্যাশা রেখে আপাতত রংলালকে গোরু কেনা থেকে নিরস্ত করতে চায়। যশোদার মা, রংলালের স্ত্রী, রংলালের জিদ দেখ গোপনে প্রস্তাব দিল, বর্তমান গোরু দুটো বেচে দিতে; আর নিজের কয়খানি গয়না বন্ধক রেখে টাকা সংগ্রহ করতে বলল। এভাবেই টাকাকড়ি সংগ্রহ করে পাঁচুন্দি গ্রামের গোরু মহিষের বাজারে রংলাল যাত্রা করল। গল্পের এই পর্যায় পর্যন্ত কালাপাহাড়ের উপস্থিতি টের পাই কিন্তু সমগ্র গল্পপাঠ শেষে মনে হয়, এ হলো কালাপাহাড়ের আত্মপ্রকাশের প্রস্তুতিপর্ব। পাঁচুন্দির গোরু-মহিষের বাজার থেকে গোরু কিনতে গিয়ে রংলাল কিনে আনল একজো অতিকায় মহিষ। সে তাদের নাম দিল 'কালাপাহাড়' ও 'কুম্ভকর্ণ'। এর ফলে অসন্তোষ প্রকাশ করল যশোদা, আর মহিষ দুটি দেখে আকৃষ্ট হয়ে পড়ল যশোদার মা। রংলালের সঙ্গে কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণের অকৃত্রিম সৌহার্দ্য ও গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হল। এদের খবর জোগাড় করতেও হিমসিম খেতে হয়। "রংলাল কালাপাহাড়ের পিঠে চড়িয়া কুম্ভকাকে তা দিতে দিতে তাহাদের নদীর ধারে চরাইতে লইয়া যায় সকালেই, ফেরে বেলা তিনটায়।" নদীর

ধারে সাপের, কখনো মাঝে মাঝে বাঘের উপদ্রব প্রত্যাশিত হলেও রংলাল গ্রাহ্য করে না। রংলাল যখন লক্ষ করে ওরা বহুদূর চলে গেছে, তখন মুখ থেকে অবিকল মহিষের ডাক দিয়ে ওঠে—, আঁ। কালাপাহাড় ও কুম্ভর্ণ একই ভাবে সাড়া দেয় , আঁ। মানুষ ও পশুর সম্বন্ধ ক্রমশ কত গভীর থেকে গভীরতর হতে পারে, এ হলো তার নমুনা। পশুদের সঙ্গে রংলালের এই সম্বন্ধেও রংলাল চরিত্রও বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। সে কখনও কালাপাহাড়কে ধমক দেয়, চড় মারে; এদের সাহায্যে রোলের কৃষিকর্মের সমৃদ্ধি ঘটল। "মাঠে যখন সে লাঙল চালায়, তখন প্রকাণ্ড বড় লাঙল-খানা সজোরে মাটির বুকে চাপিয়া ধরে, কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ন অবলীলাক্রমে টানিয়া চলে, প্রকাণ্ড বড় বড় মাটির চাই দুই ধারে উইয়া পড়ে। এক হাতেরও উপর গভীর তলদেশ উন্মুক্ত হইয়া যায়। প্রকাণ্ড বড় গাড়িটায় একতলা ঘরের সমান উঁচু করিয়া ধানের বোঝা চাপাইয়া দেয়লোকে সবিস্ময়ে দেখে; রংলাল হাসে।" এ হাসি পরিতৃপ্তির হাসি, শ্রমের ফসলের প্রাচুর্য দেখে হাসি, অন্যের বিস্ময়কাতরতায় হাসি।

কিন্তু বছর তিনেক পর, গ্রীষ্মের সময়, নদীর ধারে রংলাল, নিবিড় গুবনের প্রবেশপথে চিতাবাঘের দ্বারা আক্রান্ত হল। আক্রমণের মুখে সে হামাগুড়ি দিয়ে কুণ্ডুবনের মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড গাছটাকে আড়াল করে আওয়াজ করে উঠল—অ-অ-মা। চকিতে সেই আওয়াজে অভ আঁ রবে সাড়া দিতে দিতে অগ্রসর হল কুম্ভকর্ণ ও কালাপাহাড়। দুদিক থেকে কঁদ পেতেই, বিপন্ন প্রভুকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসা কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল, চিতাবাঘটি আত্মরক্ষার্থে আক্রমণ করল কুম্ভকর্ণকে, কালাপাহাড়ের শৃঙ্গঘাতে চিতাবাঘটি ছিটকে পড়ল মাটিতে, কুম্ভকর্ণের খাড়া শিঙ ঢুকে গেল বাঘের তলপেটে কিন্তু তার কামড়ে কুর্ল প্রাণ হারাল, প্রাণে বাঁচল রংলাল।

সঙ্গীর অভাবে কালাপাহাড় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলে রংলাল কিনে আনল নূতন একটি মহিষ। কিন্তু তাকে কুম্ভকর্ণের বিরহে কাতর কালাপাহাড় সহ্য করতে পারছে না, শিকল সমেত খুঁটি উপড়ে সে নূতন মহিষকে আক্রমণে জর্জরিত করছে, একটি গোরুর বাচুরকে মেরে ফেলেছে। কেউই তার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। একমাত্র রংলাল কাছে থাকলে শান্ত থাকে, অশান্ত কালাপাহাড়কে শান্ত করতে পানে না কেউ। অতঃপর সঙ্গীহীন

কালাপাহাড়ের উপদ্রব থামে না, ঘরে রাখা অসম্ভব, যশোদারও চাপ আসছে, পাইকারের কাছে অল্প টাকায় বেচে দিয়েও রেহাই পায় না রংলাল। সে ফিরে আসে। এবার নোতুন হাটে পাইকারের কাছে একশো পাঁচ টাকা দামে বিক্রী করে দিয়ে রংলাল বলে "এই দেখে ভাই, মোষটা আমার ভারি গা-ঘেঁষা। এখন এখানে যেমন বাঁধা আছে থাক, আমি চলে যাই, তারপর তোমরা নিয়ে যেও। নইলে হয়তো চেঁচাবে, দুষ্টামি করবে।" তার দুষ্টুমির ধরন পাইকার জানত না। কিছুক্ষণের মধেই রংলালকে আখ কালাপাহাড় আঁ-আঁ-আঁ রবে দড়ি ছিড়ে উন্মত্তের মত রংলালের সন্ধান করতে লাগল। টতে ছুটতে সে পথ হারিয়ে ফেলল। "একখানা মোটরকার আসিতেছে। কালাপাহাড়ের জ্ঞানলোপ পাইয়া গেল, তাহার মনশ্চক্ষে আপনার বাটিখানি দেখিতেছিল। আর রংলালকে তারস্বরে ডাকিতেছিল। সে একখানা পানের দোকান চুরমার করিয়া আবার বিপরীত দিকে ফিরিল।" লোকজন প্রাণভয়ে ছুটে পালাচ্ছে। মোটরখানাও তারই সন্ধানে এসেছে। "আবার সেই বিকট শব্দ। সেই অপিরচিত জানোয়ার। এবার সে ক্রুদ্ধ বিক্রমে তাহার সহিত লড়িবার জন্য দাঁড়াইল।" অবশেষে মোটর থেকে পুশিল সাহেবের গুলিতে কালাপাহাড় মাটিতে শুয়ে পড়ল তার বিশাল দেহ নিয়ে। "সাহেব রিভালভারটা খাপে পুরিয়া কনেষ্টবলকে নামাইয়া দিলেন, বলিলেন, 'ডোমলোগকো বোলাও।" কালাপাহাড় গল্পের এখানেই সমাপ্তি।

এই গল্প পাঠ করেই পাঠক-সমালোচক মহলে যে তাৎক্ষণিকই নয়, স্থায়ী তীব্র প্রতিক্রিয়া হয় তা এই ছোটগল্পাটর শিল্পোৎকর্ষ ও গল্পকারের জীবনরহস্যের প্রতি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিকেই প্রতিষ্ঠিত করে। তাই কারো কাছে মনে হয়, গল্পপাঠ শেষে, "প্রমাণিত হয় এই দয়াহীন সংসারে বুঝিবা প্রয়োজনই শেষ কথা, ভালোবাসাকে হার মানতে হয় প্রয়োজনের কাছে।" (কালের পুত্তলিকা ও ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়)। কিন্তু চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায়—নারী ও নাগিনী'তে খোঁড়া শেখের জৈব আসক্তিই তার নিয়তি। কিন্তু কালাপাহাড় গল্পের কেন্দ্রীয় ভূমিকা কালাপাহাড়। তাই এই গল্পে অন্যদিক থেকে বিষয়টিকে' ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। কালাপাহাড় রংলালের অনুসন্ধানে উন্মত্তের মতো ছুটে চলেছিল, রংলালকে না দেখে সে আরো ক্ষিপ্ত

হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রভুর সঙ্গে তার আর দেখা হয় নি। প্রভুর প্রতি প্রবল আসক্তিই তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিল। পশুসঙ্গী কুম্ভকর্ণ ও মানবসঙ্গী রংলালের প্রতি কালাপাহাড়ের আসক্তি সমসূত্রে আবদ্ধ। কালাপাহাড় যেমন পশুসঙ্গীর মতো মানবসঙ্গীর প্রবল আকর্ষণ অনুভব করেছে, তেমনি রংলালও পশুচেতনার সঙ্গে তার একাত্ম অনুভব করেছে।" (গল্পকার তারাশঙ্কর/সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'তারাশঙ্কর অন্বেষা')।

এই বিষয়টি অন্যভাবে ধরতে চেয়েছেন সমালোচক জগদীশ ভট্টাচার্য; কালাপাহাড়ের করুণ পরিণতি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—"একদিন প্রভুর জীবন রক্ষা করতে গিয়ে কালাপাহাড় চিতাবাঘের সম্মুখীন হয়েছিল। অজো প্রভুকে খুঁজতে এসে সে এই জানোয়ারের সম্মুখীন হয়েছিল।...কালাপাহাড়ের অপরিচিত জানোয়ারটি আসলে মোটর গাড়ি।" (ভূমিকা : তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ গল্প। জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত)।

এখানে আমরা লক্ষ করি, কালাপাহাড় পশু, নাগিনীও পশু। নাগিনী জোবেদাকে দংশন করে, কালাপাহাড় রংলালের সঙ্গে মিলিত হতে চায়, তার সঙ্গী থাকতে চায়। নাগিনীর মত যটে না, খোড়া শেখ ছেড়ে দেয়। রংলাল কালাপাহাড়কে বিক্রী করে ছেড়ে দিলেও সে আঁচে না, সভ্য সমাজ তার দাবি বোঝে না, তার ভালোবাসা জানে না, সে মানবসঙ্গী হয়েও মানুষের হাতে মারা যায়। রংলাল ও শেখের সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজতে চাওয়া প্রয়োজনীয় নয়। বিত্তবান চাষীর সুস্থ জীবনাচরণ ও জীবনভাবনা এবং সাপুড়ে খোড়া শেখের আরও হিংস্র সাপ নিয়ে কারবার ও জোবেদার সঙ্গে আচরণে এক প্রবল পৃথকতা আছে। শেখ জোবেদা ও উদয়নাগ উভয়কেই চুমু খায়, সেখানে আদিমতা, আদিম জৈব আসক্তি, হয়ত আসক্তি মিশ্রিত প্রেম। কিন্তু রংলাল চরিত্রে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য, অত্যন্ত গৃহস্থ স্বভাবের, প্রসন্ন; কিন্তু উগ্র নয়। তাই কুম্ভকর্ণের অভাবে কালাপাহাড়ের খেপে ওঠা, ক্রুদ্ধ হওয়ায় যশোদার মা'র প্রতিক্রিয়া-"আহা বাপু, কুম্ভককে বেচারা ভুলতে পারছে! কতদিনের ভাব!কথাটা বলিয়াই সে স্বামীর দিকে চাহিয়া ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল।" রংলালও রঙ্গ জানে, রসিকতা জানে—"এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিয়া সে ফিসফিস করিয়া বলিল, যেমন তোমাতে আমাতে।" এই উক্তি তাৎপর্যপূর্ণ হলেও যশোদার মার অভিব্যক্তিও ইঙ্গিতবহ—"মরণ তোমার, কথার ছিরি দেখ কেনে? ওরা

হল বন্ধু।" লেখকের ভাষায় 'রংলাল পরাজয় মানিয়াও পুলকিত মা হইয়া পারিল না'। আরও একটি ব্যাপার, জোবেদা উদয়নাগকে হিংসা করত, কিন্তু যশোদার মাকে এক্ষেত্রে বিপরীত ভূমিকায় দেখি, কুম্ভকর্ণের মৃত্যুতে কালাপাহাড়ের প্রতি তার উপলব্ধি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

রংলালের সঙ্গে কালাপাহাড় কুম্ভকর্ণের সম্পর্ক কি শেষ পর্যন্ত মানুষ ও পশুর! রংলালের কালোপাহাড় কুম্ভকর্ণকে ধমক দেওয়া, চড় মারা, উভয়ের বিবাদ মেটানো, পশুর ভাষাকে আয়ও করা, পশুর দাবিকে বুঝতে শেখা, অনুভব করায় রংলাল কালাপাহাড়ের মানবসঙ্গী হয়ে উঠতে পেরেছে। মানবসমাজে পশুর সঙ্গে কথা বলা নূতন কিছু নয়। এই উপাদান কষ্টকল্পিত নয়, জীবন থেকেই নেওয়া। একটি সূত্রে জানা যাচ্ছে—"স্থানীয় মহলে অনেকেই জানতেন মাস্তলী গ্রামের (লাভপুরের কাছে) যশোদা পালই হল ঐ রংলাল।" (তারাশঙ্কর : সময় ও সমাজ/আদিত্য মুখোপাধ্যায়)।

রংলাল ও কালাপাহাড়ের সম্বন্ধসূত্রে, পাশব এবং মানবজগতের মধ্যে এই নাড়ির সংযোগ রচনার সাফল্যের মুখ্য বনিয়াদ গড়ে উঠেছে। ডঃ ভূদেব চৌধুরী বোঝাতে চেয়েছেন "জীবজগৎকে মানবজগতের অন্তর্ভূক্তঅভিন্ন করে তোলার আশ্চর্য কৌশল এখানেই পশুর পৃথিবীকে তারাশঙ্কর মানুষের জীবনভূমির অভিমূখে একটু ঊর্ধ্বে তুলে ধরছেন—আর আমাদের পরিচিত সভ্য মানবপ্রকৃতিকে একটু নামিয়ে নিয়েছেন আদিমতার পথে।" (বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার)। কালাপাহাড়ের মৃত্যু যেভাবে ঘটেছে তা থেকে এই কথাই মনে হতে পারে।

তারশঙ্করের প্রথমপর্বের গল্পের গঠন ও শেষপর্বের গঠন একপ্রকার নয়। তার বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ গল্পে অতিকথন'-দোষ, তার অনেক গল্প স্ফীতকায় ছোট-গল্প। তার গল্প মূলত 'টেল'ধর্মী। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্য—'বাংলা সাহিত্যে তারাশঙ্করের অনেক গল্পই টেল পর্যায়ী।' (সাহিত্যে ছোটগল্প)। বালজাকের বহু গল্পই 'টেল'। ইঙ্গিতমর্মিতা ও ব্যঞ্জনার সূক্ষ্মতা 'টেল'-এ পাওয়া যাবে না কিন্তু 'গল্পরসে রসায়িত, বৈচিত্র্যে সমুজ্জ্বল হতে পারে 'টেল', যেমন, কালাপাহাড়। 'কালাপাহাড়' গল্পটি টেলধর্মী হলেও শিথিলতা বলতে যা বুঝি তা এ গল্পে পাব না। তার প্রকরণে সমালোচকেরা যে বিনষ্টিরহিত

অমিশ্র (unsophisticated) আদিমতা ও অকৃত্রিমতা খুঁজে পান 'কালাপাহাড়' গল্পে যে তার কিছুটা পাওয়া যায় তা বলা যাবে না। আবার, 'জলসাঘর' 'রায়বাড়ি' 'পিতাপুত্র' 'অগ্রদানী' প্রভৃতি গল্পে যে নাটক ও নাটকীয়তার আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছে 'কালাপাহাড়' গল্পেও চিতাবাঘের মুখোমুখি এন ও কুম্ভকর্ণ কালা পাহাড়ের তৎপরতায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। কালাপাহাড়ের দেশ্যটিও নাটকীয়। বিষয় ও চরিত্র অনুযায়ী তারাশঙ্করের গল্পকথনও কখনো নাটকীয় কখনো বর্ণনা-মূলক' তারও প্রমাণ 'কালাপাহাড়' গল্প। একটি অভিযোগ বহু প্রচলিত তারাশঙ্করের রচনায় সংযমের অভাব আছে। কিন্তু যেখানে তার সংযমস্বীকৃত সত্য সেখানে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী, এদিকে থেকেও 'কালাপাহাড়' গল্পটি একটি বড় দৃষ্টান্ত।

"শিল্পরূপ-নির্মিতিতে তারাশঙ্করের দুর্বলতা ছিল এবং সচেতন রূপস্রষ্টা তিনি ভিলেন না, এ কথা স্বীকার করে নেওয়ার অর্থ জীবনশিল্পী হিসাবে তারাশঙ্করকে আরো অনেক উচ্চাসন দান করা। কারণ, রূপনির্মিতির দুর্বলতা-সত্ত্বেও তার অনেক গল্পই যে রসোত্তীর্ণ হয়েছে একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। জীবনকে কত ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখলে এবং জীবনের রস উপভোগের কী গভীর ক্ষমতা থাকলে আঙ্গিকের এই বাধা চূর্ণ করা যায় তা অনুমান করেও বিস্মিত হতে হয়।" (শিল্পরূপঃ তারাশঙ্করের ছোটগল্প। হীরেন চট্টোপাধ্যায়ঃ 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি', তারাশঙ্কর স্মৃতি সংখ্যা, ১৩৯৯)। তার অনেক গল্পে ত্রুটিপূর্ণ আঙ্গিক বা গঠনগত দুর্বলতার পরিচয় অবশ্যই পাওয়া যাবে। গল্প বলার কৌশলে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে অসঙ্গতি, কিন্তু এই সূত্রে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্য মান্য করা যায় না। 'কালাপাহাড়'-এ আমাদের কৌতূহল মনুষ্য ও পশুজগতের মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত হইয়া রসানুভূতিতে বাধা পাইয়াছে। শেষ পর্যন্ত রংলালের গৃহবিপ্লব গৌণ হইয়া কালাপাহাড়ের শোকোন্মও তাণ্ডব প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।" (বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা)। 'রংলালের গৃহবিপ্লব' মুখ্য করে তোলা লেখকের লক্ষ্য ছিল না। মানুষ ও পশুর সম্পর্কের গভীরতা ও গভীর জীবনরহস্যের সন্ধানে ব্যাপৃত শিল্পী যখন গল্পরস পরিবেষণ করেছেন, সেখানে আমাদের কৌতুহল দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার সুযোগই পায়নি, সে-প্রশ্নও ওঠেনি। জীবন-

রসের তথা জীবনসত্যেরই নয়, আরও ব্যাপক অর্থে, সমাজ সত্যেরও আবিষ্কারে আগ্রহী হয়েছি আমরা। এইখানে এই গল্পে তারাশঙ্করের সাফল্য।

তারাশঙ্করের 'কালাপাহাড়' গল্পের আলোচনায় অনিবার্যভাবেই প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'আদরিণী' এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মহেশ' গল্প মনে পড়বে। তুলনামূলক আলোচনার লোভও সম্বরণ করা যায় না। গৃহপালিত প্রাণীকে নিয়ে লেখা এই গল্পদুটির মধ্যে যেমন তুলনা সম্ভব, তেমনি কালাপাহাড়ের সঙ্গেও। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভাতকুমারের লেখায় 'Great short story বলতে দেড়টি গল্প বুঝিয়েছেন, 'দেবী' ও আংশিক ভাবে 'আদরিণী' (গল্পবিচিত্রা)। 'আদরিণী' ও 'মহেশ' গল্পে নিছক পশুপ্রীতিই সুলভ নয়, অন্য কথা বলার চেষ্টাও আছে। 'আদরিণী' গোরু নয়, হাতি। নারায়ণবাবু ব্যাখ্যা করেছেন— 'আদরিণী' গল্পে জয়রাম মুখুজ্জের হাতি কেনা শেষে অভাবে পড়ে তাকে বিক্রীর চেষ্টা এবং আদরিণী ও জয়রামের পরিণাম একটি অপূর্ণ বিষাদ পাঠকের মনে সঞ্চার করে। কিন্তু সূচনাতেই যখন দেখা যায় হাতি কেনার অন্তরালে জয়রামের প্রবল একটি অহংবোধ বিদ্যমান, গল্পের আবেদনটি তখনই সীমা হয়ে পড়ে—এর ব্যথাবেদনা সমস্তই ব্যক্তিগত হয়ে দাঁড়ায়। (সাহিত্যে ছোটগল্প)। সত্য, কিন্তু পথিমধ্যে পীড়িত আদরিণীর মৃত্যুর সঙ্গে কালাপাহাড়ের মৃত্যু তুলনীয় হতে পারে। গুণগত দিক থেকে; আদরিণীতে, আদরিণীর মৃত্যুর ফলে বিরহকাতর মুখুজ্জের মত গল্পের সমাপ্তি, অন্যদিকে কালাপাহাড়ের মৃত্যু পথিমধ্যেই, পুলিশ সাহেবের গুলিতে। রংলাল মৃত্যু ঘটে নি, কালাপাহাড়ের মৃত্যুতে 'কালাপাহাড়' গল্পের সমাপ্তি ঘটেছে। কিন্তু পশুবির মহিষের চোখ দিয়ে জল পড়েছে দুটি গল্পেই।

'মহেশ' গল্পে জীবনরসের অভাব নেই। এই গল্প নারায়ণবাবুর মতে গফুর এবং মহেশ যৌথভাবে বাংলাদেশের দরিদ্র ক্ষেতমজুর সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ প্রতিনিধি। তাঁর আরও অভিমত 'বর্ণগর্বিত সমাজপতিরা যখন নির্দয়তা, লোভ আর হিংস্রতার এক একটি বর্বর উদাহরণ, তখন পালিত বৃদ্ধ বলদ 'মহেশ'-এর প্রতি গফুরের অপত্য স্নেহ, তার দয়া, তার চরিত্র মাধুর্য বাংলাদেশের এই দরিদ্র জনগণের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ করে তোলে। মহেশের দুঃখ গফুর ও আমিনার বেদনাবিধুর অভিব্যক্তি 'মহেশ' গল্পের ছত্রে

ছত্রে লক্ষিত। হয়েছে। বিষয়গত মহিমার অভিনবত্ব থাকলেও মূল উপলব্ধিটি ডঃ ভূবেদ চৌধুরীর ভিন্নতর— "মানবজগৎ ও পশুজগৎকে শিল্পী তার আশ্চর্য সহৃয়তার সূত্রে একত্র গেঁথেছেন যে, সেখানে গফুর, তার মেয়ে আমিনা, আর গৃহপালিত বৃদ্ধ ষাঁড় একই পরিবারের তিনটি অংশীদার হয়ে দেখা দিয়েছে। একটি গৃহপালিত পশুকে কেন্দ্র করে গার্হস্থ্য রসের এমন তীক্ষ্ম করুণ উৎসার অসাধারণ।" (বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার)। মহেশকে রক্ষা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে গিয়েই গফুর মহেশের প্রাণ নিয়েছে, অপরদিকে কালাপাহাড়ের প্রাণ নিয়েছে পুলিশ সাহেব, আদরিণী প্রাণ হারিয়েছে পীড়িত হয়ে। ডঃ চৌধুরী তার পূর্বোক্ত গ্রন্থে একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন—"পূর্বসুরীদের কল্পনায় প্রায় সর্বত্রই জীবজগতের অধিষ্ঠান মানবজগতের নিম্নভূমিতে—অধিকাংশ স্থলেই আলোচ্য পশুজীবনের রূপটি অঙ্কিত হয়েছে অসহায় অবোলা জীবের ভূমিকায়। অনেকটা এই কারণেই মহেশ-এর মর্মন্তুদ পরিণাম tragic না হয়ে হয়েঠেছ করুণ।" নারায়ণবাবুর অভিমত ভিন্নার্থে কি গুরুত্বপূর্ণ নয়—'মহেশের চাইতে হস্তিনী আদরিণী আয়তনে অনেক বিশাল হলেও শরৎচন্দ্রের গল্পের ট্রাজিক বিশালতা তার মধ্যে পাওয়া যায় না।" (সাহিত্যে ছোটগল্প)। কিন্তু কালাপাহাড় নিছক অবোলা জীব নয়—মানুষের কর্মক্ষেত্র এত স্বাধীন প্রেমিক অনুচর, তার ক্ষেত্রটিও আদরিণীর মত ছোট নয়, মহেশের মত সমাজবাস্তবতার প্রেক্ষাপটে বিপুল বিশাল নয় ঠিকই, কিন্তু বিরোধিকার সে ক্ষিপ্ত মানবশক্তি বিদ্রোহী প্রতিস্পর্ধী। তার ট্রাজিক পরিণতিতে সভ্য মানুষের জীবনভূমিকার উর্ধ্বে উঠে এসেছে পশুর পৃথিবী, পুনরুক্তি হলেও বলতে হয়, লেখক আমাদের সভ্য মানবপ্রকৃতিকে একটু নামিয়ে এনেছেন আদিমতার পথে। এককথায় বলা যায় পূর্ববতী 'আদরিণী' ও 'মহেশ' থেকে 'কালাপাহাড়ে'র বক্তব্য সুস্বার্থে ভিন্ন, উপস্থাপনায় স্বতন্ত্র; আদরিণী' যতখানি যেভাবে পারিবারিক রস সিঞ্চন করে, কালাপাহাড়ে ততখানি সেভাবে অনুপস্থিত। শরৎচন্দ্রের মহেশ' গল্পটি যে পরিমাণ সমাজবাস্তবতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে শ্রেণী-দ্বন্দ্বে স্বাতন্ত্র পায়, কালাপাহাড় তা পেতে পারে না, কিন্তু পশু ও মানুষের সম্বন্ধে, জীবজীবন ও মানব ধর্মের সমৃদ্ধ সম্পর্কের রূপায়ণে যে সামাজিক প্রেক্ষাপট জরুরি তা কালাপাহাড় পরিপূর্ণভাবে করি। দরিদ্র চাষী গফুর জোলা আর সচ্ছল চাষী রংলালের জীবনধারা ও

ধারণা, প্রেক্ষিতে উভয়ের চিন্তাশক্তির পার্থক্যও প্রচুর। একমাত্র সম্বন্ধ যদি কোথাও থেকে থাকে, ভয়েরই পশুপ্রীতিতে, স্নেহে, ভালোবাসার। শ্রেণী নির্যাতনের শিকার গফুর, কিন্তু রংলালে নির্যাতনের চিত্র নেই, প্রত্যাশা করা যায় না, কেননা পরিপ্রক্ষিত দুটি আলাদা রকম চিত্রিত হয়েছে।

৪.৫ অনুশীলনী

১। 'জলসাঘর' গল্পের বিশ্বম্ভর রায় চরিত্রটির পরিচয় দাও।

২। 'তারিণী মাঝি' গল্পটি কতটা মানব ধর্মের গল্প আলোচনা করো।

৩। 'তারিণী মাঝি' গল্পটি মনস্তাত্ত্বিক গল্প নয় আখ্যানধর্মী গল্পও - নয় মতামত দাও।

৪। তারিণী চরিত্রটি ব্যাখ্যা করো।

৫। ছোটগল্প হিসেবে 'তারিণী মাঝি'র সার্থকতা আলোচনা করো।

৬। বাসনার বিষম ত্রিভুজ কিভাবে 'নারী ও নাগিনী' গল্পের ফুটে উঠেছে আলোচনা করো।

৭। 'কালাপাহাড়' গল্পের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে গল্পটির নামকরণের সার্থকতা আলোচনা কর।

৮। 'কালাপাহাড়' গল্পে মানুষ ও পশুর সম্বন্ধে কিভাবে উঠে এসেছে আলোচনা কর।

৪.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১। তারাশঙ্করের গল্পপঞ্চাশৎ, ভূমিকা।

২। আমার সাহিত্যজীবন -তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩। পরিচয়, পুস্তক পরিচয়, পৌষ ১৩৫৪।

৪। বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ধারা, মার্কসবাদী, ১ম সংকলন, অক্টোবর ১৯৪৮।

৫। আমার কালের কথা; তারাশঙ্কর স্মৃতিকথা, প্রথম খণ্ড।

৬। বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার

৭। বাংলা গল্প-বিচিত্রা

৮। বাংলা উপন্যাসের ধারা, অচ্যুত গোস্বামী

৯। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বাংলা গল্পবিচিত্রা

১০। জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ, প্রথম খণ্ড,

১১। গল্পগুচ্ছ-এপ্রিল-জুন-১৯৯৮ সম্পাদক-অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়। তারাশঙ্করের ছোটগল্পে মানুষ

১২। শিল্পরূপ তারাশঙ্করের ছোটগল্প-প্রবন্ধ-হীরেন চট্টোপাধ্যায়

১৩। সাহিত্যে ছোটগল্প নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ

১৪। তারাশঙ্কর দেশকাল সাহিত্য ও সম্পাদনা-উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, পুস্তক বিপনি।

১৫। সাহিত্য ও সংস্কৃতি-সঞ্জীব কুমার বসু, তারাশঙ্কর সংখ্যা, বৈশাখ-আশাঢ় -১৩৭৯।

একক ৫ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত গল্প – বেদেনী, ডাইনি, পৌষ লক্ষ্মী, অগ্রদানী

বিন্যাসক্রম

৫.১ বেদেনী

৫.২ ডাইনি

৫.৩ পৌষ লক্ষ্মী

৫.৪ অগ্রদানী

৫.৫ অনুশীলনী

৫.৬ গ্রন্থপঞ্জি

৫.১ ‘বেদেনী’: মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়কালে প্রতীচ্যের সাহিত্যের সঙ্গে বাংলার যোগাযোগ নিবিড় হতে শুরু করে। উনিশ শতকে বাংলার বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিতজনেরা ইংলণ্ডের ইংরেজি সাহিত্যসুরই বেশি পরিচিত হতে থাকেন, কেননা উপনিবেশবাদী শক্তি স্বাভাবিক কারণেই নিজের ভর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে প্রচার করতে সচেষ্ট থাকেন। ইতালিয় ফরাসি কিংবা জর্মন ভাষা সাহিত্যের সংবাদ যে একেবারে পৌছয়নি তা নয়, কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকজন জিজ্ঞাসু মানুষের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ ছিল। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ইউরোপের অন্যান্য দেশের অনন্য সব সাহিত্যের ভাণ্ডার বাঙালীর কাছে উন্মোচিত হতে থাকে এবং তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে ইংরেজি সাহিত্যের চেয়ে ফরাসি জর্মন ইতালিয় সুইডিশ নরওয়ে রুশ প্রভৃতি সাহিত্য অনেক বেশি জনপ্রিয় হয়ে

উঠেছিল। সেসব দেশের সাহিত্যের বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ও জৈব প্রবত্তির বিজ্ঞাননির্ভর সাহিত্যিক-প্রয়োেগ এক নতুন বিস্ময়কর জগতের সন্ধান দিল। বাংলা ছোটগল্পে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তকে ঘিরে কাহিনীর যে একঘেয়েমি পাঠককে ক্লান্ত করে তুলেছিল, এই নতুন কথাসাহিত্য নতুন জীবনোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করতে সমর্থ হল। ছোটগল্পে দিগন্ত প্রসারিত হল।

জৈব প্রবৃত্তির এমন প্রাবল্য থাকে কিছু মানুষের জীবনে, যেন মনে হয় সেই প্রবৃত্তিই মানুষটিকে চালিত করছে যা থেকে তার মুক্তি নেই, অমোঘ শক্তির কাছে বারবার পরাভুত হচ্ছে সেই মানুষ। যদি সে বুঝতেও পারে এই কাজ তার পক্ষে অন্যায়, কিন্তু বিশেষ সময়ে সেই কাজই তাকে করতে হচ্ছে। এ এক অদ্ভুত বিষন্ন প্রতিক্রিয়া। এই প্রবৃত্তির প্রভাবে সেই অসহায়তা থেকে বেরিয়ে আসবার পথও তার জানা নেই। 'বেদেনী' এই জৈব-প্রবৃত্তির এ নগ্ন অথচ বাস্তব প্রকাশের কাহিনী।

বেদেনী রাধিকাকে গল্পকার যেভাবে চিত্রিত করেছেন তাতে তাকে মনে হয় স্বৈরিণী। কি রাধিকার স্বৈরিণী-সত্তা তার বশে নেই, সে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করে, ব্যর্থ হয়, একটি বাঁধন ছিন্ন করে নতুন বন্ধনে আবদ্ধ হয়, আবার সমস্ত বাধাবন্ধনকে অস্বীকার করতে না জীবনকে ডাক দিয়ে যায়। রাধিকার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, তার গার্হস্থ্য-জীবন' কিংবা প্রেম তার ইচ্ছার ওপরে নির্ভর করে না। সংস্কার সে মানে না, কিন্তু মেনে চলার চেষ্টা করলেও সে পারবে না। তাকে ঘিরেই এই বিচিত্র কাহিনীর আবর্তন। এসব চরিত্র অতীতকে সহজে ভুলে। যায়, বর্তমানকে মেনে চলে আবার এই বর্তমানকে ঘিরে ধীরে ধীরে অসন্তোষ জমে ওঠে, ভবিষ্যতের জন্য কোন মধুর স্বপ্নও গড়ে তোলে না। কোন অবস্থাতেই রোমান্টিক ভাবনার শিকার এরা নয়।

তারাশঙ্কর যে সার্কাসের কথা এখানে বলেছেন তা পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে গ্রামীণ মেলায় খুব পরিচিত দৃশ্য ছিল। আজ সংখ্যায় কমে গেলেও শীতকালের অসংখ্য মেলায় এমন 'ভোজবাজির' তাঁবু দেখা যাবে। উৎসুক সমীক্ষক যদি আজও সেইসব বাজিকরের সঙ্গে পরিচিত হন তবে অনুভব করতে পারবেন তারাশঙ্কর কি নিপুণ ও

নিখুঁতভাবে কাহিনির পশ্চাৎপটকে তুলে ধরেছেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও শিল্পীর দৃষ্টি ছাড়া এ অনুভূতি সম্ভব নয়।

এইসব সার্কাসের যে মালিক সেই খেলোয়াড়, বরং বলা ভাল সেই সব। একটি নারী না থাকলে লোভাতুর মানুষকে আকর্ষণ করা যায় না, তাই একজন নারীও থাকে। সে খেলোয়াড়ের বউ, বিয়ে করা বউ কিনা সে প্রশ্ন অবান্তর। আমাদের পারিবারিক জীবনে অনেক বাধা, তাই সার্কসের এসব মেয়ের পুষ্ট দেহকে আঁটোসাঁটো পোশাকে দেখতে ভিড় জমে, অন্য প্রবৃত্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে। এসব মেয়ের রূপ আকর্ষণীয় নয়, কিন্তু উন্মুক্ত স্থানে এই পোশাকে আলোয় সামনে মানুষকে উত্তেজিত করতে যথেষ্ট। তাই খেলার গুণে যেমন দর্শক আসে, তেমনি অন্য আকর্ষণও আছে। তারাশঙ্করের এই ইঙ্গিত বাস্তবতার সঠিক বিশ্লেষণ।

রাধিকার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে গল্পের নিবিড় পাঠের সন্ধান মিলবে। আমরা দেখতে পাব, রাধিকা শুধু স্বৈরিণী নয়, দৈহিক ক্ষুধাই শুধু তাকে তাড়না করে না, তার মধ্যেও নারীত্ব রয়েছে, রয়েছে অপমানবাোধ, রয়েছে অকৃতজ্ঞ অভিধায় বর্ণিত হওয়ার কষ্ট ও মানসিক যন্ত্রণা। রাধিকার যখন বয়স বাইশ, এ কাহিনী সেই বয়সের। কেন বয়সের কথা এল? বেদেনী অভিজ্ঞতায় তার স্বামী খেলোয়াড় শম্ভুকে বলেছিল, বুড়োর নাচন দেখতে কার কবে ভাল লাগে রে! বড় সত্য উচ্চারণ।

পাশের তাঁবুর খেলোয়াড় যুবক। তাই শম্ভুর ব্যঙ্গ উচ্চারণ, ছোকরার উপর বড় যে টান দেখি তুর!

রাধিকা সর্পিনীর মত গর্জন করে উঠল, কী বললি বেইমান ?

বেদেনী অনেক দুঃখে অনেক বেদনায় প্রিয়তম ব্যক্তিটিকে ‘বেইমান’ বলেছে। চল্লিশ বছরে তো মানুষ বুড়ো হয়ে যায়,-এই বয়স শম্ভুর। আর বেদেনীর বাইশ বছরের আগুন-যৌবনের তুলনায় চল্লিশ বছরের শম্ভু সত্যি তো বুড়ো। চোদ্দ বছর বয়সে একজন বেদের সঙ্গে রাধিকার বিধিসম্মত বিয়ে হয়। বরের বয়েস তেরো বছর। শান্ত ছেলে শিবপদ, কোমল মুখশ্রী, বড় বড় চোখ, সে বাঁশি বাজাত। গভীর প্রেম ছিল

তাদের মধ্যে। কিন্তু রাধিকার প্রবৃত্তি তাকে এক জায়গায় থাকতে দেবে কেন? এই প্রবৃত্তির এমন এক অমোঘ পরিণতি যা থেকে মানুষের মুক্তি পাওয়া একেবারে অসম্ভব না হলেও বড় কঠিন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরপর ইংরেজি সাহিত্য ছাড়াও ইউরোপের অন্যান্য দেশের প্রথাভাঙা সাহিত্যের সম্ভার বাংলার কথাসাহিত্যকে উদ্দীপিত করতে থাকে। মানুষের অন্তর্লীন মনস্তত্ত্ব বড় জটিল, তা কারও আদর্শবাদ, ভালো-লাগা মন্দলাগা কিংবা সামাজিক মূল্যবোধের ওপর নির্ভর করে না। এতদিনকার বিশ্বাসকে ওলট-পালট করে দেয়। কল্লোল যুগে সেই মনস্তাত্ত্বিক আলোড়নের সংবাদ আমরা জানি। এই সময়েই ফরাসি কথাসাহিত্যিক গুস্তাভ ফ্লবের (১৮২১ ৮০), গী দ্য মোপাসাঁ (১৮৫০-৯৩), আলফোঁস দদে (১৮৪০-৯৭), এমিল জোলা (১৮৪০ ১৯০২), রুশ ঔপন্যাসিক ইভান সেরসেয়েভিচ তুর্গেনেভ (১৮১৮-৪৩) এবং সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের (১৮৫৬-১৯৩৯) মনস্তত্ত্ব ও যৌন বিষয়ক কথাসাহিত্য গবেষণা বাংলার সচেতন কথাসাহিত্যিকদের প্রভাবিত করতে থাকে। চিরাচরিত প্রেমের কাহিনী ও মানবিক সম্পর্ক বিষয়ে নতুন ভাবনার জন্ম হতে থাকে যার মধ্যে সত্যিকার সমাজ-বাস্তবতার সন্ধান মেলে।

রাধিকার প্রবৃত্তিকে এভাবে বিশ্লেষণ করবার সুযোগ ঘটত না, যদি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের, পরবর্তীকালে মনস্তত্ত্বের এই প্রভাবকে বাংলার কথাসাহিত্যিকরা উপেক্ষা করতেন। দুরন্ত যৌবনবতী রাধিকা চল্লিশ বছরের প্রৌঢ়কে জীবনসঙ্গী করে নিল। নিশ্চিত জীবন ছেড়ে যাযাবরের জীবন। এ কি বিকৃতি? যৌনবিকৃতি ও মানসিক বৈকল্য? না, আদৌ বিকৃতি নয়। এ যে কিসের আকর্ষণ তা বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। রাধিকা ঘর ছেড়ে শম্ভর সঙ্গে ভেসে চলল—এই ঘটনাই সত্য, এর পেছনের কারণ অনুসন্ধান বৃথা। তারাশঙ্করও সে চেষ্টা করেন নি। তিনি জীবন বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন। পূর্ব স্বামী শিবপদরও ছিল মায়াবীর দৃষ্টি', উপার্জন ছিল গ্রামের সকলের চেয়ে বেশি, সে নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখেছিল, গ্রামে সকলে তাকে সম্মান করত, প্রবীণেরা তার পরামর্শ গ্রহণ করত, গ্রামীণ বধূর কাছে এর চেয়ে বড় চাওয়া আর কি হতে পারে? আরও বড় কথা গ্রামীণ কুপ্রথা অনুসারে শিবপদ তার পৌরুষ ও প্রাধান্য

স্ত্রীর ওপরে প্রয়োগ করেনি। উপরন্তু সেই শিবপদ ছিল রাধিকার। ক্রীতদাসের মতো। টাকাকড়ি সব থাকিত রাধিকার কাছে। তাহলে? কোন দুঃখে কোন অসন্তোষে রাধিকাকে ঘর ছাড়তে হল? ভবিষ্যতের ছাড়া আর কোন ব্যাখ্যা সুপ্রযুক্ত হতে পারে? এই প্রশ্নাতীত প্রবৃত্তিতে প্রকাশ শুধু একবারই নয়, দ্বিতীয়বারের ঘটনায় তা আরও নগ্ন, আরও বীভৎস। দ্বিতীয় স্বামী শম্ভুকে রাধিকা ভালোবেসেছিল। তার অপমান ও করুণ দীনতায় সে কষ্ট পেয়েছে, নিজেকে অপমানিত বোধ করেছে। নতুন বাজিকরের প্রতি তার ঘৃণা রয়েছে, শম্ভুকে অপমান করবার মুহূর্তে রাধিকা নতুন বাজিকর কিষ্টোকে ইটছুঁড়ে মারতে গিয়েছিল, এর পরেই শম্ভ সাদরে তাহার হাত ধরিয়া তাবুর মধ্যে লইয়া গেল। রাধিকা বিপুল আবেগে

'শম্ভুর গলা জড়াইয়া ফোপাইয়া ফোঁপাইয়া কাদিতে আরম্ভ করিল।' এই অনন্য প্রেমানুরাগে পরবর্তী পরিণতি কি? পরিণতি রাধিকার আয়ত্তে নেই। তবে কি দৈহিক ক্ষুধা? কিষ্টোর প্রতি আকর্ষণে রাধিকা সহসা যা করেছে তা নির্ভেজাল কামনা, দেহের কামনা। কিন্তু কোনোভাবেই বিকৃতি নয়। রাধিকা প্রতিশোধ নিতে কিষ্টোর তাবুতে আগুনে দিতে গিয়েছিল। কিন্তু কিষ্টোর চওড বুক, হাতের নিটোল পেশী রাধিকার সমস্ত দেহে-মনে উন্মাদনার সঞ্চার করল,রাধিকা সেন উন্মত্ত বেদেনী, উন্মত্ত আবেগে কিষ্টোর সবল বুকের ওপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ল আর কিষ্টহীন নারীতনুখানি সবল আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া' চুম্বনে চুম্বনে রাধিকীকে অস্থির তরে তুলল। শিবপদন কাছ থেকে চলে আসবার 'নিষ্ঠুর' পরিণতি এভাবেই ঘটতে পারে। এক অসাধারণ শিল্পসুষমামন্ডিত অথচ বড় করুণ ও বাস্তব এই বিবরণ। অনন্য অদৃষ্টি ছাড়া কোনো কথাসাহিত্যিকের পক্ষে এমন বিশ্লেষণ সম্ভব নয়।

'বেদেনী' গল্পে 'প্রতিশোধ' যেন একটি চরিত্র। প্রতিশোধ নিয়েছে মূলত একজন নারী। অথচ কেন যে বারবার প্রতিশোধ নিচ্ছে তার কোনো আপাত কারণ নেই। তার জৈব প্রবৃত্তি মনস্তাত্ত্বিক জটিলতায় এই প্রতিশোধ নিয়েছে সবচেয়ে লক্ষণীয়, এই গল্পে কোনো পুরুষ চরিত্র প্রতিশোধ নিতে পারেনি, প্রতিশোধ নেবার সামান্য চেষ্টা করেছে শম্ভু। প্রতিশোধ নেবার এমন নিপুণ ভূমিকা বাংলার অন্য কোনো ছোটগল্প সচরাচর

দেখা যায় না। 'বেদেনী'র প্রতিশোধ একেবারে অন্য প্রকৃতির। রাধিকার প্রথম স্বামী শিবপদর প্রতি কেন বেদেনী প্রতিশোধ নিল তার ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, তারাশঙ্করও যে চেষ্টা করেননি। শিবপদ তো কোনো অন্যায়, কোনো দৈহিক নির্যাতন করেনি। সে কুরূপও নয়। তবু উগ্র পিঙ্গলবর্ণ, উদ্ধত-দৃষ্টি, কঠোর বলিষ্ঠদেহ প্রৌঢ় শুকে দেখে রাধিকা মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। আর তাই সে প্রতিশোধ নিল নিরীহ শিবপদকে ত্যাগ করে। শুধুই কি ত্যাগ করে প্রতিশোধ? শিবপদর সমস্ত সঞ্চিত অর্থ নিয়ে সে শম্ভুর তাঁবুতে এসে উঠল। না, গোপনে নয়, স্পর্ধাভরে সকলের চোখের সামনে। এ কোন্ মোহগ্রস্ততা যা প্রতিশোধে পাশবিক করে তোলে? তবু এটা বাস্তব, মানুষের সমাজেই এটা ঘটে থাকে।শম্ভুর বলিষ্ঠ দেহ দেখে রাধিকা মুগ্ধ, এখানে জৈবিক তাড়না ও দেহগত কামনা নিশ্চয়ই সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু শুধুই কি তাই? প্রবৃত্তির দাসত্ব করতে হয়েছে বলেই গোপনে নয় প্রকাশ্যে সে স্বৈরিণী অপবাদ নিতেও রাজি হয়েছে। প্রতিশোধ নেবার অদমনীয় প্রবৃত্তি বেদেনীকে চালিত করেছে। চোখের জলে শিবপদর বুক ভেসে গিয়েছিল, সবাই তাকে ছি-ছি করেছিল। কিন্তু শিবপদর প্রতি রাধিকার 'মমতা হওয়া দূরে যাক্, লজ্জা হওয়া দূরে থাক, ঘৃণায় বীতরাগে তাহার অন্তর রি-রি করিয়া উঠিয়াছিল।'

কেন ঘৃণা, কেন বীতরাগ, কেন অন্তর রি-রি হওয়া—এসবের কোনো উত্তর নেই। শিবপদর তরফ থেকে এমন কোনো চারিত্রিক দুর্বলতা প্রকাশ পায়নি যাতে স্ত্রীর কাছ থেকে এমন ব্যবহার প্রত্যাশিত ছিল। এই প্রতিশোধ নেওয়ার কোনো কারণ নেই, নেই কোনো ব্যাখ্যা।বড় জটিল এই মানবচরিত্র। আবার কেউ যদি একে অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেন, তিনিও কবলে বিবেচিত হবেন না। মনস্তত্ত্বের সব বিশ্লেষণই কি উদঘাটিত হয়েছে? কথাসাহিত্যিকরা নেক কিছু প্রকাশ করেন যা তাদের অভিজ্ঞতায় ধরা পড়েছে, কিন্তু বিজ্ঞাননির্ভর ব্যাখ্যার। কহদিস আজও মেলেনি।

রাধিকার দ্বিতীয় প্রতিশোধ খুব সূক্ষ্মভাবে হয়েছে। সূক্ষ্মভাবে বলছি এই কারণে যে, শাধের আধার পরিবর্তিত হয়ে গেল আকস্মিক জৈব তাড়নায় কিংবা যৌনক্ষুধায়। অবশ্য ক্ষণিক যৌনক্ষুধা আরও বীভৎস প্রতিশোধে রূপ নিল। নতুন বাজিকর কিষ্টোর

তাবুতে 'দোসরা দফার' খেলা আরম্ভ হবে। মদ খেয়ে রাধিকা হিংস্র হয়ে উঠেছিল। নতুন তাবুতে বাজনার শব্দে রাধিকার সমস্ত অত্তর হিংস্র হয়ে উঠল। তার চারীর চেয়ে নতুন বাজিকরের তাঁবু দর্শকদের কাছে বেশি আকর্ষণের? নিশীথরাতে ওদের তাবুতে আগুন ধারয়ে দিলে কেমন হয়? এই চিন্তা কিভাবে রাধিকার জীবনে নতুনভাবে পুরনো অবত্তির জন্ম নিল ও প্রতিশোধের চরম চিহ্ন রেখে গেল তা আমরা গল্পের শেষে দেখতে পাব। তারাশঙ্করের এক অভিনব মুন্সিয়ানা। একই মানসিকতা, কিন্তু প্রতিশোধের পাত্র পরিবর্তিত হয়ে গেল।

শম্ভু ও কিষ্টো মুখোমুখি। শম্ভু অভিযোগ করছে, কিষ্টো তাকে অপমান করতে এসেছে। রাধিকা স্বামীর অপমানে হিংস্র বাঘিনীর মত কিষ্টোকে ইট দিয়ে আঘাত করতে উদ্যত হয়েছে। ইট লুফে নিয়ে সে আঘাত কিষ্টো প্রতিহত করেছে, রাধিকার প্রতিশোধ তাৎক্ষণিক বাধা পেয়েছে, কিন্তু অন্য বিশাল প্রতিশোধের পথকে প্রশস্ত করেছে।

রাধিকা কি শুধুই প্রতিশোধ পরায়ণা নারী? তারাশঙ্কর যদি সেভাবেই বেদেনীকে আঁকতেন তবে তা যান্ত্রিক হয়ে যেত। মানুষকে কি শুধুই এক ছাঁচে ফেলা যায়? সে যে জটিল, বড় রহস্যময়। নইলে চরিত্র বাস্তব ভূমির ওপরে দাঁড়াবে কেমন করে?

যে রাধিকা কিষ্টোকে ইট ছুঁড়ে আঘাত করতে গিয়েছিল, তার মনের আগুন প্রকাশ পেয়েছে প্রতিশোধের আকাঙ্খায়। কিষ্টো অপরূপ কসরৎ দেখাচ্ছে তার তাঁবুতে। রাধিকা নিজেদের খেলার দৈন্যের কথা ভেবে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল, সঙ্গে সঙ্গে আক্রোশে ও প্রতিশোধ নেবার মানসিকতায় দগ্ধ হচ্ছিল। কিষ্টোর তাবুতে আগুন ধরাবার স্বপ্ন দেখছে।

অথচ যে মুহূর্তে শম্ভুর ষড়যন্ত্রে পুলিশ কিষ্টোর তাবুতে মদের সন্ধান করতে এসেছে, সেই মুহূর্তে নারীত্বের করুণাময়ী রূপের প্রকাশ পেয়েছে রাধিকার মধ্যে। সে নিষিদ্ধ বোতলগুলিকে আঁচলের আড়ালে নিয়ে তাঁবুর বাইরে এসে কিষ্টোকে বাঁচিয়েছিল। এই উদারতার পেছনে কিষ্টোর প্রতি তার কোনো দৈহিক কামনার কিংবা যৌনক্ষুধা মেটানোর প্রবণতা কাজ করেনি। নিছক মানবিকতার খাতিরেই সে এ কাজ করেছে। এই একটি উজ্জ্বল দিক যদি তারাশঙ্কর বেদেনীর চরিত্রে না দেখাতেন তাহলে রাধিকা

যেমন নারী 'ইয়াগো' হয়ে যেত, তেমনি চরিত্রটির বাস্তবসম্ভবা রূপটিও ধরা পড়ত না। এখানেই শিল্পী হিসেবে সার্থক তারাশঙ্কর। কিন্তু এই মানবিক উদারতার পরিণতিতেই বোধহয় রাধিকার প্রতিশোধ-স্পৃহা আরও কঠোর জটিল হয়ে ওঠে। শম্ভ ষড়যন্ত্র করে পুলিশে খবর দিয়েছিল। উদারতার বশে স্ত্রী রাধিকা সমস্ত নির্যাতন সহ্য করে। এই সূক্ষ্ম অভিঘাতটি কি পরবর্তী বৃহত্তর প্রতিশোধের উৎসভূমি? খতিয়ে দেখা যাক।

প্রহার ও নির্যাতন সহ্য করেও কিন্তু রাধিকা শম্ভুর প্রতি কোনো প্রতিশোধ নিতে চায়নি। যদি নির্যাতনের পরিণতি হিসেবে শুধুই প্রতিশোধ নেওয়ার কথা বিবৃত হত গল্পে, তবে তার শিল্পমুষমা অবশ্যই ব্যাহত হত। কিন্তু কাহিনী সেভাবে গতানুগতিক পথে এগোয়নি।

মহাভারতে রয়েছে, মনের গতি বায়ুর চেয়ে দ্রুতগতিতে এগোয়। যে রাধিকা কিষ্টোর তার পুড়িয়ে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল, কিষ্টোর দেহের পৌরুষ দেখে মুহূর্তে তার মনের গতি পরিবর্তিত হয়ে গেল। প্রতিশোধের পাত্র বদলে গেল। এটা আকস্মিক সিদ্ধান্ত হতে পারে, কিন্তু কোনোভাবেই অবাস্তব নয়। মনস্তত্ত্বের গবেষণা আমাদের বিচিত্র তথ্য ও তত্ত্বের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। নির্মম তত্ত্ব অথচ বড় করুণ বাস্তব। বেদেনী রাধিকা বিনিদ্র রজনীতে প্রতিশোধ-স্পৃহায় দগ্ধ হচ্ছে। স্বামী শম্ভুর দীনতায় সে আরও প্রতিশোধ পরায়ণা হয়ে উঠেছে। নিযুত রাতে প্রতিশোধের উগ্র বাসনায় রাধিকা বুকের মধ্যে অস্থিরতায়, মনের একটা দুর্দান্ত জ্বালায় অহরহ পীড়িত হচ্ছে। অপমান ভুললে চলবে না। তেলের টিন হাতে নিয়ে, দেশলাইটা চুলের খোঁপায় গুঁজে রাধিকা বের হল তাদের তাঁবু থেকে। অন্যধারে শম্ভু অপমান ভুলে শীতের রাতে কুকুরের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে অঘোরে ঘুমাইতেছে। রাধিকা একাই প্রতিশোধ নিতে বের হল। কিন্তু, প্রতিশোধের আধার বদলে গেল। বায়ুর চেয়েও দ্রুতগতি মনের হদিস্ কে দিতে পারে। শম্ভুকে প্রথম দেখার যে আলোড়ন, আজকে রাতে ঘুমন্ত কিষ্টোকে দেখার আলোড়ন তার চেয়েও প্রবল। উন্মত্তা বেদেনী কিষ্টোর বুকে ঝাপিয়ে পড়ল যেন দেহের কামনা মেটানোই তার আশু দাবি। কিষ্টো যখন ক্ষীণ নারীতনুখানি কামনার বশে উত্তেজিত

করতে চাইল চুম্বনের আবেশে, সেই মুহূর্তে রাধিকার প্রতিশোধের আকাঙ্খ দৈহিক কামনাকে পরাভূত করল।

রাধিকা দেশান্তরে যাবার পরামর্শ দিল। তাঁবু পশুসম্পদ সব পড়ে থাক, কিষ্টো শুধু রাধিকাকে নিয়ে পালিয়ে যাবে। এখানে নির্লজ্জভাবে আর একজনকে গ্রহণ নয় যেমন ঘটেছিল শিবপদকে ছেড়ে আসার সময়। এবার গোপনে অন্ধকারে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে যাত্রা। বেদেনী বলেছে, 'তাঁবু-টাবু থাক, ওসব শম্ভ নেবে, তুমি উহার রাধিকা লিবা, উয়াকে দাম দিবা না?' দুরন্ত যৌবনা রাধিকার আকর্ষণ কিষ্টো উপেক্ষা করতে পারেনি। কিষ্টো দ্বিধা না করে এগিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু গল্পে প্রতিশোধ যেখানে একটি অতি উজ্জ্বল চরিত্র, সেখানে এমন সরল পরিণতি তো সম্ভব নয়, বাস্তবসম্মতও নয়।

রাধিকা কিষ্টোর সঙ্গে দূরে কোথাও পালিয়ে গিয়ে নতুন করে ঘর বাঁধতে পারত। অনিশ্চয়তা ছিল, কেননা শিবপদর সম্পদ সে নিয়ে এসেছিল, শম্ভুরও কিছু স্থায়ী সম্পত্তি ছিল, কিন্তু এবার সব ছেড়ে শুধু কিষ্টোকে নিয়েই নিরুদ্দেশ যাত্রা। প্রবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উন্মুক্ত জীবনস্রোতের প্রতি আকর্ষণ। কিন্তু এ যদি ঘটত তবে তো 'প্রতিশোধ' নামক বৈশিষ্ট্যটি গল্পকে এমনভাবে বিচিত্র করে তুলতো না। তেলের টিনটা শম্ভুর তাঁবুর ওপর ঢেলে দিয়ে মাঠের ঘাসের ওপর ছড়া দিয়ে দেশলাই জ্বেলে কেরোসিনযুক্ত ঘাসে ঘাসে আগুন ধরিয়ে দিল। বলল, 'মুরুক বুড়া পুড়্যা।' কিন্তু ও কি বেদনা আছে? নেই। কেননা, একথা সে বলেছিল খিলখিল করে হেসে। পুলিশের হাত থেকে কিষ্টোকে বাঁচিয়েছিল বলে শম্ভ রাধিকাকে প্রহার করে যে নির্যাতন আর এ কি সেই অন্যায় কাজের প্রতিশোধ। তা তো নয়। রাধিকার প্রথম সিদ্ধান্ত ছিল কিষ্টোর তাবুতে আগুন দেওয়া। কিষ্টোর তাঁবুতে আগুন ধরাতে হবে ওই পেছন দিকে দিয়ে। ওদিকটা সমস্ত পুড়িয়া তবে এদিকে মেলাটার লোকে আলোর শিখা দেখিতে পাইবে। ক্রুর সে সাপিনীর মতোই সে অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়া করিয়া চলিয়াছিল। পিছনে আসিয়া চিনা নামাইয়া হাঁপাইতে আরম্ভ করিল।

শুধ প্রতিশোধের পাত্র পালটে গেল, দৈহিক কামনাও জয়ী হল না, দৈহিক মিলনের মুহুতেই পালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিল রাধিকা। তাহলে এই প্রতিশোধের কি ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে। অটিল মানুষের জাটিলতর মনের বিশ্লেষণ প্রায় অসম্ভব। তারাশঙ্করও সে চেষ্টা করেনান, আর আরোপিত সিদ্ধান্ত করেননি বলেই তিনি এত বড় শিল্পী।

আর একটি প্রতিশোধ রয়েছে এই গল্পে, তা পুরুষ শম্ভুর। কিন্তু রাধিকার প্রতিশোধের তুলনায় তা অতি নগণ্য। নারী প্রতিশোধ পরায়ণা হলে তা ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে,মনস্তত্ত্বের এই দিকটিই কি তারাশঙ্কর উদ্ঘাটিত করতে চেয়েছেন।

শম্ভু প্রতিশোধ নিয়ে চেয়েছে কিষ্টোর প্রতি। কিষ্টো নবীন যুবক, কিন্তু সে বিষয়ে প্রৌঢ় শম্ভুর তেমন ঈর্ষা ছিল না। কেননা, তার যুবতী স্ত্রী যে কিষ্টোর প্রতি আদৌ আকৃষ্ট নয়, সে পরিচয় শম্ভু পেয়েছে। প্রথম দফায় খেলা শেষ হয়েছে, তাঁবুর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে কিষ্টো, তার সামনে শম্ভু। শম্ভু তাকে বলছে, 'অপমান করতে আসছিস তু!' এই মুহূর্তে উত্তেজিত রাধিকা একটা ইট কুড়িয়ে কিষ্টোকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল। শম্ভু বুঝতে পেরেছে, নবীন কিষ্টোর প্রতি তার বউ-এর কোন দুর্বলতা নেই। তবু প্রতিশোধ কেন কিষ্টোর প্রতি?

এখানেই রয়েছে বড় নির্মম সত্যের বিকট প্রকাশ। ক্ষুধার অন্নে যদি কেউ ভাগ বসাতে চায় সেখানে কোন নীতি-মূল্যবোধ আর সজাগ থাকে না। দেহগত কামনা, যৌন ক্ষুধা সব ম্লান হয়ে যায় পেটে যদি টান ধরে। শম্ভর প্রতিশোধ-স্পৃহা সে কারণেই। বড় সূক্ষ্মভাবে তারাশঙ্কর এই মর্মান্তিক সত্যকে প্রকাশ করেছেন।

ফরাসি কথাসাহিত্যিক আলভেস দ্যদে 'দুই সরাইখানা' নামে একটি অনন্য ছোটগল্প লিখেছিলেন। স্বামী-স্ত্রী একটি সরাইখানা পরিচালনা করত। অন্য কোন সরাইখানা না থাকাতে তাদের ব্যবসা ভালই চলত। এমনি করে দিন যায়। পাশে আর একটি সরাইখানা হল। অনেক আলো, অনেক বেশি চাকচিক্য, সেখানেই ভিড় জমে বেশি। পুরনো সরাইখানায় আর তেমন কেউ আসে না। একদিন পুরনো সরাইখানার স্বামী ও নিঃসঙ্গতা কাটাতে নতুন সরাইখানায় গেল। কোন প্রভাব নয়। নির্মম সত্য এভাবেই প্রতিভাবান সাহিত্যিকের অভিজ্ঞতায় ধরা দেয়। প্রথম স্বামী শিবপদর কাছ থেকে

রাধিকা যে অর্থ এনেছিল, আজ তা নিঃশেষিত। বড় দুঃখে দিন চলে আজকাল। শম্ভু যা রোজগার করে তার সবই উড়ে যায় নেশায়। কিষ্টোর ভাবতে দফায় দফায় খেলা চলছে, শম্ভুর পুরননা তাঁবু দর্শকশূন্য। নতুন বাজিকরের তবু অনেক বড় এবং 'ক্যায়দাকরণেও অনেক অভিনবত্ব আছে। বাহিরে দুইটা ঘোড়া, একটা গোরুর গাড়ির উপর একটা খাচা রহিয়াছে, নিশ্চয় উহাতে বাঘ আছে।' স্বাভাবিত কারণেই দর্শক ছুটবে নত তাঁবুর দিকে আর শম্ভকে আরও শোচনীয় দিনের মুখোমুখি হতে হবে। জীবিকার এই অসম লড়াইয়ের সামনে দাঁড়িয়ে শম্ভু প্রতিশোধ-পরায়ণ হয়ে উঠেছে। এই ধরনের জীবিকার মানুষদের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। জীবিকার প্রশ্নে মরণপণ লড়াই। যারা নিস্তরঙ্গ জীবনযাপন করে তারা এই লড়াই-এর তীব্রতার সামান্যতম কোন খোঁজ রাখে না। গ্রামীণ মেলায় এই জীবিকার লড়াই বড় সাংঘাতিক।

কিষ্টো প্রত্যক্ষভাবে কোন প্রতিশোধ নেয়নি। কিন্তু পরোক্ষভাবে সে-ও কী প্রতিশোধ স্পৃহায় ইন্ধন জোগায়নি? সে জোয়ান পুরুষ, শরীরের প্রতি অবয়বটি সরল ও দৃঢ়, তেজী ঘোড়ার মত মনোরম লাবণ্য। প্রৌঢ় শম্ভুর যুবতী স্ত্রী রাধিকা। রাধিকা একদিন শম্ভর আকর্ষণে পূর্ব স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে এসেছিল। আজ যদি রাধিকা চলে যায় কিষ্টোর তাবুতে? মনের মধ্যে এই সন্দেহ তোলপাড় না করলে সহসা শম্ভ কেন বলবে যে, 'ছোকরার উপর বড় যে টান দেখি তুর।'

হয়তো প্রত্যক্ষভাবে কিষ্টো প্রতিশোধ নেয়নি। কিন্তু তার যৌবন, তার খেলার কসরৎ ও উপার্জন অন্যের মধ্যে প্রতিশোধের স্পৃহা জাগিয়ে তুলেছে। এবং মুহূর্তে রাধিকা যখন শম্ভর তাঁবু পুড়িয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করল তখন কিন্তু কিষ্টো নতুন প্রেমিকাকে কোন বাধাই দেয়নি। তার মনের গভীরেও কি প্রতিশোধের বীজ লুকিয়ে ছিল? তারাশঙ্কর কোন উত্তর দেননি। দিতে চাননি বলেই গল্পটি এত অনন্য হয়ে উঠেছে। প্রতিশোধ নেয়নি শুধু শিবপদ। রাধিকার ক্রীতদাসের মতো শিবপদ তার উপর্জিত টাকা বউকে দিত, রাধিকার পছন্দমত তাঁতে বোনা কালো রঙের জমির ওপর সাদা সুতোর ঘন ঘন ঘরকাটা শাড়ি বারো মাস শিবপদ তাকে দিত,—এমন বউ তাকে ছেড়ে চলে গেল।

চোখের জলে শিবপদের বুক ভাসিয়া গিয়াছিল— কিন্তু সে-ই কোন প্রতিশোধ নেয়নি। ব্যতিক্রম না থাকলে আর মানবচরিত্র বিশ্লেষণ কেন?

'বেদেনী' ছোটগল্পে প্রধান চারটি চরিত্র রয়েছে। বেদেনী রাধিকা, রাধিকার প্রথম স্বামী শিবপদ, প্রৌঢ় বাজিকর শম্ভু ও নবীন বাজিকর শম্ভ ও নবীন বাজিকর কিষ্টো। শিবপদ ছাড়া এই তিন চরিত্রের মধ্যে আশ্চর্য একটি মিল রয়েছে। যে সামাজিক পরিবেশে এদের জন্ম ও বেড়ে-ওঠা তাতে এই সাদৃশ্য দেখা দিয়েছে। তিনি পূর্ব-পরিকল্পনা থেকে এই সাদৃশ্য দেখাননি। বাস্তব অভিজ্ঞতা তারাশঙ্করের ছিল বলেই এই সাদৃশ্য দেখা দিয়েছে। তিনি পূর্ব-পরিকল্পনা থেকে এই সাদৃশ্য দেখাননি। বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই স্বাভাবিকভাবেই এমন সহজ স্বাভাবিকতার উন্মেষ ঘটেছে। রাধিকার বিয়ে হয়েছিল শিবপদর সঙ্গে, চোদ্দ বছর বয়েসে। শিবপদর বয়স তখন সতেরো বছর। সুখের বিয়ে। বউকে খুশি রাখতে শিবপদ সবকিছু করেছে। সুশ্রী স্বামী, প্রেমিক স্বামী, সংসারে অভাব নেই, দুজনেই রোজগার করত। কিন্তু সব ভেঙে গেল। শম্ভুর একটি উক্তিতে রাধিকার মনে উজান বয়ে গেল,—"হি বাঘিনী পোষ মানাতেই আমি ওস্তাদ আছি।" রাধিকা দ্বিতীয় পুরুষের সঙ্গিনী হল। এই মানসিকতার মধ্যে দৈহিক কামনার জোয়ার রয়েছে।

শিবপদর চেয়ে "জোয়ান পুরুষ, ছয় ফিটের অধিক লম্বা, শরীরের প্রতি অবয়বটি সরল এবং দৃঢ়" শম্ভুই জয়ী হল। রাধিকা ঘর ছাড়ল। আবার কিষ্টোর প্রতি প্রথমদিকে কোন দুর্বলতা লেও প্রতিশোধের স্পৃহায় রাধিকা তৃতীয় পুরুষের ঘরণী হল। শম্ভর সঙ্গে ছিল এক বিগতযৌবনা বেদেনী। শম্ভর বউ, কিন্তু প্রথম বউ কিনা তার - নেই, প্রয়োজনও নেই। শম্ভুও দ্বিতীয় নারীকে গ্রহণ করল, সে রাধিকা। কার সঙ্গে ছিল এক বেদের মেয়ে। হৃষ্টপুষ্ট শান্তশিষ্ট চেহারার মেয়েটিকে ত্যাগ করে রাতের অন্ধকারে দ্বিতীয় নারীকে নিয়ে পালিয়ে গেল। কলেই একাধিকবার বিয়ে করেছে, শুধু শিবপদর দ্বিতীয়বার বিয়ের কোন উল্লেখ নেই। এই সাদৃশ্য এত সহজভাবে গল্পে এসেছে যে খেয়ালই পড়ে না। এই ধরনের পেশার সঙ্গে যারা জড়িত তাদের পারিবারিক বন্ধন বড় শিথিল হয়, বোধহয় রুজি-রোজগারের জন্য কঠিন ই ও যাযাবরের মত মেলায় মেলায়

ঘুরতে হয় বলেই সূক্ষ্ম অনুভূতি মরে যায়, হৃদয় কঠিন হয়ে ওঠে। মায়া-মমতা শব্দ এদের বোধের বাইরে চলে যায়। কৃষির সঙ্গে সম্পর্ক নেই, পায়ের শান্ত জীবন অতিবাহিত করবার কোন সুযোগ নেই, নিজস্ব বাসভূমি নেই, শুধুই যাযাবরের মত জীবনযাপন, বাজি দেখানো, তাঁবুতে থাকা, নেশা করা আর জীবিকার প্রতিযোগিতায় নিষ্ঠুর দ্বন্দ্বের মুখোমুখি দাঁড়ানো। এ জীবনে তাই বিবাহের বন্ধন দৃঢ় হবে কেমন করে? 'বেদেনী' গল্পের চরিত্রদের জীবনেও সঙ্গী কিংবা সঙ্গিনী পরিবর্তনের বাস্তব অভিজ্ঞতার ছাপ রয়েছে।

'বেদেনী' গল্পের কাহিনী এমন এক সমাজকে ঘিরে গড়ে উঠেছে যার পরিচয় নাগরিক কিংবা গ্রামীণ মানুষের কাছে খুব অপরিচিত। গ্রামীণ মানুষ এসব বেদেজাতের বাজি খুব আগ্রহের সঙ্গে দেখে, কিন্তু তাদের অন্তরের কোন পরিচয় জানার সুযোগ ঘটে না। তারাশঙ্কর যখন এই ছোটগল্প লেখেন তখন তিনি যে অনালোচিত অচেনা এক সমাজের কথা লিখছেন সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন। বেদেনী'র চরিত্ররা যেসব আচরণ করছে, পরিণতিতে রাধিকা যে বীভৎস অমানবিক প্রতিশোধ নিচ্ছে কিংবা বাজিকর ও তাদের 'বউরা যেভাবে মদ্যাসক্তির শিকার হয়ে অদ্ভুত আচরণ করছে তা নাগরিক পাঠকের কাছে অবিশ্বাস্য ও আরোপিত মনে হতে পারে। পাঠকের কাছে এই সমাজের ও সমাজের মানুষের আচার-আচরণের বিশ্বাসযোগ্যতা স্থাপনের প্রয়াসে গল্পকার সুন্দর একটি পদ্ধতি বেছে নিলেন। তারাশঙ্কর যে ছোটগল্পকার হিসেবে কত বড় শিল্পী এই গল্পে আমরা তার পরিচয় পাই। একটি জনগোষ্ঠীর পরিচয় তিনি দিয়েছেন সমাজবিজ্ঞানের আলোয়, কিন্তু তা কোনভাবেই এই কাহিনীর মধ্যে আরোপিত বলে মনে হবে না, অথচ তিনি সুকৌশলে এই পরিচয় না জানালে গল্পের চরিত্রগুলোকে ঠিক বুঝে উঠতে পারতাম না আমরা। মেলায় পাশাপাশি তাঁবু একটি শম্ভু ও অন্যটি কিষ্টোর। খেলা শুরু হবে, তার আগে শম্ভু একটা গাছতলায় নামাজ পড়ছে। এই নামাজ পড়া স্বাভাবিক, কিন্তু এই নামাজ পড়াকে কেন্দ্র করেই এই বেদেজাতির পরিচয় দিয়েছেন তারাশঙ্কর এবং তা অনন্য কৌশলে।

তারাশঙ্কর জানালেন, বিচিত্র জাত বেদেরা। পাঠক উদগ্রীব হয়ে জেনে গেলেন বেদেদের ধর্ম, বিবাহ-বন্ধন, জীবিকার কথা। তারাশঙ্কর জানাচ্ছেন, এরা জাতি জিজ্ঞাসা করলে যে বলে পরিচয় দেয়। ধর্মে এরা হয়তো ইসলাম, কিন্তু আচার-আচরণে হিন্দু নামেও হিন্দ পরিচয় রয়েছে। মনসামঙ্গলচণ্ডী-ষষ্ঠী-কালী-দুর্গা-রাধা লক্ষ্মী প্রভৃতি হিন্দু দেবদেবীকে প্রণাম করে, মানে, সুযোগ পেলে পূজাও দেয়। আবার সঙ্গে সঙ্গে নামাজও পড়ে। হিন্দু পুরাণ কিংবা লোকগাথার পরিচয়ও জানে। নইলে নতুন বাজিকর কি করে এমন রসের কথা বলবে?

কী নাম গো তুমার বাজিকর?

নাম শুনলি গালি দিবা আমাকে বেদেনী।

কেনে?

নাম বটে কিষ্টো বেদে।

তা গালি দিব কেনে?

তুমার যে নাম রাধিকা বেদেনী, তাই বুলছি।

শম্ভু শিব কৃষ্ণ হরি কালী দুর্গা রাধা লক্ষ্মী নামের এই মানুষেরা নিজেদের বেদে ছাড়াও বলে পটুয়া, চিত্রকরের জাতি। বিয়ের সম্পর্ক ইসলাম সম্প্রদায়ের সঙ্গে হয় না, নিজেদের বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মারা গেলে পোড়ায় না, কবর দেয়।

কাহিনীর একান্ত নিজস্ব প্রয়োজনেই যেন এসব সমাজবিজ্ঞানের কথা এসেছে। মনে হয়না। যে জোর করে গল্পকার এসব জানাচ্ছেন। যে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ রয়েছে ‘বেদেনী’ ছোটগল্পে, তাকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করবার জন্যই প্রয়োজন ছিল বেদেজাতির এই পরিচয়ের। সামাজিক অবস্থান না জানলে মনের পরিচয় মিলবে কেমন করে?

৫.২ কড়িমধ্যমের বিস্তার : ‘ডাইনী’

কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর নিয়তই বৈচিত্র্যসন্ধানী। তাঁর রচনায় এ কারণেই একটা চড়া সুর এসে গেছে। নরম সুর আছে বটে, কিন্তু তা ঐ চড়া সুরকেই ফোটাবার জন্য ব্যবহৃত। মাঝে মাঝেই মনে হয়, তাঁর ছোটগল্প ও উপন্যাসের বাদীস্বর কড়িমধ্যম। বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতির রূপকার তারাশঙ্কর। জমিদার থেকে শুরু করে অতি দরিদ্র মানুষের কথাও তার সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। বাংলার জাতিধর্ম ও বর্ণ বিন্যাসের বিচিত্র সব চিত্র তারাশঙ্করের কথাসাহিত্যকে সমাজতত্ত্বের তথ্য-উৎসে পরিণতি করেছে। কল্লোলের কালে বসেও তারাশঙ্কর কল্লেলিত হননি। খণ্ড-দৃষ্টিতে তিনি জীবনকে দেখেননি—খণ্ড ভৌগোলিক সীমার মধ্যে তাকে স্থাপন করেছেন মাত্র। প্রবৃত্তিনিবৃত্তি-ঘটিত জীবনাকুতি, নিয়তির অমোঘ প্রভাবে প্রচলিত মানুষের জীবন—এসব নিয়েই তারাশঙ্করের কথাসাহিত্য নিয়ত আবর্তিত। রাজনৈতিক বিশ্বাসে গান্ধীবাদী, অন্যদিকে চিন্তা-চেতনা ও অনুভূতির রাজ্যে প্রাচীন ভারতীয় মূল্যবোধগুলিই তার সাহিত্যে নিয়ত প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য উন্মুখ।

মানুষের জীবন সংস্কার ও কুসংস্কারের আচ্ছন্নতায়, অতিপ্রাকৃতের অতিপ্রশ্রয়ে দুয়ে ও দুরধিগম্য এক বিচিত্র মোহানার দিকে অবিরাম ছুটে চলেছে। ব্যক্তিগত বিশ্বাস-অবিশ্বাস, বিজ্ঞানমনস্কতার অহংকার—এ সবকে তারাশঙ্কর সবসময়ই পাশ কাটিয়ে চলেছেন। জীবনের নির্মম রূপকার তিনি। জীবনে প্রত্যক্ষরূপে যা দেখেছেন তাকেই তিনি নির্দ্বিধায় রূপায়িত করেছেন। কোন ব্যক্তিক পক্ষপাত তাকে বিচলিত করেনি। তাঁর বেশ কিছু ছোটগল্প ও উপন্যাস পড়লে বারবার এসব কথা মনে হয়। এও মনে হয়, অতিপ্রাকৃত বলে কিছু নেই সবই প্রাকৃত। যা জানিনে তাকে মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেবার বাতুলতা তারাশঙ্কর কোথাও দেখাননি। অবৈজ্ঞানিক অসত্য হলেও যা আমাদের সরল বিশ্বাসের মধ্যে লীন হয়ে আছে— তাকে অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যারা বিশ্বাস করে তাদের বিশ্বাসের জগতে অতিপ্রাকৃত আর অতিপ্রাকৃত থাকে না, নিতান্তই বাস্তব মূর্তি পরিগ্রহ করে। তারাশঙ্করের কৃতিত্ব তিনি এই সব অতিপ্রাকৃত বিষয় নিয়ে যখন ছোটগল্প লেখেন তখন তাকে পাঠকেরও অভিজ্ঞতার। বিষয় করে

তোলেন। পাঠককে সমগ্র ছোটগল্পটি রুদ্ধশ্বাসে পড়ে ফেলতে হয়। পাঠকের হয়ত মনে হয়, বিপুল ও বিচিত্র এই মহাজীবনের কতটুকুই বা আমরা জানি! বিস্ময়ে বিমূঢ় ও হতচকিত হয়ে গেলেও তারাশঙ্করের এ ধরনের ছোটগল্প আমাদের চৈতন্যের গভীরে গিয়ে নাড়া দেয়। কখনো বা আমরা নিমগ্ন হয়ে যাই নতুন একটা জগতের প্রান্তবর্তী হয়ে।

তারাশঙ্করের 'ডাইনী' ছোটগল্পে এই রকম নতুন জগৎ। ডাইনীর কথা আমরা শুনে থাকি, লোককথায় বা রূপকথা জাতীয় গল্পে ডাইনীর কথা পড়েও থাকতে পারি, কিন্তু তারাশঙ্করের ছোটগল্প পড়ে এ সম্পর্কে একটা ধারণা স্পষ্ট হয়। আসলে ডাইনীর দৃষ্টিতেই বিষ কিংবা হয়ত বলা যায়—দৃষ্টি নয়, ও তোলেন মাত্র—তার পশ্চাতে যেমন রয়েছে ও বিষ সেই মনেরই। যে সে মন নয়—একাগ্র, একান্ত অভিনিবিষ্ট সংহত পাপ ইচ্ছায় পরাক্রান্ত এক মন।

অধ্যাত্মশাস্ত্রে মনঃশক্তির কথা বলা আছে। রাজযোগের মধ্যে এই মনঃশক্তির ইতিবাচক দিক কিন্তু ইতির বিপরীতে নিত্যই নেতির লীলা বহমান। একজন যোগী, যিনি ত্রাটক যোগে মাধ্যমে সম্মোহন দৃষ্টি আয়ত্ত করেছেন—যার প্রভাবে তিনি যে কোন প্রকার কাজ স্বেচ্ছানুযায়ী অন্যকে দিয়ে করিয়ে নিতে পারেন—এ শক্তিরই বিপরীত দিক ডাকিনী শক্তি—চোখের পাপদষ্টি। যার সঙ্গে তুলনীয় শনির দৃষ্টির। জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহরাজ শনির কারকতা পৌরাণিক গল্পের অনুরূপ। পত্নীর অভিশাপে কঠোরব্রতী সন্ন্যাসী শনির মধ্যে ঐ ধরনের পাপদৃষ্টি জাগত হয়েছিল। শনির দৃষ্টি মানেই ধ্বংসডাকিনীর দৃষ্টি মানেও ধ্বংস। তারাশঙ্করের বর্ণনায় এ দৃষ্টির মধ্যে সংহত অনন্য এক শোষণশক্তি। আসলে দৃষ্টিটা উপলক্ষ—ডাকিনীর অপলক দৃষ্টির পশ্চাতে পাপমনের অতিরিক্ত লিপ্সা—একাগ্র ও অভিনিবিষ্ট—তাই কুফল উপজাত হতে বিলম্ব হয় না এক তিলও। ডাকিনীর মনোগত লিপ্সারই শারীরবৃত্তীয় প্রকাশ জিহ্বার তলদেশে ফোয়ারার মতো লালাক্ষরণ। মানুষের জীবনে অনেক দুর্গতি ও দুর্ভোগই আচমকা আসে। তখন অশিক্ষিত অবৈজ্ঞানিক মন তার সম্ভাব্য কারণ নিয়ে অনেক জল্পনা কল্পনা করে। ডাকিনী ঐ ধরনেরই এক কল্প-নায়িকা; অশিক্ষিতের সীমাবদ্ধ যুক্তিতে যখন কোন কিছুর ব্যাখ্যা

চলে না, তখনই জন্ম হয় দুয়ে এক ভীতি। ডাকিনী মানুষের এই সন্ত্রস্ত মনের আদিম কল্পনা—সেই থেকে পুরুষানুক্রমিভাবে এই বিজ্ঞানের যুগেও গ্রামীণ মানুষের বিশ্বাসের জগতে ডাকিনী এখনো কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করে— মানুষের রক্তরসমজ্জা শুষে খায়। জীবজগতের ফ্যানটাসি যেমন ভ্যামপায়ার তেমনি নর জগতের ভয়ানক এক ফ্যানটাসি ডাকিনী। তারাশঙ্করের ডাইনী' গল্পের নায়িকা ঐ রকমই এক ফ্যানটাসি। তবু মানুষের বদ্ধমূল কুসংস্কার ও বিশ্বাসের জগতে সে কঠোর বাস্তব প্রকৃতিজগতে অহল্যাভূমির অস্তিত্ব থাকতেই পারে। কিন্তু ভয়ানক রকমের উষরতা ও রুক্ষতা মানুষের মনে অতিপ্রাকৃত এক ভয়ের জন্ম দেয়। তার থেকেই কল্পজগতে অতিরঞ্জিত সব গল্পকথা সৃষ্টি হয়ে যায়। কালীদহের কালীয় নাগের অনুষঙ্গে মানুষ মহানাগের স্বপ্নে ভয়ে বিহ্বল হয়ে যায়। মহানাগের বিষেই ছাতিফাটার মাঠের ভয়াবহ রিক্ততা। বিস্তীর্ণ প্রান্তর-অনুর্বর শুধু ধুলোর রাজত্ব। মৃত্তিকায় কোন রস নেই, আঁট নেই। গ্রীষ্মের রৌদ্রে এ সাহারার রূপ নেয়। মরুদ্যান নেই—নীর এক মরুভূমির মতোই ছাতিফাটার মাঠ। বালুকার পরিবর্তে ধূলির ঘন আস্তরণে আরো ভয়াবহ।

ছোটগল্প হিসেবে তারাশঙ্করের 'ডাইনী' ভাব ও প্রকরণ উভয় দিক দিয়েই সিদ্ধ। ছোটগল্পকে সংজ্ঞার বন্ধনে অদ্যাবধি সেরকমভাবে বাঁধা যায়নি। তবু অনেকগুলি লক্ষণ নির্ধারিত হয়েছে। লক্ষণগুলি ভাব ও প্রকরণ বিষয়ে ছাোটগল্পের চারিত্র্যকে আলোকিত করে। ছোটগল্পের 'ছোট' কথাটিতে আকারগত সীমাবদ্ধতা নির্দেশিত। সাধারণত এক আসনে বসে একবারের চেষ্টাতে পড়ে ফেলায় মতো মাপে গল্প হবে ছোটগল্প। কথাটির মধ্যে অন্যবিধ তাৎপর্যও আছে, অর্থাৎ ছোটগল্প পাঠের এককালীন উদ্যম যেন ক্লান্তিকরতায় ক্ষুন্ন না হয়। এমন এক একমুখী নাট্যগতি ছোটগল্পে থাকে যা পাঠকের কৌতূহলকে শেষপর্যন্ত সজীব রাখে। 'ডাইনী' গল্পের মধ্যে এই নাট্যগতি সুন্দরভাবে সঞ্চারিত। বিষয়ের অভিনবত্ব, রহস্যময়তা ও ভীতিবিহ্বলতা ও গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠককে রুদ্ধশ্বাসগতিতে ছোটায়। ছোটগল্পের বিষয় তুচ্ছ অজস্র রান তুচ্ছাতিচ্ছ জীবনকণাকেই ছোটগল্পকার তুলে আনেন। তারপর তাকে ঘিরেই বিতানিতর তার গল্প। তুচ্ছাতিতুচ্ছও হয়ে যায় মহৎ, সামান্য একটি স্মৃলিঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসে

সদ্যতি। 'ডাইনী' গল্পের বিষয় তুচ্ছ এক লোকসংস্কার ও তার কবলে-পড়া সামান্য এক রমনীর ট্রাজেডি। ছোটগল্পের সমাপ্তি অন্য সব রচনা থেকে স্বতন্ত্র। সেখানে শেষ হয়েও শেষ না হওয়ার অনুভূতি। পাঠককে অনন্ত জিজ্ঞাসার উপকুলে দাঁড় করিয়ে লেখক নীরব হয়ে যান। পাঠক তার সমস্ত রসগ্রাহী চিত্ত নিয়ে ছোটগল্পের মধ্য থেকে অনেক কিছু আবিষ্কার করে নিতে বে। এই ধ্বনি-গর্ভতাই ছোটগল্পকে কবিতার প্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলেছে। ধরতে গেলে সাহিত্যের আর কোন রূপমাধ্যমের মধ্যেই পাঠক এই খোরক পায় না। ছোটগল্পের পাঠ সমাপ্তির পরই অর্থ থেকে অর্থান্তরের দিকে ছুটে চলে। বহুমাত্রিক অর্থ-সম্ভাবনা থাকে বলেই ছোটগল্প হকে বৃহত্তর সত্য আবিষ্কারের পর্বও কখনো শেষ হয় না। যার যেমন সহৃদয়তা সে সেরকম অর্থ খুঁজে পায়। কিন্তু তৃপ্ত কখনোই হতে পারে না। 'ডাইনী' গল্পের উপসংহারের মধ্য দিয়ে। এই সত্যটিই দীপিত হয়ে উঠেনি যে বিশ্বাসের শক্তিই প্রবলতম? যুবতী বয়স থেকেই মেয়েটিকে লোকে বিষদৃষ্টির অধিকারী বলে ভাবতে শুরু করে। ঘটনাচক্রে জনসাধারণের মনে তার এই ডাইনী সত্তাটি অবিসংবাদিতরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। মেয়েটিও নিজের সুপ্ত অপশক্তি সম্পর্কে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। অবশেষে সে জনরোষের ভয়ে কিংবা বৃহত্তর শক্তির অধিকারী গুণীনের প্রভাবে ছাতিফাটার মাঠ পাড়ি দিয়ে পালিয়ে যেতে চাইল। ঝড় উঠে এল। খৈরীগাছের কাটায় বিদ্ধ হয়ে বৃদ্ধার অন্তিম পরিণতি। সবই কিন্তু বিশ্বাসের ব্যাপার। সংস্কার কুসংস্কার, যৌক্তিক-অযৌক্তিক, বৈজ্ঞানিক-অবৈজ্ঞানিক সব চেতনাকে ছাপিয়ে আমাদের ভিতরকার বিশ্বাসের শক্তিই প্রবলতম। তারই কাছে অন্য সমস্ত শক্তি যেন পরাভূত হয়। 'ডাইনী' ছোটগল্পে হয়ত এরকম কোন বৃহত্তর সত্যকেই তারাশঙ্কর প্রচ্ছন্ন রেখেছেন। কিংবা হয়ত অন্য কিছু অন্য কারো মনে পড়তে পারে—বা অন্য কোন সময়ে আমাদের মনে জাগতে পারে। যেমন, দ্বিতীয়বার পড়তে গিয়ে মনে হয়েছে—আত্যন্তিক লোভমানুষের প্রবৃত্তির জগতে ঝড় তোলে। তখন মানুষ হয়ে যায় ডাইনী। কিন্তু ডাইনীর নেতিমূলক শক্তি কখনো সুখ আনে না আনে ভয়াবহ পরিণতি—ট্রাজেডি।

ছোটগল্পের লেখককে চূড়ান্ত বাংযমের অধিকারী হতে হয়। এদিক থেকে ছোটগল্পের একমাত্র তুলনাস্থল সনেট কবিতা। এতটা হিসেবী হওয়া ঔপন্যাসিকের পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে অনেক সফল ঔপন্যাসিক ছোটগল্পে তেমন সফল নন। বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র এর দৃষ্টান্ত। কিন্তু তারাশঙ্কর যখন ছোটগল্প লিখতেন তখন আশ্চর্যভাবে তার ঔপন্যাসিক বিস্তার-প্রবণতা সংহত রূপমূর্তিতে ঝলসে উঠত। 'ডাইনী' ছোটগল্পটির মধ্যে ছোটগল্পকার তারাশঙ্করের বাকসংযমের আশ্চর্য পরিচয়। ছাতিফাটার মাঠের কবিত্ব-বিলসিত বর্ণনার ক্ষেত্রে তার পদ স্বলনের সম্ভাবনা হয়ত ছিল। কিন্তু কত অনায়াসে এই রুক্ষ ভয়াল নিসর্গ-বর্ণনা তার মূল। গল্পের সঙ্গে মানিয়ে গেছে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রের রূপাঙ্কনে তারাশঙ্কর একাগ্র। পরিবেশ চিত্রণেও তার অভিনিবেশ ছবি-লেখক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে মনে করিয়ে দেয়। মহানাগের বিষনজর এক হাঁটু ধূলি-সমাবৃত প্রান্তরের রুক্ষতার সঙ্গে ডাইনী রূপে চিহ্নিত মেয়েটি জীবনের ভয়াবহ রুক্ষতা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। উপরন্তু মেয়েটির জীবনের ট্র্যাজেডি এই পরিবেশ চিত্রণের দৌলতে অনেক গভীরতা লাভ করেছে। গল্পের শুরুতেই ছাতিফাটার মাস বর্ণনা : কে কবে নামকরণ করিয়াছিল' ইত্যাদি ডাইনী মেয়েটির কথাও কৌশলে ব্যক্ত কয়ে যেখানে মিতব্যয়িতার প্রশ্ন সেখানে এককথায় দুই বা ততোধিক অর্থ দুলিয়ে দেবার ক্ষম উচ্চস্তরের ছোটগল্পকার বা সনেট রচয়িতার কাছে প্রত্যাশিত। 'ডাইনী' গল্পে লেখকই কথকে ভূমিকায় অবতীর্ণ। একটি মেয়ের সুপ্ত কামনাবাসনা, নারীত্ব, সংস্কার, লুব্ধ প্রবৃত্তির আত্যন্তিকতা আত্মবিশ্লেষণ, স্মৃতিরোমন্থনে ব্যর্থ প্রেমের চালচিত্র, আশপাশের মানুষজন, তাদের প্রতিক্রিয়া সব বিবৃত হয়েছে। অথচ কোথাও বর্ণনার অতিরেক প্রশ্রয় পায়নি। অনেক ক্ষেত্রে বিকল্প বাক্যের কথা ভেবে উঠতে আমাদের গলদঘর্ম হতে হয়। তারাশঙ্করের ভাষার এই ঘনপিনদ্ধ লাবণ্যের দীপ্তি 'ডাইনী' গল্পের বাড়তি ঐশ্বর্য। ছোটগল্পে যে ধারণার সমগ্রতা ও একমুখী প্রবাহের লক্ষণের কথা বলা হয় তাও 'ডাইনী' গল্পে বেশি পরিমাণেই আছে। কোথাও কণামাত্রও ভ্রষ্টতা নেই। কেন্দ্রবর্তী একটিমাত্র বিরল চরিত্র-লোলুপতার আত্যন্তিকতায় যে দৃষ্টিবিষসিদ্ধা ডাইনীর পর্যায়ে নেমে গেছে এবং সেই ডাইনী বিষয়ে আমাদের ধারণাটাকে পরিচ্ছন্ন এক প্রতীতির সোপানে প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়ার মধ্যে তারাশঙ্করের অখণ্ড মনোযোগে নিবদ্ধ।

গল্পের কোথাও সামান্যতম বিমনস্কতার ছাপ নেই—খাঁজ নেই, বাঁক নেই—যেন আবদুল করীম খাঁর রেওয়াজী কণ্ঠের অব্যর্থ সুরপ্রবাহ। এমনকি গল্পের নামটিও পাঠককে একেবারে একটি চরিত্রের মর্মমূলে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। বিস্ময়চকিত, রোমাঞ্চতাড়িত কৌতূহলাক্রান্ত পাঠক রুদ্ধশ্বাসে গল্পটি পড়ে ফেলতে বাধ্য হয়। কবিত্ব, নাটকীয়তা, নিখুঁত বিবৃতিধর্মিতাসব মিলেমিশে 'ডাইনী' ছোটগল্পের শিল্পসার্থকতা অতুলনীয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শ্রেষ্ঠগল্প' গ্রন্থের সম্পাদক জগদীশ ভট্টাচার্যকে তাই গল্পটির সমালোচনার শুরুতেই উচ্চারণ করে নিতে হয় ডাইনী গল্পের পরিকল্পনা ও শিল্পকুশতাও বাংলা সাহিত্যে অভূতপূর্ব। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কেও বলতে হয়েছে ? ছাতিফাটার মাঠের বর্ণনায়, চরিত্রসৃষ্টির বৈশিষ্ট্যে এবং প্রকাশের তীক্ষ্মতায় তারাশঙ্করের অন্যতম প্রধান গল্প এইটি। গল্পটি রবীন্দ্রনাথের মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল করবারই কথা।

ছোটগল্পের মধ্যে লেখকের যে নির্মম নিরাসক্ত দৃষ্টিরশ্মি ঝরে পড়ে সেদিক থেকেও 'ডাইনী' গল্পে বস্তুনিষ্ঠার চরম রূপ। অথচ প্রায়শই তা কবিত্বে উচ্চকিত। অনেকেই তাই তারাশঙ্করের প্রতিভার মধ্যে মধুসূদনের উত্তরাধিকার খুঁজেছেন, বলেছেন তারাশঙ্করের রচনায় প্রয়োগভঙ্গীতে অত্যুচ্চার যে কাব্যিক প্রকাশপ্রিয়তা, তাও আদিম মহাকাব্যধর্মিতারই এক স্বাভাবিক উপকরণ। দৃষ্টান্ত হিসেবে 'ডাইনী' গল্পেরই প্রথম অংশ থেকে ছাতিফাটার মাঠের বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন।

'ডাইনী' ছোটগল্পের নামও অব্যর্থ কেন্দ্রভিমুখ্যতার পরিচয়বাহী। রচনাকে নামাঙ্কিত করা হয়। স্বাতন্ত্র্যদ্যেতক এই চিহ্নটিকে কেউ কেউ করে তোলেন তন্ত্রের বীজমন্ত্রের মতো সংহত। আপাতদৃষ্টিতে তারাশঙ্করের গল্পনাম নিতান্তই নিরীহ ধ্বনৈশ্বর্যরিক্ত। কিন্তু তলিয়ে দেখলে গল্পনামটির মধ্যে এক প্রগাঢ় প্রদীপ্তির সন্ধান পাওয়া যায়। ডাইনী কথাটি ডাকিনী শব্দের লৌকিক রূপ। গল্পের শেষে তারাশঙ্কর অন্তিম ঘটনার বর্ণনায় তিনবার মাত্র ডাকিনী শব্দটির ব্যবহার করেছেন। সেখানে ক্লাসিক সৌন্দর্যসৃষ্টির তাগিদেই ডাকিনী শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে। বিকল্পে ডাইনী প্রযুক্ত হলে সৌন্দর্যহানী ঘটত। ডাইনির অন্তিম পরিণতিতে জনসাধারণের স্বস্তি মিশ্র বিস্ময় পাঠকহৃদয়কে বিদ্ধ

করে।লোকসংস্কার-জীবিত ডাইনীই সত্য। ডাইনী কোথাটির মধ্যে মানব মনের বিরূপতার ভাবটি প্রচ্ছন্ন। আর ডাইনী মেয়েটি তে সমগ্র জীবনব্যাপী সেই সমাজ মনের বিরূপতার শিকার—তাতেই তো তার জীবনে নেমে এসেছে রিক্ততা, বঞ্চনা। সে ভগবতী নারীই ছিল—সেখানে প্রেমও একদা শতদল মেলে ফুটে উঠেছিল। কিন্তু বঞ্চনায় স্ব রিক্ত হয়েছে—আর এই রিক্ততার বেদনাই মহানাদের বিয়ের অনুষঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। একখানি মাঠ রুক্ষ ভয়াল অগ্নিময় অস্তিত্বে পর্যবসিত হয়েছে। ঐ ছাতিফাটার মাঠ ডাইনীর হৃদয়েরই নৈসর্গিক প্রতিচ্ছবি। তারাশঙ্কর গল্পের শুরুতেই মহাকাব্যিক উদাত্ততায় ও - ছাতিফাটার মাঠের বর্ণনা দিয়েছেন গ্রীষ্মকালে—তখন ছাতিফাটার মাঠের সে রূপ অদ্ভুত, ভয়ংকর। শূন্যলোকে ভাসে একটি ধূমধূসরতা, নিম্নলোকে তৃণচিহ্নহীন মাঠে সদ্য নির্বাপিত চিতাভস্মের রূপ ও উত্তপ্ত স্পর্শ। 'ডাইনী' গল্পের চালচিত্রে ব্যবহৃত হয়েছে এই ভয়ংকর প্রান্তর। বিশুষ্ক এই খরপ্রান্তরে তৃষ্ণায় মানুষের ছাতি ফাটে। ডাইনী মেয়েটির হৃদয়ের চিত্রও অনুরূপ। সমাজ তাকে অভিশাপ সাব্যস্ত করেছে—এমনকি তার নিজের মনের মধ্যেও বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছে—তার হৃৎপ্রান্তরেও ঐ ছাতিফাটার মাঠের মতোই বিশুদ্ধ দাহ, ধূলিধূসর ধমাচ্ছন্নতা। হয়ত তার দোষ ছিল—লোলুপতার আত্যন্তিকতার—একাগ্র মনের পাপ ইচ্ছায় হয়ত অন্যের ক্ষতি হত। এ তার আদিম জৈব প্রবৃত্তি। এর পরাক্রমে সে ভিতরে ভিতরে পরাভূত ও পর্যদস্ত। শেষ পর্যন্ত ছাতিফাটার মাঠের প্রান্তে নির্বাসিত। সে সেই বিশুষ্ক প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। তাতেও যেন ঐ প্রান্তরের রুক্ষতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অবশেষে ডাইনীর মৃত্যু: 'শাখাটার তীক্ষ্মাগ্র প্রান্তে ঝুলিতেছে ডাকিনী।'...ডাকিনীর কালোরক্ত ঝরিয়া পড়িয়াছে। অতীত কালের মহানগর বিষের সহিত ডাকিনীর রক্ত মিশিয়া ছাতিফাটার মাঠ আজ আরো ভয়ংকর হইয়া উঠিয়াছিল।'

'ডাইনী' ছোটগল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বত্রই ডাইনী হিসেবে পরিচিত এক তরুণীর বার্ধক্য পর্যন্ত প্রসারিত জীবনের ভয়নক ও করুণ পরিণতির চিত্র থরে থরে তারাশঙ্কর সাজিয়ে দিয়েছেন। আমাদের সন্ত্রস্ত মনের কল্পরাজ্যে যে ডাইনীর বাস, তাকেই একটি বাস্তব চরিত্রের আধারে প্রমূর্ত করে তুলেছেন তারাশঙ্কর।

জরতী বৃদ্ধার মতো এক নারী নিঃসঙ্গ, অন্তেবাসী। ঘরের সম্মুখে প্রসারিত বিশুষ্ক এক প্রাতর। সাহারার ভয়ংকর ঊষরতার সঙ্গে মিশেছে কালীয় নাগের হলাহলের অগ্নিজ্বালা। বিশুষ্ক ডাইনীর ক্রুর বিষদৃষ্টি। নিজের ভয়াবহ ক্ষমতার উপর তার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। সে নিজেই বিবর্ণ পুরাতন দর্পণের মধ্যে সেই দৃষ্টি দেখে শিউরে উঠে ১. আপনার দৃষ্টি দেখিয়া সে আপনিই শিহরিয়া উঠে। ২. দৃষ্টিতে ছুরির মতো একটা ঝকমকে ধার। ৩. নরুন দিয়া চেরা, ছুরির মতো চোখে বিড়ালীর মতো এই দৃষ্টিতে যাহাকে তাহার ভাল লাগে তাহার আর রক্ষা থাকে না। কোথা দিয়া কি হইয়া যায়, কেমন করিয়া যে হইয়া যায়, সে বুঝিতে পারেনা,তবে হইয়া যায়। এক অনিয়ন্ত্রিত ধ্বংসশক্তি। নিরুপায় এক নারীহৃদয়। শতধা বিদীর্ণ হৃদয় কোন উপায় সন্ধান করে পায়নি। মনের মধ্যে তার তো কোন কুঅভিপ্রায় নেই। বারবার তারই চিত্ততল থেকে উঠে আসছে এক রক্ত শোষণকারী ভ্যাম্পায়ার। অগতির ঈশ্বরঃ "অঝোর ঝরে সে সমস্ত রাত্রি কাদিয়াছিল আর বলিয়াছিল, হে ঠাকুর, আমার দড়ি ভাল করে দাও, না হয় আমাকে কানা করে দাও।"

কিন্তু অনন্ত নিদ্রাশ্রয়ী ঈশ্বরের নিদ্রা ভাঙ্গেনি। মেয়েটি আপন মনেই তার কারণ খ পেয়েছে। পূর্বজন্মের অজ্ঞাত পাপের কথা কল্পনা করেছে। ভেবেছেঃ দেবতার দোষই বা কি আর সাধ্যই বা কি?

তবু মাঝে মাঝেই উপলক্ষ উপস্থিত হলেই তার মনের মধ্যে কি যেন একটা কিলবিল করিয়া উঠিত, এখনও উঠে। সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরবৃত্তীয় প্রতিক্রিয়া দেখা যায় মুখের ভিতর জিভের তলা হইতে ঝরণার মতো জল উঠিতেছে। পরিণত বয়সে সমগ্র জীবনের স্মৃতি একের পর এক মেয়েটির মনে ভেসে উঠে। যতই উঠে ততই সে অস্থির হয়। অনিয়ন্ত্রিত অজ্ঞাত পাপশক্তির উৎস সে জানে না। অথচ সেই শক্তিই তার সমগ্র জীবনকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিয়েছে। যন্ত্রণার অবিরাম তরঙ্গাঘাতে মেয়েটি অস্থির হয়ে পড়ে। অস্থিরভাবে সে মাটি খামচে ধরেঃ 'বাঁ হাতের শীর্ণ দীর্ঘ আঙুলগুলির নখাগ্র দাওয়ার মাটির উপর বিদ্ধ হইয়া গেল। কেন এমন হয়, কেমন করিয়া এমন হয়, সে কথা সারাজীবন ধরিয়াও যে বুঝিতে পারা গেল না। ব্যর্থ

জীবনের যন্ত্রণাভার বহন করতে করতে হতক্লান্ত ক্লিষ্ট এক নারীহৃদয়ের হাহাকার যেন এখানে ফেটে পড়েছে। তার সেই অনুচ্চারিত হাহাকার রূপমূর্তি লাভ করেছে ছাতিফাটার মাঠটা ধোঁয়ায় ভরিয়া ঝপসা হইয়া উঠিয়াছে। চৈত্র মাস বেলা প্রথম প্রহর শেষ হইয়া গিয়েছে। মাঠ ভরাল ধোঁয়ার মধ্যে ঝিকিমিকি ঝিলিমিলির মতো কী যেন একটা ছুটিয়া চলিয়াছে।

অনুশোচনার দগ্ধ চিত্তপ্রান্তরে পরমহূর্তেই জেগে উঠে বিপরীত ইচ্ছা। ধূমধূসর ধূলিপ্রান্তরের মধ্যে একটি মানুষের ছায়া দুলে উঠতেই ডাইনীর মনের মধ্যে ইচ্ছা জাগে, ফু দিয়া ধূলা উড়াইয়া দিবে মানুষটাকে উড়াইয়া? হি-হি-হি করিয়া পাগলের মতো হাসিয়া একটা অবোধ নিষ্ঠুর কৌতুক তাহার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল।

পরক্ষণেই মেয়েটি নিজের অনিয়ন্ত্রিত মনকে নিয়ন্ত্রণে আনবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। সে হঠাৎ ঝট দিতে শুরু করে। কিন্তু মুহূর্তে নৈসর্গিক এক উৎপাত ডাইনীকেও ত্রস্ত করেছে। বাতাসের আবর্ত ঝাঁট দিয়ে জড়ো করা পাতাপুতি ও ধুলি উড়িয়ে জরাগ্রস্ত ডাইনীবুড়ীকে জড়িয়ে ধরতে চাইল। ঝুটা আস্ফালন করে সে ঐ আবর্তরূপী বাতাদেহধারী অলক্ষ্য কোন এক অপশক্তিকে শাসন করতে উদ্যত হল। তাড়া খেয়ে বাতাসের সেই আবর্ত প্রথমে ঘুরন্ত স্তম্ভরূপ ধারণ করল, তারপর হাজারটায় ভেঙ্গে পড়ে সমগ্র প্রান্তরময় ছড়িয়ে পড়ল। মনে হল, মাঠটা যেন নাচিতেছে।

বৃদ্ধা যেন যুদ্ধে জয়লাভ করল। অদ্ভুত আনন্দে তার মন ভরে উঠল। তারপর এল যুবতী একটি মেয়ে। কোলে তার রোদে ঝলসানো একটি নধর শিশু। প্রথমে মমতায় বৃদ্ধার মন ‘গলিয়া গেল’; সে বলেছে, আহা-মা, এই রৌদ্রে ঐ রাক্ষসী মাঠে কী বলে বের হলি তুই? প্রথমে মানুষী মমতা, পরমুহূর্তে অমানুষী বিষময়ী দৃষ্টিক্ষুধায় শিশুটি ঘেমে-নেয়ে নেতিয়ে পড়ে। ডাইনীর ‘দন্তহীন মুখে জিহ্বার তলে ফোয়ারাটা যেন খুলিয়া গেল’; অনিয়ন্ত্রিত শাক্ত! আর ভয়াবহ প্রকোপে একটি শিশু তখন জীবনমৃত্যুর প্রান্তদেশে পৌঁছে গেছে। ডাইনী অসহায়। কষ্ট চিরে তার বেরিয়ে এল আর্তরঃ ‘ছেলেটাকে খেয়ে ফেললাম রে।’ শিশুর মা তখনো জানেনা যে সে এক কুখ্যাত

ডাইনীর দেওয়া জল পান করছে। বৃদ্ধার কথা শুনে তার হাত থেকে জলের ঘটি খসে পড়ল। সে উর্দ্ধশ্বাসে ছেলে নিয়ে পালাতে লাগল।

বৃদ্ধার মনে পড়ে প্রথম দিনের কথা। সেদিনই হারু চৌধুরীর কণ্ঠে তার ডাইনাসভার পরিচয় উদঘোষিত হয়েছিল। হারু চৌধুরীর ছেলেকে সে আম-মুড়ি খেতে দেখেছিল। তারপর ছেলেটির প্রচণ্ড পেটের ব্যথা। দুর্গাসায়রের জলে তখন দশ-এগারো একটি মেয়ে নিজের ছায়া দেখতে মগ্ন। হারু চৌধুরী ঠিক তখনই তাকে চুলের গোছা ধরে সিঁড়ির উপর ফেলে দেয়। হারু চৌধুরী বলে, হারামজাদী ডাইনী, তুমি আমার ছেলেকে নজর দিয়েছ। এ মেয়েটির লোভ হয়েছিল ঠিকই। কতজনেরই তত লোভ হয়। কিন্তু তারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ হারু চৌধুরীর ছেলের ঐ ভোগান্তি তো সে ভাবতেই পারে না। তবু তার যদি যথার্থই কিছু অপরাধ থাকে? সে কেঁদেছিল আকুলভাবে। আর প্রর্থনা করেছিল ঠাকুরের কাছেঃ 'ওকে ভাল করে দাও।' হারু চৌধুরীর ছেলে সেবার সুস্থ হয়ে উঠে। কিন্তু বালিকার মন বই উতলা হয়ে উঠে। সে তার দৃষ্টি শোধনের জন্য ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে। শেষ পর্যন্ত তা যদি সম্ভব নাও হয় তাহলে—না হয় আমাকে কানা করে দাও।

আর এক ঘটনা তারই সমবয়সী মেয়ে সাবিত্রীকে নিয়ে। সাবিত্রীর সবে তখন ছেলে হয়েছে। সে তাকে দেখতে গিয়েছিল। দেখে মনে মনে যখন তার শিশুটিকে কোলে নিয়ে আদর করার প্রবল ইচ্ছে জাগল। ঠিক সেই মুহূর্তেই সাবিত্রীর শাশুড়ীর গর্জন শোনা গেল। বহিষ্কারের কঠোর আদেশের সঙ্গে হারামজাদীর চোখ দেখ দেখি। মেয়েটি সাবিত্রীর খোকার অনিষ্ট চায়নি। তবু হয়ে গেল। বিকেল না গড়াতেই সাবিত্রীর ছেলে ধনুষ্টঙ্কারে মারা গেল : সাবিত্রীর ছেলেটি নাকি ধনুকের মতো বাঁকিয়া গিয়াছে আর এমনভাবে কাতরাইতেছে যে ঠিক যেন কেহ তাহার রক্ত চুষিয়া লইতেছে। মেয়েটিকে আত্মগোপন করতে হল। ঐ প্রচন্ড কুদৃষ্টি নিয়ে তো সমাজে বাস করা যায় না। মেয়েটির মনে সংশয়ের ঘোর তবু কাটেনি। শেষ পর্যন্ত থুতু ছিটিয়ে বমি করে তার মধ্যে রক্ত দেখতে পেয়েছে সে। সেইদিন সে নিঃশব্দে বুঝিতে পারিয়াছে আপনার অপার নিষ্ঠুর শক্তির কথা। ডাইনীর জীবনেও ভালবাসা এসেছিল। তখন বয়স তার

চোদ্দ পনেরো। সবিত্রীর ছেলেটি যেদিন মারা গেল সেদিনই রাত্রে সে বোলপুরে এসেছিল। পানের দোকানের আয়নায় সে তখন নিজেকে নিয়ে মগ্ন। এমন সময় লম্বাচওড়া এক জোয়ান তাকে জিজ্ঞাস করে বসে ও তুই আবার কেরে? কোথা থেকে এলি? তারপর ধীরে ধীরে জানা গেল ডাইনী মেয়েটির নাম সোরনি, লোকে বলে সরা, জাতে ডোম। ডাইনী সোরধনির জীবনেও প্রেম এল। আস্তে আস্তে ঐ জোয়ানের সঙ্গে কিভাবে তার ঘনিষ্ঠতা ঘনিয়ে উঠল—সব বৃদ্ধা ডাইনীর মনে পড়েছে। ছাতিফাটার মাঠের প্রান্তে নির্বাসিত জীবনযাপন করতে করতে হঠাৎই সোরধনি দেখল, অরই ঘরের পিছনে 'প্রময়মুগ্ধ বাউড়ী ছেলেটা' ও 'স্বামী পরিত্যাক্তা উচ্ছলা মেয়েটা কে। ওদের কথাবার্তায় সোরধনির জীবনেরই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠল।

ডাইনীর মধ্যে কেমন এক বাৎসল্যভাবে জেগে উঠল। বাউরী ছেলেটার কাছে মেয়ে দাবী: রূপোর কয়গাছি চুড়ি আর নগদ দশ টাকা। কিন্তু ছেলেটির সামথ্য নেই। বিয়ে হয়। সম্ভাবনা আর রইল না। ডাইনী ভাবল সেই দশ টাকা ছেলেটিকে দেবে—চুড়িও দেবে, তাহলেই তো ওদের মিলনপথের বাধা তিরোহিত হয়। ডাইনীর মনে তখন বাৎসল্যের শ্যাম স্বপ্ন। নাতি-ঠাকুরমার সম্পর্ক, মুখরোচক ঠাট্টা-সোরনি একেবারে মশগুল। কোনমতে সোরনি ছেলেটির পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। ফোকলা মুখ, অস্পষ্ট কথা। ছেলেটি হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে দেখল। তারপরই ভয়ে চীৎকার করে পড়িমরি করে ছুটল।

সোরধনির মন থেকে বিগত যৌবনের রক্তাভাটুকু মুহূর্তে মুছে গেল। তীব্র বেগে ডাইনীসত্তায় তার প্রত্যাবর্তন ঘটল। দেহরস-লোলুপ এক রাক্ষসী তাগড়াই বাউরী ছেলেটার রক্ত শুষে নিঃশেষে যেন পান করে ফেলল। এক গুণীন এল। সে নাকি বাউরী ছেলেটাকে ভাল করে দেবে। কিন্তু তারও মৃত্যু ঘটল। ধনুকের মতো বেঁকে গিয়ে। সোরধনির বিবাহ হয়েছিল। প্রাণের চেয়েও তাকে সে ভালবাসত। কিন্তু সেও তার বিষদৃষ্টিতে শুকিয়ে শুকিয়ে রক্ত ঢেলে দিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। আর আজ কে এক গুণীন বাঁচাবে বাউরীদের ছেলেকে?

ডোমের বেটী সোরধনির যেন কেমন অস্বস্তি হতে লাগল। যন্ত্রণায় বুক ফেটে যাবার উপক্রম। এ কি সেই গুণীনের মন্ত্রপ্রহার? এ স্তব্ধ দুপুর। খাঁ-খাঁ ছাতিফাটার মাঠ। হঠাৎ

একটা কান্নার উচ্চরোল। ডাইনীর মনে আজ ত্রাস সঞ্চারিত হয়েছে। সে দরজা বন্ধ করে বসে রইল। সন্ধ্যার মুখে মুখে সে ছাতিফাটার মাঠ পেরিয়ে পালিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু ঝড় উঠে এল। দুর্দান্ত ঘূর্ণিঝড়ে ডাইনীকে উড়িয়ে নিয়ে গেল। অবশেষে খৈরী গাছের ডালের ধারালো প্রান্তে তার শরীরটা গেঁথে গেল। ডাকিনীর কালো রক্তে ছাতি-ফাটার মাঠ আরো ভয়ংকর হয়ে উঠল। এবার শকুনিদের মহোৎসব। ডাইনীর দেহ ছিড়ে ছিড়ে শকুনিরা খাবে—এই ইঙ্গিতে গল্প সমাপ্ত। সমগ্র গল্প জুড়ে এক ভয়ানক করুণ রসাত্মক সুরের আলাপ ও বিস্তার। মহাকাব্যিক গাম্ভীর্যে রহস্যঘেরা দুজ্ঞেয় ত্রাসসঞ্চারী এক ডাইনীর জীবনের বৃত্তান্তই ডাইনী গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছুটে গেছে। পাঠকের মনে হয় ছাতিফাটার মাঠের উযর ভয়াবহতা যেন তার বুকের মধ্যেই সোঁ সোঁ আওয়াজ তুলছে। এ গল্পে যেন সংগীতের কড়িমধ্যমের প্রবল বিলাপই বেশি করে শোনা যায়। প্রসঙ্গত স্মরণীয় কড়িমধ্যমের আবেদন কারুণ্যমিশ্রিত ভয়ানক রসের। 'ডাইনী' ছোটগল্পের পিনদ্ধ পরিসরে বেদনাদীর্ণ এক নারী জীবনের ট্র্যাজেডি। ডাইনী চরিত্রের বহিঃস্তরে ভীতিবিহ্বলতা, রোমাঞ্চরহস্যের শিহরণ, কিন্তু অন্তরঙ্গে নারীজীবনের হৃদয়ভেদী হৃদয়সংবাদ। সে ডোমের বেটী সরা—সোরধনি। দশ-এগারো চোদ্দ-পনের থেকে শুরু করে জরাজীর্ণ হয়ে মারা যাওয়া পর্যন্ত বিরাট এক কাল-পরিসরের মধ্যে সোরধনির জীবনকে তারাশঙ্কর ছড়িয়ে দিয়েছেন। সে ডাইনী নয়—একটি সাধারণ মেয়ে। তারাশঙ্করের মমত্বপূর্ণ বর্ণনায় সোরধনি

সুন্দরীইঃ আয়নাটার মধ্যে ছিপছিপে চোদ্দ পনেরো, বছরের একটি মেয়ের ছবি। একমাথা রুক্ষ চুল, কপাল, টিকালো নাক, পাতলা ঠোট। চোখ দুইটি ছোট, তারা দুটি খয়রা রঙের; কিন্তু সে চোখের বাহার ছিল বইকি!'

সোরধনির জীবনেও স্বপ্ন ছিল। দুর্গাসায়রের জলের স্বল্প ঢেউয়ে নিজের প্রতিবিম্ব যখন মলিত হতে হতে হয়ে যাচ্ছিল এবং দেখতে দেখতে সে মগ্ন হয়ে গিয়েছিল তখনই হারু প্রধরীর আঘাত। সোরধনির জীবনে বজ্রাঘাত হল। একটি সাধারণ অপাপবিদ্ধা মেয়ে কুসংস্কারের কালে জড়িয়ে গেল। সাধারণের বদ্ধমূল ধারণা তাকে ডাইনী বানিয়ে দিল। অসুখ-বিসুখ অশিক্ষিত গ্রামবাসীর ধারণা থাকে না। সর্দিগর্মি বা সানস্ট্রোক,

ধনুষ্টঙ্কার বা টিটেনাসের তো ব্যাধিতে যখন হঠাৎ কারো জীবনান্ত হয় তখন মানুষের সন্ত্রস্ত মন নানা ধরনের কল্পনায় গতই পল্লবিত হয়। অশুভ কোন শক্তির আবিষ্কারে সে সর্বজিজ্ঞাসার উত্তর খোজে।

নিজের কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা ও বিহ্বলতার দায় অন্যের ঘাড়ে চেপে বসে। সৃষ্টি হয় ভূতপ্রেত ডাইনী প্রভৃতি অপদেবতার। আর এই সুযোগে কিছু চতুর মানুষ ব্যবসা ফেঁদে বসে হয়ে যায় সর্ববিপদনাশী শক্তির প্রতীক গুনীন, ওঝা—এরকম আরো কত কি। স্বভাবত সং ও সরল স্বভাবের মানুষ বিশ্বাসপ্রবণ। সোরধনি ঐ রকমই এক বিশ্বাসপ্রবণ, সৎ ও সরল মেয়ে। কিন্তু সমাজের হারু চৌধুরীদের দৌলতে কার ভাগ্যে কখন যে কি বিপদপাত নেমে আসে তা কেউ জানে না। সোরধনির নিজেরও মনে হয়েছে—সে হয়ত যথার্থই ডাইনী। সমবয়সী বন্ধু সাবিত্রীর ছেলেরও যখন মৃত্যু হল তখন সোরধনির পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল। সেই থেকে সে কোথাও স্থিত হতে পারেনি। অবশেষে স্থিত হতে পেরেছিল তারই নৈসর্গিক দোসর ছাতিফাটার মাঠের প্রান্তের কুটীর। কিন্তু সেখানেও কে যেন বাদ সাধল। প্রেমজীবনের স্মৃতিতে সোরধনি তখন উতলা। তারই কুটীরের পিছনে দুঃসাহসিক এক যুবক ও পতি-পরিত্যক্তা আর এক দুঃসাহসিকা রচনা করে চলল উচ্ছল প্রেমের চলচ্ছবি। সোরধনি তাদের প্রেমচিত্রের মধ্যে নিজের প্রেমজীবনের প্রতিচ্ছবিই দেখতে পেয়েছে। অথচ তার প্রিয়তম জীবিত থাকেনি। সোরধনি ভেবেছে এও তার অপশক্তির শিকার। কিন্তু বৃদ্ধবয়সে নিজের চুড়ি ও টাকা দিয়ে বাউরীদের ছেলেটিকে সে নাতি হিসেবে ভাবতে চেয়েছে। নিজের অচরিতার্থ প্রেমের চরিতার্থ অন্যের মধ্যে খুঁজে পেতে চেয়েছে। কিন্তু সেখানেও তার ঐ লোক-কথিত অপশক্তির জল্পনা বাধা হয়ে দাঁড়াল। সোরধনি ইচ্ছাপূরণে ব্যর্থ হওয়ায় ক্ষিপ্ত হয়েছে, ছেলেটির মরণ চেয়েছে। ছেলেটি মারাও গেছে। হয়ত ছুটতে ছুটতে পায়ে হাড় বিঁধে গিয়েছিল—তার থেকেই ধনুষ্টঙ্কার। কিন্তু প্রচার হল ডাইনীর অশুভ প্রভাব। গুনীন এল সর্বসমস্যা সমাধানের আশ্বাস নিয়ে। কিন্তু গুনীনও সর্বগুণাধার নয়, সর্বশক্তিমান তো নয়ই। গুনীনও বহুক্ষেত্রেই মারণ, উচাটন, বশীকরণ, স্তন ইত্যাদি ক্ষতিকর তন্ত্রোক্ত ষট্‌কর্মাদি করে থাকে। এ অবশেষে পলায়নের পথ—যে

পথে সোরধনি সমগ্র জীবন ছুটে বেড়িয়েছে। জরাকবলিত শরীর। ধূলিসমাচ্ছন্ন দুস্তর প্রান্তর—প্রবল ঝড় উঠে এল। সোরধনির মৃত্যু হল। নিসর্গ ও মানুষ পরস্পর পরিপুরক। ছাতিফাটার মাঠের বর্ণনায় সোরধনির হৃদয়েরই ছবি। পানের দোকানের আয়নায় একদা সোরধনি দেখেছিল নিজের কায়বিম্বছাতিফাটার মাঠও নৈসর্গিক- এতে ফুটে উঠেছে সোরধনির সমগ্র মনোজীবনের ছবি। কি ভয়াবহ রিক্ততা এই চিত্রের মধ্যে।

সোরধনির মনের মধ্যেও বিশ্বাস পাকা হয়ে গেড়ে বসল। এক অপশক্তির অধিকারী ও দৃষ্টিতে তার বিষ—অলক্ষে সে শুষে খেতে পারে মানুষের দেহের রসরক্ত। এ তো বাস্তবে অসম্ভব। তবু সকলের বিশ্বাসের জগতে অতীব সত্য—সোরধনিও সত্য বলে ভেবেছে। তা শক্তি—অথচ তার উপর নিয়ন্ত্রণ নেই কোন। সোরধনির মধ্যে যন্ত্রণার উদ্ভব হয়। সে অগতি গতি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছে—তার দৃষ্টির শোধন হোক। যদি ঈশ্বরও তার মতোই অপশক্তির সম্রাট হন, ভাল না করতে পারেন, তাহলে তাকে যেন তিনি অন্ধ করে দেন। সোরধনির কাতর প্রার্থনা বারবার বায়ুস্তরকে ভারাক্রান্ত করেছে। সে বারবার ভেবেছে কেন হয়? সে তো চায় না। তবু অন্যের ক্ষতি হয় কেন? কাকতালীয় কতকগুলি ঘটনায় সোরধনির মধ্যেও বিশ্বাসটাকে কায়েম করে দিয়েছে। সে ডাইনীতে পরিণত হয়েছে। সোরধনি চরিত্রের এই দ্বন্দ্ব, অনুশোচনা, অসহায়তা—সব মিলিয়ে চরিত্র হিসেবে সে অত্যন্ত জীবন্ত। মানবিক চরিত্র হিসেবেই তার অনুভব ও আবেগগুলি স্তরে স্তরে তারাশঙ্কর সাজিয়ে দিয়েছেন। এখানেই লেখক হিসেবে তারাশঙ্করের কৃতিত্ব। অতিপ্রাকৃত বিষয় নিয়ে অতিপ্রাকৃতের ভীতি বিহ্বলতা বিস্ময়-বিমূঢ়তা সৃষ্টির চূড়ান্ত করেছেন একদিকে, অন্যদিকে নেপথ্যে তার কঠোর সত্যদৃষ্টি অতিপ্রাকৃতের অন্তরে ছুরি চালিয়ে তাকে কুচি কুচিকরে কেটেছে। এই কাটার ব্যাপারটি সুকৌশলে গল্পের নেপথ্যে সংঘটিত হয়। এ যেন সমান্তরাল এক চোরাস্রোত।

'ডাইনী' গল্পের সোরধনি নিতান্ত বাস্তব চরিত্র বলেই তার জীবনে ডাইনীসত্তা সম্পর্কে বিশ্বাসটাকেই লেখক সত্য করে তুলেছেন।

সোরধনির চরিত্রের দুর্বলতা লোভের মধ্যে সমাহিত। মানুষমাত্রেই প্রবৃত্তি-আশ্রিত। তবে এর আতিশয্যে জীবনের সামঞ্জস্য বিনষ্ট হয়। সোরধনির জীবনের ট্র্যাডেডির মূল নিহিত লোভের ঐ আতিশয্যের মধ্যে।

সোরধনির জীবনে যে কটি ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে একমাত্র প্রথম ঘটনাতেই তার অশুভ শক্তি ইচ্ছানুযায়ী প্রত্যাহৃত হয়েছে। প্রতিটি ঘটনার পরই বর্ণিত হয়েছে সোরধনির প্রতিক্রিয়া। এই বর্ণনায় বারবার সোরধনির মানবিক সত্তাই প্রতিপন্ন হয়েছে। অপশক্তির বিগ্রহ হলে তার মধ্যে অনুশোচনা, কিংবা আত্মশোধনের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা এসব আচরণ দেখা যেত । কিন্তু বারবার সোরধনির মনে প্রতিক্রিয়ার তরঙ্গ তৈরী হয়েছে : ১ হারু চৌধুরীর ছেলের প্রসঙ্গে—হে ঠাকুর, ভাল করে দাও, ওকে ভাল করে দাও। হে ঠাকুর, আমার দৃষ্টিকে ভাল করে দাও, না হয় আমাকে কানা করে দাও। ২. ছাতিফাটার মাঠে দূরে মানুষ নড়তে দেখে মনের মধ্যে কুইচ্ছা জেগে উঠতেই—না ওদিকে আর সে চাহিবেই না। তাহার চেয়ে বরং উঠানটায় আরও একবার বঁটা বুলাইয়া ছড়াইয়া-পড়া পাতা কাঠকুটাগুলোক সাজাইয়া রাখিলে কেমন হয়? ৩. যুবতী মায়ের শিশুপুত্রের প্রসঙ্গে—নিতান্ত অসহায়ের মতো আর্তরে সে বলিয়া উঠিল, খেয়ে ফেললাম—ছেলেটাকে খেয়ে ফেললাম রে। পালা পালা, তুই ছেলে নিয়ে পালা বলছি। ... আপনার বুকখানাকে তাহার নিজের জীর্ণ আঙুলের নখ দিয়া চিরিয়া ঐ লোভটাকে বাহির করিয়া দিতে ইচ্ছা করে। জীভটাকে কাটিয়া ফেলিতে পারিলে সে পরিত্রাণ পায়। ছি ছি ছি।' ৪. সাবিত্রীর ছেলের প্রসঙ্গে—হইলইবা ডাইনী, কিন্তু তাই বলিয়া কি সে। সাবিত্রীর ছেলের অনিষ্ট করিতে পারে ?...না, আমাকে ডাইনী হইতে মানুষ করিয়া দাও, আমি তোমাকে বুক চিরিয়া রক্ত দিব। ৫. বাউরী যুবকের মৃত্য উপলক্ষে অকস্মাৎ উত্তপ্ত হব তন্দ্রাতুর নিস্বন্ধ ভঙ্গ করিয়া একটি উচ্চ কান্নার রোল ছড়াইয়া পড়িল। বৃদ্ধা ও দয়া শুনিয়া পাগলের মতো ঘরে ঢুকিয়া খিল আঁটিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।...পলাইবে--সে পলাইবে।

শেষ বয়সে অসহায় সোরধনি ভেবেছে : 'পূর্বজন্মের পাপের যে খণ্ডন নাই-- দেবতার রায়ই বা কী, আর সাধ্যই বা কী?

প্রতিক্রিয়ার এই চিত্রাবলীর মধ্য থেকে এক অসহায় নারী মূর্তিই বেরিয়ে আসে। তার লোভ আছে। মাঝে মাঝেও তার মনের মধ্যে কি যেন একটা কিলবিল করিয়া উঠিত। এ তো মানবমনের বিশ্বজনীন বৈশিষ্ট্য। ডাইনীর মানবিক সত্তার পরিপূর্ণ পরিচয় তার বাৎসল্যপরায়ণতায় ও প্রেমস্মৃতি রোমন্থনের স্বপ্নাতুরতায় : মমতায় বৃদ্ধার মন গলিয়া গেল, সে তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর ঢুকিয়া বড় একটি ঘটি পূর্ণ করিয়া জল ঢালিয়া এক টুকরা পাটালির সন্ধানে হাড়িতে হাত পুরিয়া বলিল, আহা-মা, এই রৌদ্রে ঐ রাক্ষুসী মাঠে কী বলে বের হলি তুই?'.আহা! জোয়ান বয়স, সুখের সময়, শখের সময়, আহা! ছেলেটিকে ডাকিয়া রূপার চুড়ি ও টাকা সে দিবে, আর উহার সঙ্গে নাতি-ঠাকুরমার সম্বন্ধ পাইবে।

অশিক্ষিত অসহায় সরল গ্রাম্য এক নারীসমাজের দেওয়া অখ্যাতির তিলককে শেষ পর্যন্ত সে সত্য বলে ধরে নিয়েছে, বিশ্বাসী মানবমনে অভিভাবনের (suggestion) কী অমোঘ ক্ষমতা! প্রসঙ্গত মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের 'জীবিত ও মৃত' গল্পের কাদম্বিনী ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'দেবী' গল্পের মেয়েটিকে। সর্বত্রই ভয়াল মৃত্যুতেই ট্র্যাজেডির বৃত্ত পরিসমাপ্ত হয়েছে। তারাশঙ্কর শিল্পসচেতন। সাধ্যানুযায়ী সতর্কতার শর্ত তার কথাসাহিত্যের সর্বত্র রক্ষিত। ডাইনী' গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত বাকসংযমের এক অপূর্ব দৃপ্তশ্রী। বিষয় অনুযায়ী গল্পটির মধ্যে ধ্রুপদী ভাষারীতির মহিমময় গাম্ভীর্য। সাধু গদ্যে পরিবেশিত এই গল্পের মধ্যে তৎসম শব্দবাহুল্য ও সমাসবদ্ধতা স্বাভাবিকভাবেই এসেছে। কখনো উপমানের ক্ষণউদ্ভাস, মহাকাব্যিক গাম্ভীর্য ও আড়ম্বরসব মিলিয়ে বিস্ময় রহস্য রোমাঞ্চ-ভাবে ধূমধূসরতার মধ্যে ফুটে উঠেছে ভয়ানক রসের এক মূর্তিমান বিগ্রহ। সংগীতের সপ্তস্বরের মধ্যে তীব্র মা এখানে বারে বারে বেজে উঠে।

গল্পের কেন্দ্রবিন্দু এক নারী। যৌবনের স্বপ্নমদির দিনগুলিতে তার জীবনে নেমে এল ডাইনী নামের অখ্যাতি। বৃদ্ধ বয়সে জরাজীর্ণ শরীরে সে যখন নিঃসঙ্গ ক্লান্ত মুহূর্তগুলো কাটায় তখনই তারাশঙ্কর গল্পমঞ্চের যবনিকা সরিয়ে দিয়েছেন। বিশুষ্ক প্রতপ্ত এক অপশক্তির বিগ্রহরূপিণী এ নারীর জীবনের প্রতীক হিসেবে বর্ণিত হল নৈসর্গিক এক

রূপছবি। তারপর স্মৃতিরোমন্থনের সূত্রে বিবৃত হয়েছে ডাইনীর বেদনানীল জীবনের ইতিবৃত্ত। লেখকই এখানে কথক। তবু মাঝে মাহে মনে হয়, লেখক নন—স্বয়ং সোরধনিই নেমে এসেছে গল্পমধ্যে। সে-ই বিবত কবচ তার ডাইনী জীবনের ভয়াবহ করুণ কাহিনী। ফলে ডাইনী চরিত্রের হৃদয়ের স্পর্শ তার অপার মমতা, নৃশংসতা, অসহায়তা নিয়ে পাঠকের হৃদয়ে অমোঘ হয়ে নেমে আসে। লেখক মাঝে মাঝেই ডাইনীর মানুষী ব্যক্তিত্বের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন। রূপক অলংকারে উপমানের যে ভূমিকা 'ডাইনী' গল্পে গল্পকথক তারাশঙ্করেরও সেই ভূমিকা। 'ডাইনী' গল্পের সূচনার নিসর্গের এক ভয়াবহ ঊষরতার ছবি। পাঠককের মন ধাক্কা খায় বিমুগ্ধ হয় মহাকাব্যিক বর্ণনা-বৈভবে—তারপরই ঐ ছাতিফাটার মাঠের প্রান্তে বসবাসকারী ডাইনীর ক্রুর দৃষ্টির প্রসঙ্গ। সে দৃষ্টি ঐ ভয়াবহ প্রান্তরের ঊষরতাকে তীব্রতর করে তুলেছে। ধীরে ধীরে দুই পৃষ্ঠাব্যাপী পরিসরে এক দৃষ্টিবিষসিদ্ধা নারীর অপার অপশক্তির রহস্য উন্মোচন। তারপর বিবৃতি মুখ্যতা ছেড়ে তারাশঙ্কর প্রবেশ করলেন কাহিনীমুখ্যতায়। হারু চৌধুরীর প্রবল উঘোষণে সোরধনির মধ্যে ডাইনীসত্তার উদ্বোধনী বার্তা রটে গেল। সোরধনিও কেমন হতচকিত, বিস্মিত। দশ-এগারো বছরের গ্রাম্য মেয়ে। সরলমনে তার বিশ্বাসের ভীষণ এক ছায়া নেমে আসে। ক্রমে সাবিত্রীর শিশুসন্তানের মৃত্যু সোরধনির গ্রামত্যাগ—বোলপুরের এক জোয়ানের সঙ্গে অতঃপর শুরু হয় তার প্রেমজীবন। কিন্তু অতবড় তাগড়াই জোয়ানও সোরধনির অপশক্তির প্রভাবকে অতিক্রম করতে পারল না। বৃদ্ধা বয়সে এই কাহিনীর উন্মোচন। বর্তমান, তারপর অতীত; আবার বর্তমান অতীত—এইভাবে কাহিনীধারা ছুটে চলে দ্রুত পরিণতি-মুখে। ছাতিফাটার মাঠ অতিক্রম করে ছুটে এল এক তরুণী মাতা—কোলে তার ঘেমে-নেয়ে ওঠা শিশুসন্তান পিপাসায় তার তখন ছাতিফাটার উপক্রম। এই ঘটনার সূত্রেই প্রথম জীবনের সাবিত্রীর সন্তানের মৃত্যু প্রসঙ্গ। নির্জনতার সুবাদে বাউরীদের ছেলে ডাইনীর ঘরের পশ্চাতেই পতি-পরিত্যক্ত এক রমণীর সঙ্গে প্রেমে নিমগ্ন হয়েছে। সেই সূত্রেই ডাইনীর জীবনের প্রেমিকাসত্তর সংবাদ। এই ভাবেই তারাশঙ্কর তীব্র কৌতূহল জাগিয়ে পাঠকচিত্তকে ছুটিয়ে নিয়ে গেছেন পরিণামের দিকে। এরই মাঝে মাঝে এসে গেছে সোরধনির ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের দ্বন্দ্ব। কখনো সে অপশক্তি প্রয়োগের কিলবিল ইচ্ছার

বশবর্তী, পরক্ষণেই তার মধ্যে মমত্বঘন নারী হৃদয়ের উদ্বোধন। অথচ দুজ্ঞেয় অপশক্তির রহস্য যে নিজেও ভেদ করতে পারে —তার অসহায় হৃদয়ের আর্তনাদও মাঝেমাঝেই পাঠককে বেদনায় বিহ্বল করে। সাধুভাষার ঐশ্বর্যও যে ছোটগল্পকে কত উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে তার দৃষ্টান্ত 'ডাইনী' গল্পে। সাধুভাষার সমাসবদ্ধতা ও তৎসম শব্দবাহুল্য 'ডাইনী' গল্পের মধ্যে মহাকাব্যিক মাহিমা এনে দিলেও এর হৃদয়স্পর্শী অন্তরঙ্গতা কোথাও ক্ষুন্ন হয়নি। দুই বিপরীতের সংস্থান ভাষার দেহ যে কি কৌশলে ঘটানো যায় 'ডাইনী' ছোটগল্প তার দৃষ্টান্ত।

৫.৩ 'পৌষলক্ষ্মী' : ভিন্ন এক পাঠরীতি

তারাশঙ্করের সৃষ্টির যে রসায়ন তার সঠিক বিশ্লেষণ এখনো হয়ে ওঠেনি আমাদের। তারাশঙ্করের তা বহুমাত্রিক মানুষ ও স্রষ্টা থেকে গেছেন আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তারাশঙ্কর ছিলেন টি ও মানুষের আপনজন। সেই সম্পর্ক তিনি বাহ্যিকভাবে গড়ে তোলেন নি। রাঢ়ের প্রাণী উদ্ভিদ জগৎ যেন প্রকৃতি ও সমাজের সঙ্গে গ্রহণে-বর্জনে বিকশিত হয়েছে তেমনই শঙ্করের শরীর ও মন রাঢ়ের সুখ-দুঃখ নিয়ে গড়ে উঠেছে। রাঢ়ের প্রকৃতি ও জীবনকে ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করেছেন। সেই অনুভবেরই শিল্পরূপ তার গল্প ও উপন্যাস। চেতনা দিয়ে বিশ্লেষণ করে মানুষের অনুভবে প্রবেশ করার বিপরীত পথের প্রয়োজন ছিল না তারাশঙ্করের। হয়ত সে পথে তেমন বিশ্বাসও ছিল না তার। না হলে নিজের চৌহদ্দিটিকে অমন স্পষ্ট রীমারেখায় তিনি চিহ্নিত করে নেবেন কেন? কেনই বা এতদিনের নগরবাস করে তুলবে না তার একটিও মহৎ উপন্যাসের বিষয়বস্তু ? কেনই বা কলকাতা শহর হয়ে থাকবে তার নান্দনিক জগতে পরবাসী?

তারশঙ্করের 'পৌষলক্ষ্মী' গল্পের কয়েকটি প্রচলিত পাঠ আছে। সেই সব আলোচনায় এই গল্পের মুখ্য চরিত্র মুকুন্দ পালের মৃত্যুর হাতে পরাজিত জীবনাসক্তির করুণাঘন আলেখ্যের উল্লেখ আছে। মহাকালের অমোঘ বিধানে প্রত্যেক মানুষকেই যে একদিন না একদিন এই সুন্দর ভবন এই সুখ-দুঃখের সংসার ছেড়ে চলে যেতে হবে, তার বিবরণ আছে। এই সব আলোচনা থেকে আমরা জেনে যাই দুর্গার জীবনাসক্তির সঙ্গে

জন্ম-মৃত্যুশাসিত মর্ত্যজীবনের দুর্জয় বিধিলিপির আপসহীন সংগ্রামই জীবনের নিষ্ঠুরতম সত্য।

এই সত্যকে তুলে ধরার মধ্যে তারাশঙ্করের নিজস্ব অর্জন কতখানি সে প্রশ্ন জাগে। এই সত্যের, এই দার্শনিক চিন্তার বহু ছোট-বড় তত্ত্ব ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে বারে বারে আলোচিত হয়েছে। 'বেদ' ও 'গীতা' থেকে শুরু করে সিদ্ধার্থের গৌতমবুদ্ধ হয়ে ওঠার মধ্যে কতকাল আগেই আসক্তি এবং নিরাসক্তি, একাল এবং মহাকাল, ইহকাল এবং পরকাল, মত্যজীবন এবং ত্রিভুবনের কথা আলোচিত হয়েছে। তারাশঙ্কর সেসব সত্যের মুখোমুখি কোন নতুন তত্ত্বে আমাদের প্রতিষ্ঠা দেবেন? মানব সভ্যতার এত হাজার বছরের আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং আত্মবিশ্লেষণের পর হঠাৎ-ই বা কেন ১৩৫০ সালের শরৎকালে তিনি জীবনসত্যের রসরূপ দান করতে আলোড়িত হবেন 'পৌষলক্ষ্মী' গল্পে? কেনই বা চরিত্রমুখ্যতাকে গুরুত্ব না দিয়ে ভাব বা বিষয়বস্তুকে করে তুলবেন কাহিনীর নিউক্লিয়াস? 'পৌষ-লক্ষী'র প্রচলিত পাঠে এখানেই জেগে ওঠে কিছু পরিশ্ন। তখনই নতুন করে পড়তে হয় গল্পটিকে। একান্ত নান্দনিক পাঠে যেতে হয়। অন্ধের পথ চলার রীতিতে, দৃষ্টিহীনের সচেতন এগিয়ে চলার প্রচেষ্টায়। গল্পের সত্য ছেড়ে বাক্যের শরীর হাতড়াতে হয়। খুঁজতে হয় কখনো বা শব্দের একক সুখ-দুঃখ এবং অনুভূতিতে। তখনই মনে হয় বানানের ব্যত্যয় ঘটিয়ে অনুভূতি' লিখলে বোধ হয় ভালই হত। যে কোন মহৎ কথা সাহিত্যিকের মতো তারাশঙ্করকে পাঠ করার সঠিক প্রক্রিয়া হতে পারে একমাত্র

অনূপাঠ। সেখানে কাহিনীর বিষয়বস্তুতে আমরা পৌঁছতে চাইব অনুভূতির এককে এক অনূর সমবায়ে। 'পৌষলক্ষ্মী' গল্পের প্রথম ব্যাখ্যাটি হল—-১৩৫০ সালের পৌষ মাস। মুদ্রিত সতের পৃষ্ঠার এই গল্পের প্রথম বাক্যটিতেই তারাশঙ্কর সময়-চিহ্নিত করে দিলেন গল্পটিকে। এ পঞ্চাশকাহিনীর দ্বিতীয় বাক্যে তারাশঙ্কর লেখেন—শ'য়ের অর্ধেক। বাইরে থেকে নয় সময়কে ভেতর থেকে চিনিয়ে দেন গল্পকার-শ'য়ে শূন্য ; শ'য়ের অর্ধেক পঞ্চাশেও গাঁয়ে অর্ধেক লোক ঝেড়ে মুছে নিয়ে গেছে, বাকি অর্ধেক যারা আছে, তারাও আধমরা, হিসাব ঠিক আছে। আমাদের পাঠক মনে সময়বাোধকে যেন উস্কি

দিয়ে এঁকে দিতে চান গল্পকার। তাই পরের তিনটে বাক্যেও একই সময়কে তার বিস্তৃতিতে দেখান। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের প্রথম বাকে আসে মুকুন্দ পালের কথা। যাকে নিয়ে এই কাহিনী আবর্তিত হয়েছে। খরা এবং ঝরার প্রতিক্রিয়ার বিবরণ চলতে থাকে পরের অনুচ্ছেদগুলিতে। সপ্তম অনুচ্ছেদে আসে ধানের কথা —ওই ধানই জীয়নকাঠি, মরণকাঠি। গোটা মাঠখানি এবার ধানে থইথই করছে। সেই ধান ঘরে তোলার চিন্তা মানুষজনের। দিনমজুরের দল অজন্মা আঁকাড়ার কারণে দল বেঁধে চলে গেছে গা ছেড়ে। তাই খরার প্রকোপে থেকে যারা বেঁচেছে তাদের বুক বানের ঠাণ্ডায় ম্যালেরিয়ায় জীর্ণ। সেরকম অনেকেরই একজন মুকুন্দ পাল। এককালের জোয়ান মুকুন্দর শরীরটা খরা-ঝরায়। দীর্ণ। তবু ধান কাটতে হবে। তাই অনেকের মতো সেও মাঠে নেমেছে কাস্তে নিয়ে। এই মাঠে নামার আগে পর্যন্ত কয়েক অনুচ্ছেদের যে প্রথম পর্বের প্রাথমিক অংশ সেখানে মন্বন্তর আর বানই প্রধান হয়ে উঠেছে। বার্ধক্যের পরোক্ষ উল্লেখ আছে কিন্তু বয়সের হিসেব নিকেশ প্রকৃতির প্রাণ-সংহারী রূপের কাছে অবান্তর হয়ে গেছে। জীবনের স্বাভাবিক বিবর্তনে যে জরা আসে যে মৃত্যু আসে তার কোনো উল্লেখ নেই। গাঁয়ের যে অর্ধেক লোকের মৃত্যু ঘটেছে তা প্রকৃতির রোষে, গাঁয়ের যে অর্ধেক মানুষ আধমরা তাও প্রকৃতিরই কারণে।

প্রথম অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় অংশে মানুষের ধানকাটার বৃত্তান্ত। সেখানে যে মানুষের কথা এসেছে তারা গাঁয়ের সর্ব বয়সের মানুষ। তারা রুগ্ন তারা দুর্বল—বয়েস নিরপেক্ষ তাদের হাতের আঙুলের বাঁক এবং হাতের মুঠোর আড়ষ্টতা।

পরের অনুচ্ছেদ আসে মুকুন্দ পালের কথা। মুকুন্দের কৃষাণ জ্বরে পড়েছে, তাই তাকে নিজেকেই আসতে হয়েছে ধান কাটতে। কিন্তু শরীরের কারণে সে কাজে গতি পায় না। তার চোখে জল এসে যায়। এককালের 'ভীম' আজ নিজের কাজের দিকে তাকিয়ে আক্ষেপ করে, লজ্জা পায়। এই অক্ষমতার কতখানি বার্ধক্যের কারণে, কতখানি প্রাকৃতিক রোষে? সে প্রশ্নেরও উত্তর তারাশঙ্কর পরোক্ষ কাহিনীতে গেঁথে দেন: 'বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সে শক্তি কমে আসারই কথা। তবুও গত বছর পর্যন্ত সে এক পহর বেলা তক আধখানা ক্ষেতের ধানও কেটেছে। কিন্তু এই কটা মাসে একি হ'ল তার?' এই

তিনটে বাক্যের ভেতর দিয়ে বার্ধক্যের চেয়ে যেন খরা এবং ঝরাকে মুকুন্দের এই অসহায় শারীরিক অবস্থার জরুরি কারণ হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিতে চান। ঠিক এর পরের বাক্য তথা অনুচ্ছেদে কাহিনীতে ঢুকে পড়ে জোতদার চিকেষ্ট (শ্রীকৃষ্ণ)। তাকে থামিয়ে রেখে, দু-দুটো অনুচ্ছেদ জুড়ে গল্পকার তার পুরনো কথার পিঠে কথা জুড়ে যান। বার্ধক্যের স্বতঃক্রিয় সামনে এগিয়ে চলা নয়, বানের সঙ্গে যে ম্যালেরিয়া এল তার এক ধাক্কাতেই বেলা কাবার করে দিলে চারিদিক ঝাপসা। অথচ গত বছর পর্যন্ত বিনা চশমার টসেলাই সূচে শণের সূতলির দড়ি পরিয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণকে মাঠ থেকে ফিরতে দেখে মুকুন্দ ভেবেছিল তার বোধ দ্বার এসেছে। হি হি করে হাসতে থাকে শ্রীকৃষ্ণ। বসে মদ আর মাসের কারণে জ্বর ছুঁতে পারেনি তাকে। শুধু শরীরের কার নয়, টাকারও গরম আছে তার। সে মুকুকে বলে মুকুন্দের কাছ থেকে গত বছরে বেনা দ, ফিঙে-তিন বিঘে জমির ধান নিয়ে ঘরে ফিরছে। বর্ষার আগে যখন চালের দাম তিরিশ তখন মুকুন্দকে বেচতে হয়েছিল ঐসব জমি।

কাহিনীকে এক নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। পরোক্ষ খরার কথা, মন্বন্তরের প্রসঙ্গ আসে। আসে জোতদার শ্রীকৃষ্ণ, কাহিনীর ভেতর। অর্থের কথা আসে, অর্থ-বৈষম্যের কথাও। উঠে আসে সমাজ। মদ আসে, মাস আসে। বার্ধক্যকে ছাপিয়ে যায় খরা-ঝরা-জুর-ব্যাধি এবং এরই ভেতর থেকে উঠে আসে জোতদার শ্রীকৃষ্ণ তার অর্থলিপ্সা নিয়ে, তার মদ ও মাস নিয়ে। এককালের কুস্তিবীর মুকুন্দকে সে বাইকে বলে যায়—হবে নাকি, এক হাত হবে নাকি এই ধানের গদির ওপর? নিজের হতাশার কথা সমবয়সী যোগেন্দ্রকে শোনায় মুকুন্দ। যে শ্রীকৃষ্ণকে মুকুন্দ একসময় পাঁজাকোলা করে তুলে আখড়ায় গাদায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল সে এখন বাই বুকে আস্ফালন করে। অথচ এ তার বৃদ্ধ হয়ে ওঠা নয়, এ তাকে বৃদ্ধ করে দেওয়া। সে কথা রয়েছে মুকুন্দের নিজের সঙ্গে কথোপকথনের ভেতর: হায় ভগবান! কি কাল জুর তুমি দুনিয়ায় পাঠালে!...যাট বছর বয়স কি এমন বয়স? তার বাপ পঁয়ষটি বছর বয়সে কোদাল চালিয়েছে জোয়ান কৃষাণের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে। সে নিজে নিজেই তো সে এই বর্ষাতেও কোদাল চালিয়েছে, লাঙলের মুঠো ধরেছে। হঠাৎ এ কি হল? হায় ভগবান বুড়ো করে দিলে?

বয়সের হিসেবকে তুচ্ছ করে মুকুন্দ। জীবনের নিয়মে নয়, অনিয়মে মুকুন্দ হারিয়ে ফেলছে কর্মক্ষমতা। তাই বুড়ো হয়ে যাওয়ার বিপরীতে সে বুড়ো করে দেওয়ার অভিযোগ তোলে ভগবানের কাছে এখানেই থামেননি তারাশঙ্কর। যোগেন্দ্র এবং মুকুন্দের কথোপকথনের ভেতর একই বয়সের দুই মানুষের দুই ভিন্ন ভাবনাকে তুলে ধরেন। যোগেন্দ্রের কার্যকারণে উৎসাহ নেই। সে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে এটাই তার কাছে চরম সত্য। তার প্রতীক্ষা ঘাটে গিয়ে শুধু লায়ে চাপার দিনটির জন্যে। মুকুন্দ তার কর্মক্ষমতা হারানোর দায় চাপায় ভগবানের ওপর তার শরীর আপন নিয়মে রক্ত, মাংস, অস্থি, দৃষ্টির ক্ষমতা হারায় নি। কিন্তু লায়ে চাপতে আপত্তি নেই তার। এই সুন্দর ভুবন কিংবা সুখদুঃখের সংসার ছেড়ে যেতে মুকুন্দের তেমন কোনও দুঃখও নেই। তাই বলে—লায়ে পার হতে তো ভয় নাই যগন্দ, 'হরি' বলে নামিয়ে লায়ে চড়তে পারতাম, তবে তো! কিন্তু এ কি পাপের ভোগ বল তো? হ্যাঁ হে, তিন চার মাসে কটা জুরে এ কি হ'ল বল তো?

যোগেন্দ্র মেনে নেয়, মুকুন্দ মানে না। যোগেন্দ্র মাঠ ছেড়ে বাড়ি ফেরে, মুকুন্দ ফেরে না। মুকুন্দ ধান কাটে প্রচণ্ড উৎসাহে। কিন্তু ধান কাটার চেয়ে তার শরীরটাই বেশি চলে। ভাঙা কল চলে, তাতে যেমন কাজের চেয়ে কলটা ঝাকুনি খেয়ে নড়ে বেশি, শব্দ হয় জোর, তেমনিধারা ধান কাটার বেগের চেয়ে মুকুন্দের মনের আবেগটা শরীরে প্রকাশ পাচ্ছিল এই উস্কৃতির বাক্যখানির ভেতর কাহিনীকথক তারাশঙ্করের একটি শব্দ বিশেষ জব কালের আগে 'ভাঙা' বিশেষণটি। পুরনো নয়, 'ভাঙা' শব্দটি ব্যবহার করছেন তিনি। আসে নানা কারণে, শুধু মাত্র পুরনো হওয়ার পরিচিত এবং প্রচলিত নিয়মে নয়।

প্রথম পরিচ্ছেদের শেষ দুটি অনুচ্ছেদে মুকুন্দের অতীত ও বর্তমানকে জুড়ে দেন তারাশ চার চারিটি বৌ মারা গেছে মুকুন্দের। লোকে বলত অজগর পুরুষ। মুকুন্দের চতুর্থটি ছিল বাবুদের বাড়ির বিধবা তরুণী ঝি। তাকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করে ঘরে তুলেছিল মুকুন্দ। সেও চলে গেছে। থাকার মধ্যে দ্বিতীয় স্ত্রীর মেয়ে। সে এখন বিধবা।

তার মেয়েটিও স্বামী হারিয়ে নাতনীর একটি ছেলে আছে। তাকে কোলে করে না মুকুন্দ। তার সংসারে মড়ক। মাঠের মাথায় এসে দাঁড়িয়েছিল নাতনীটি।

এখানে পৌছে, গল্পের এই সীমানায় দাঁড়িয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে বস্তুমুখ্য নয়—চরিত্রম গল্পে আমাদের প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছেন তারাশঙ্কর। স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট করে তুলছেন মকর চরিত্রটিকে। সে আর পাঁচজনের মতে আটপৌরে চরিত্র নয়। সে যোগেন্দ্রের মতো মেনে নিতে পারে না যা ঘটেছে তার বাস্তবতাকে। কর্মবাচ্যে বদলে নেওয়া যায় না তাকে। টিঁকে থাকাতে বিশ্বাস নেই তার। সে ডুয়ার', 'সাফারার' নয়। পত্নীস্থানে শনি মঙ্গল রাহুর অবস্থানের কথা জেনে হাতের তালুতে নিজেকে আটকে রাখেনি সে। বাবুদের বাড়ির তরুণী ঝিকে বৈষ্ণবমন্ধে দীক্ষিত করে সে ঘরে তোলে। মেয়ে এবং নাতনীর স্বামী হারানোর পরেও সে আত্মসমর্পণ করেনি না দেবতা না অপদেবতার কাছে। তার শরীর তার বাহুবল সবই তার লড়াকু মনের পরিপূরক। এমন চরিত্র যে কাহিনীর কেন্দ্রে সে গল্প কোন দুঃখে বস্তুমুখ্য হতে যাবে?

কাহিনীর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কাল এবং অকালের টানাপোড়েন আরো স্পষ্ট। তাকে মুকুন্দের প্রিয়তম হেলে কেলের কথা। একা কেলের সঙ্গে কঁধ দিয়ে একে একে চারটে বলদ অকালে ঘায়েল হয়ে গিয়েছে। এবার দুটো বলদেরই "খুঁড়িয়া" হয়েছিল গো-মড়কের সময়। মড়ক বলদের, মড়ক মানুষের। যারা বেঁচে আছে তাদের শরীরে ক্ষমতা নেই। বলদের শরীরে ক্ষমতা ফেরাতে ধেনো মদের রশি মেয়া খাওয়ার। বৈষ্ণব মুকুন্দ কোনদিন হাত দেয়নি মেয়াতে। আজ দেয়।

শুধু হালের বলদকে দেয় না নিজেও মদ খায়। প্রকৃতির রোষের মুখোমুখি সে দাঁড়াতে চায়। চার বলদগুলোকে সঙ্গী করে। ধর্মের বাধা ও বন্ধনকে উপেক্ষা করে বৈষ্ণব মুকুন্দ খরা-ঝরা ম্যালিরেয়ার মুখোমুখি দাঁড়াতে চায়। দাঁড়ায়। দাঁড়ায় ধর্মেরও মুখোমুখি——'ধম্ম আমার ধান তুলে দেবে? ধম্ম!' মুকুন্দ ছাপিয়ে যায় সমস্ত সংস্কার, মুকুন্দ কাহিনীর বস্তুমুখ্যতার শরীরে ফাটল ধরিয়ে উঠে দাঁড়ায়। বাই ঠুকে কাহিনীর বুকের ওপর দাপিয়ে বেড়ায় মুকুন্দ। কিন্তু মুকুন্দের প্রতিপক্ষ শুধু প্রকৃতি নয়, রোগ নয়, ধর্মের বাধা-বন্ধন নয়—এমনি। শ্রীকৃষ্ণের যৌবনের আপন বিক্রমও নয়।

শ্রীকৃষ্ণের ক্ষমতা অর্থেরও। সে কথা মুকুন্দও জানে—"এই পঞ্চাশ সাল থেকে ওর ভিরকুটি, টাকার গরম, ধানের গরম এইবার ভাঙবে।" তার বিশ্বাস গত পঞ্চাশ বছর দুখের কাল গিয়েছে কিন্তু আসছে পঞ্চাশ বছর সুখের কাল হবে। গাঁয়ের মহাজন শ্রীকৃষ্ণের দোরে যেতে হবে না মানুষকে। কিন্তু সে সবই ভবিষ্যতের এ সবই কল্পনা। যা সত্য তা হল তাকে বেঁচে থাকতে হবে। সমর্থ থাকতে হবে। কোনো জীবন-বিলাস নেই, এই বাচতে চাওয়ার ভেতর, কোনো ভুবন-পিয়াসা নেই। এই বাঁচতে যাওয়া নিজের জন্য নয়। সমর্থ থেকে এই বাঁচতে চাওয়ার কারণ অন্য কোথাও। মুকুন্দ জানে মতার অন্যতম উৎস অর্থ। শরীর এবং অর্থ জড়িয়ে মানুষের প্রতাপ। আর সে কারণেই কন্দের বাঁচার, সক্ষম সবল থেকে বাঁচার যে আপ্রাণ প্রচেষ্টা তার কার্যকারণকে তারাশঙ্কর কয়েকটি বাক্যে হাট করে খুলে দেন-

'বাঁচতে তাকে হবে। সমর্থও থাকতে হবে। সরস্বতীর ছেলেটাকে মানুষ না করে সে মরতে পারবে না। তা হলে ওই চেকাই সর্বনাশ করে দেবে। সরস্বতীর উপর নজরও যে সে না দিতে পারে, এমনও নয়।'

কিন্তু ইচ্ছেতে মানুষ বাঁচে না। মদে শরীর ফিরে পায় না তার হারিয়ে যাওয়া কর্মক্ষমতা। আলের কাটে চাকা আটকে যায়। সেই চাকা বুক দিয়ে ঠেলে তুলে দেয় মুকন্দ। পৌষের ধান নিয়ে গাড়ি চলে ঘরের পথে। কিন্তু ঘরে ফেরা হয় না মুকুন্দের। নাক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ে। 'ধান-ভরা মুঠা-বাঁধা হাত দুখানা প্রসারিত করে দিয়ে সমস্ত আক্ষেপ তার স্তব্ধ হয়ে গেল পর মুহূর্তে।'

মুকুন্দের আগে, একই দিনে, মারা গেছে মুকুন্দেই সমবয়সী রমণ। দিন রাত হরি হরি করে সারা হত রমণ। সে মুকুন্দের মৃতসঞ্জীবনী (মদ) খাওয়ার প্রস্তাব মেনে নেয়নি। ধর্মভীরু রমণ ধর্ম নিয়ে স্বর্গে যায়, রমণ এবং মুকুন্দের পর এবার তাদেরই সমবয়সী যোগেন্দ্রের পালা। ভয় আঁকড়ে ধরে তাকে। সে দড়াম করে খোলা জানালাটা বন্ধ করে দিলে। রমণ আর যোগেন্দ্রের বিপরীতে মুকুন্দ অনন্য। সে যেন মহাকাব্যের নায়ক। খরা-ঝরা-ব্যাধি, ধর্মের বাধা ও বিপত্তি এবং শ্রীকৃষ্ণের বাই ও অর্থ ক্ষমতার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল সে। মুকুন্দ প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধের প্রতীক। মুকুন্দ ট্র্যাজিক হিরো।

বহুমুখী বহুরূপী প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করতে করতে মুকুন্দ প্রাণ দেয়। মুকুন্দের লড়াই নিজের জন্য নয় সরস্বতীর জন্য, সরস্বতীর ছেলের জন্য, লক্ষ্মীর জন্য। মুকুন্দের কামনা বাসনা ঈশ্বর পাটনীর মতো ভবিষ্যত প্রজন্মকে ঘিরে। মুকুন্দ মারা যায়। মহাকাব্যের নায়কের মতো লড়াইয়ের ক্ষেত্রে মরে। ধানই তো মুকুন্দদের জয়-পরাজয়ের ক্ষেত্র। মুকুন্দ মারা যায় ট্রাজেডির নায়কের মতো কিন্তু লড়াই যে এককের নয়, এককের হতে পারে না, এ লড়াই যে বিচ্ছিন্ন নয়, ব্যতিক্রম নয়—সে ভাবনার পরিচয় মিলেছে আগেই। 'শালা চেকা! শালা আবার লক্ষ্মীতে অন্নপূর্ণা পূজা করবে এবার। হিংসুটে বদমাশ। রক্তের তেজ, জোয়ানীর দেমাক। আর টাকার গরমে ধরাকে সরার মত দেখছে। এবার লক্ষ্মীপুজোর বারোয়ারী থেকে ভাসান-গান হবে ঠিক হয়েছে। ও অমনই অন্নপূর্ণা পূজার ধুয়ো তুলেছে। তুলুক। দশের লাঠি একের বোঝা। দশজনের চাঁদায় হবে বারোয়ারী। ওর একার লক্ষ্মীপুজো।'

মুকুন্দেরলড়াইটা ছিল প্রায়-একক। মুকুন্দের লড়াইটা ছিল প্রত্যক্ষে সরস্বতী, সরস্বতীর ছেলে, লক্ষ্মীর জন্য, কিন্তু পরোক্ষে মুকুন্দের নিজস্ব শ্রেণীর সমস্ত মানুষের জন্য। মুকুন্দের লড়াইটা তাই লক্ষ্যে এককের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকে না। মুকুন্দের আজকের একক লড়াই এক বারোয়ারী উত্তরাধিকার।

৫.৪ অগ্রদানী' : নিয়তির নির্মম অনিবার্যতা

বাংলা সাহিত্যে তারাশঙ্করের (১৮৯৮-১৯৭১) প্রথম আত্মপ্রকাশ গল্পকাররূপে। উপন্যাসের তাঁর ছোটগল্পে রাঢ় অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ, গ্রামীণ সমাজ-জীবন ও মানুষের বিচি চরিত্রের রূপায়ণ। তাঁর প্রায় সমস্ত গল্পের কেন্দ্রীয় ও অন্যান্য চরিত্র দেশজ—তাদের মানসিক জীবনধর্মিতার মূল দেশের মৃত্তিকার গভীরে প্রোথিত এবং চরিত্রগুলি প্রচণ্ডভাবে জীবন তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে চরিত্র আহূত হলেও, রাঢ় অঞ্চলের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যমনি হলেও জীবন-দর্শনের স্পর্শ লাভ করে চরিত্ররা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য অতিক্রম করে যেন চিরকাল রসমূর্তি লাভ করেছে। এই জীবনদর্শন অবশ্যই শিল্পী তারাশঙ্করের জীবন-দর্শন। বীরভূমের গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে তারাশঙ্করের যে অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা ঘটেছিল তার বক্তব্য তার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়—"এদের সঙ্গে

আমার পরম সৌভাগ্যের ফলে একটি আত্মার আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে। এমনই সে আত্মীয়তা যে, প্রবাসে থাকি, প্রতিষ্ঠা খানিকটা পেয়েছি, তবু সে আত্মীয়তা এতটুকু ক্ষুন্ন হয়নি। এ পাওয়া যে কি পাওয়া সে আমি জানি। তাই আমি এদের কথা লিখি। এদের কথা লিখবার অধিকার আমার আছে। আমি ওদের জানি—ওদের আত্মীয় আমি। উপকারী নয়, কৃতজ্ঞতাভাজন নয় ভক্তির পাত্র নয়, ভালবাসার জন।" তারাশঙ্করের প্রায় সমস্ত গল্পেই রাঢ় অঞ্চলের রিক্ত ঊষর ভূমির আদিম মানুষে জৈব আবেগের তীব্রতা। একে মানুষের মৌলিক প্রবৃত্তি বলা চলে— elemental passion এরই প্রকাশ। তাঁর প্রায় সমস্ত গল্পেই আদিম স্বভাবরূপের নগ্ন প্রকাশ। তার সৃষ্ট চরিত্রগুলি শুধু যে আদিম নগ্নতার দুরন্ত দুর্বার প্রকাশ তাই নয়, তারা আদিম সরলতার উজ্জ্বল প্রকাশও বটে। তার গল্পে জনজীবনের আদিম অন্ধসংস্কার, বিশ্বাস, রহস্যময়তা ইত্যাদি শিল্প নিপূণতার সঙ্গে প্রকাশিত। প্রাচীন সামন্ত তান্ত্রিক আভিজাত্যের প্রতি তার যেমন আকর্ষণ ছিল তেমনি ইতিহাস সচেতন মন নিয়ে তিনি ক্রমবিলীয়মান জমিদারতন্ত্রের অনিবার্য রূপকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তারাশঙ্করের গল্পে জীবনের নানা বিচিত্র প্রকাশ পাঠককে স্বতঃই বিস্ময় বিমুগ্ধ করে। বাংলা ছোটগল্পের অন্যতম গল্পকার তারাশঙ্কর মানবজীবনের যে বৈচিত্র্য মন্ডিত দিকটি পাঠকের কাছে তুলে ধরতে চান তা বিভিন্ন গল্পকে অবলম্বন করে প্রকাশ পায়। তার 'অগ্রদানী' এমনই এক গল্প যেখানে অমাোঘ বিধানের নির্মম ট্র্যাজেডির মহাভয়ংকর আলেখ্য চিত্রিত। (তারাশঙ্করের অগ্রদানী' গল্পটি 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর দ্বিতীয় গল্পসংগ্রহ 'রসকলি'তে (এপ্রিল ১৯৩৮) অগ্রদানী' গল্পটি সংকলিত হয়।)

শ্রাদ্ধকালে প্রেতের উদ্দেশ্যে যে ব্রাহ্মণকে অগ্রে দান করতে হয় তাকে অগ্রদানী ব্রাহ্মণ বলে। এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা প্রেত সম্প্রদানের তিলাদি গ্রহণ করার জন্য পতিত ব্রাহ্মণরূপে পরিগণিত - এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধকালে মৃত ব্যক্তির প্রেতের উদ্দেশ্যে যে পিন্ড উৎসর্গ করা হয় তা গ্রহণ করে ভেজন না করলে শ্রাদ্ধ সফল হয় না—এরূপ বলা হয়।

দীর্ঘাকৃতি পূর্ণ চক্রবর্তী তার দীর্ঘতার জন্য লোকসমাজে মইরূপে পরিচিত ছিল। সে অস্বাভাবিক দীর্ঘাকৃতি ছিল বলে লোকে বিদ্রুপ করে তাকে মইরূপে অভিহিত করেছিল। ছোট ছেলেদের সে অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিল ; কেননা, সে তাদের আম-জাম-পেয়ারা ইত্যাদি ফল যেমন সংগ্রহ করে দিত তেমনি নিজেও ভক্ষণ করত। গল্পের সূচনাতেই রসের কথা বলতে যে উদরসর্বস্ব ব্রাহ্মণের খেজুর রস খাওয়ার কথা মনে হয় এমন সংলাপে সাহায্যে গল্পকার পূর্ণ চক্রবর্তীর ঔদরিকতার প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। খাদ্যলোলুপ চক্রবর্তীর লালসা এত তীব্র ছিল যে মৌমাছি বোলতার আক্রমণের আশঙ্কাকেও সে অগ্রাহ্য করতো। এমনকি কেউ যদি সন্ধাক্কি না করে তার মত ব্রাহ্মণের আহার গ্রহণের প্রসঙ্গ তুলতো তবে সে জানালো ফল খেলে দোষ নেই; কেননা, ফল তো ভাত নয়। আসলে ধর্মীয় আচার পালন অপেক্ষা উদরের তাড়নাই তার কাছে বেশি ছিল। ছেলেদের সঙ্গে মিশে ফল সংগ্রহের অভিযানে তার একমাত্র প্রেরণা ছিল আহারের প্রতি তীব্র লোভ। গ্রামের ধনী শ্যামাদাসবাবুর সন্তান বাঁচত না, ভূমিষ্ঠ হয়েই মারা যেত। শ্যামাদাসবাবুর পাঁচটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে মারা যাওয়াতে তিনি পুরনায় বিবাহ করতে উদ্যোগী হলে সন্তানসম্ভবা স্ত্রী শিবরাণী সজল নয়নে আর কিছুদিন অপেক্ষার জন্য অনুরোধ জানালে তিনি সে অনুরোধে রক্ষা করলেন। শ্যামাদাসবাবু বিপদ-শান্তির জন্য একত্রে চারিস্থানে স্বস্ত্যয়নের আয়োজন করলেন। বিপদ প্রতিরোধের জন্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির এমন বিপুলে আয়োজন করলেন যাতে সন্তান বিনষ্ট হলে পত্নী তার পুনর্বিবাহে বাধা দিতে না পারেন। শ্যামাদাসবাবুর আয়োজন এমনি বিপুল হলো যে সেই অনুষ্ঠানকে স্বস্ত্যয়ন না বলে পুত্রোৎপাদন কামনায় প্রাচীনকালে ভাল রাজাদের অনুষ্ঠেয় পুত্রেষ্টি যজ্ঞ বললেই সম্ভবত ভালো হয়। স্বস্ত্যয়ন উপলক্ষে ব্রাহ্মণদে বিপুল আয়োজনে পূর্ণ চক্রবর্তী তার তিন ছেলেকে নিয়ে নিমন্ত্রণ সারিতে বসেছিল। শ্যামাদাসত্ব পক্ষ থেকে সে ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করে এসেছিল বলে পারিশ্রমিকরূপে তার একটি ছাঁদা নির্দিষ্ট ছিল। শুধু শ্যামাদাসবাবুর পক্ষেই নয়, গ্রামে ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজন হলে সে শীত, এ উপেক্ষা করে গ্রামের লোকদের স্বেচ্ছায় গিয়ে নিমন্ত্রণ করে আসত এবং পারিশ্রমিক স্বরূপ তা একটি ছাঁদা পাওনা ছিল। পূর্ণ চক্রবর্তীর পোষাকে চরম দারিদ্র্য পরিস্ফুট, পূর্ণ দৈর্ঘ্যের কাপড় তার

ছিল না। হাঁটু পর্যন্ত ঢাকে এমন পোষাকী কাপড় পরে এবং পিতৃপিতামহের আমলের কালী নামাবলী গায়ে দিয়ে সে হাজির হতো। শ্যামাদাসবাবু তাকে আরও মাছ নেওয়ার অনুরোধ জানালে সে জানাল যে মিষ্টিও তো খেতে হবে। অবশ্য সে প্রায় বিশখানা মাছ ও একটি মুড়া ইতিমধ্যেই ভক্ষণ করেছিল। ছাঁদার মিষ্টি নিয়ে পরিবেশকের সঙ্গে ঝগড়া হলে শ্যামদাসবাবু তাকে ষোলটা মিষ্টি দেওয়ার জন্য পরিবেশককেআদেশ দিলেন। শ্যামদাসবাবর সহৃদয়তা তার ব্যবহারে প্রকাশিত; তাছাড়া ভাবী সন্তানের অমঙ্গল প্রতিবিধানাথ তিনি যে বিপুল আয়োজন করেছেন সেখানে কেউ অতৃপ্ত বা বা অসন্তুষ্ট থাকুক এটা তিনি চান না। পূর্ণ চক্রবর্তীর উদরসর্বস্বতা প্রতিবেশীদের কাছে যে বিদ্রুপের বিষয় ছিল গল্পে তার ইঙ্গিত আছে—'চোখ দুটো, চোখ দুটো দেখু উঃ যেন চোখ দিয়ে গিলছে।'

চক্রবর্তী গৃহে প্রত্যাগমন করে মিষ্টি লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করলে চক্রবর্তী কন্যা তা ফাস করে দিলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তা স্ত্রী হৈমবতীকে দিতে হয়, চক্রবতী গৃহিণী হৈমবতী যথার্থই রূপসী। চরম দারিদ্র তার রূপকে ম্লান করতে পারেনি। রুক্ষ কেশ, শীর্ণ দেহ, ছিন্ন বস্ত্র পরিহিতা হৈমবতী রূপের দিক থেকে যেন যথার্থই পর্বত-দুহিতা দেবী দুর্গা। হৈমবতীর দেহসৌন্দর্য অসাধারণ হলে কী হয় তার অন্তর শুষ্ক; দারিদ্র এবং চক্রবর্তীর ন্যায় উদরসর্বস্ব লোভী ব্যক্তির সঙ্গে ঘর করে তার হৃদয় রুক্ষ মরুভূমির ন্যায় দয়ামায়াহীন। তার হৃদয়ের স্বাভাবিক মানবিক বৃত্তিগুলি যেন লুপ্ত হয়ে গেছে। চক্রবর্তী তার স্ত্রীকে রীতিমত ভয় করতে। লাোভী চক্রবর্তীর নিমন্ত্রণ খেয়েও তৃপ্তি হয়নি। রাত্রে স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা নিদ্রাগত হলে মিষ্টি খাওয়ার তীব্র লালসায় মিষ্টান্ন চুরি করে খেয়ে নেয়। চক্রবর্তী খাদ্য লোলুপতা তার গৃহে অশান্তির ঝড় বইয়ে দিল। শ্যামাদাসবাবু চক্রবর্তীর কাছে গৃহিণীর ইচ্ছা প্রকাশ করে তারে সন্তানের জন্মকালে সূতিকাগৃহের দ্বারে থাকার জন্য প্রস্তাব করেন। স্থানীয় প্রথানুযায়ী সূতিকাগৃহের দ্বারে ব্রাক্ষণ রাখা প্রয়োজন। শ্যামাদাসবাবু তাকে আরও জানিয়ে ছিলেন যে, চক্রবর্তীর কল্যাণে সন্তান জীবিত থাকলে তাকে দশ বিঘা জমি দেওয়া হবে এবং সে সিংহবাহিনীর প্রসাদ পাবে। চক্রবর্তী যখন সম্মতি জানিয়ে কথা বলছিল তখন বাবুর ভুক্তাবশিষ্ট থালা নিয়ে চাকর

চলে যাচ্ছিল। চক্রবর্তীর চক্ষু তীব্র লালসায় জ্বলে উঠল এবং চাকরকে ডেকে খাবার খেতে শুরু করল। পরক্ষণে নিজের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হয়ে কাজের ছুতোয় পলায়ন করলো। গৃহে প্রত্যাগমন করে চক্রবর্তী দেখল স্ত্রী হৈমবতী মূর্ছিতা, বড় ছেলে মিষ্টান্ন না পেয়ে তাকে মেরে পলায়ন করেছে। চক্রবর্তী অশ্রু অবরুদ্ধ নয়নে সমস্তই প্রত্যক্ষ করল। সমস্ত দিন পরে এ সপ্ত হলে সে তাকে শ্যামাদাসবাবুর প্রস্তাব জানিয়ে বলল যে, সে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান হবে, কেননা, হৈমরও ঐ সময় সন্তান হবে। হৈম তাতে তীব্র আপত্তি জানিয়ে তাকে প্রস্তাব গের জন্য অনুরোধ করে। শ্রাবণ মাসের প্রথম সপ্তাহে বাবুর বাড়ি থেকে চক্রবর্তীর ডাক এলে শরীর ভালো না থাকা সত্ত্বেও সে জোর করে তাকে পাঠালো। শ্যামাদাসবাবু ব্যস্ত থাকায় ব্যথাসময়ে রান্নাঘরে গিয়ে খেয়ে নিতে বললেন। চক্রবর্তী সোজা রান্নাশালায় গিয়ে ঠাকুরকে বিরক্ত করে যখন আধসেদ্ধ মাংস খাচ্ছিল, তখন তার বড় ছেলে এসে ডাকল এবং জানাল যে ছেলে হয়েছে। বাড়ি এসে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি সম্পূর্ণ করে শ্যামাদাসবাবুর বাড়ি যেতে অস্বীকৃতি জানালে হৈমর তাড়ায় তাকে পুনরায় যেতে হলো। সকালে ফিরে এসে ছেলের জুরের কথা শুনে হৈমর পরামর্শে দুধ সংগ্রহের জন্য জমিদার বাড়িতে গিয়ে ব্যর্থ হলো, বাবুর ছেলের অসুখের কথা তার কর্ণগোচর হলো।

শ্যামাদাসবাবুর নবজাত পুত্রের অসুখের জন্য সদর থেকে বড় ডাক্তার আনা হলেও তিনি কোনো আশা দিতে পারলেন না। আচার পালনের জন্য শিশুকে সূতিকাগৃহের বারান্দায় মৃত্যু প্রতীক্ষায় শুইয়ে দেওয়া হলো; দাই ও ব্রাহ্মণ চক্রবর্তী প্রহরায় রইলো। শ্রাবণ মাসের মেঘাচ্ছন্ন রাত্রিতে ঘন ঘন তামাক সেবন করতে করতে চক্রবর্তী আপন অদৃষ্টের কথা চিন্তা করছিলেন। তার নিজের শিশুটি মারিয়া যদি শ্যামাদাসবাবুর শিশুটি বাঁচতো তবে তার পরিবার উপবাস, ক্ষুধার হাত থেকে মুক্তি পেতো। ঘনান্ধকার আকাশের দিকে স্বীয় তমসাচ্ছন্ন ভাগ্যের কথা চিন্তা করতে করতে পৈতা ধরে শিশুটির ললাট স্পর্শ করতে শিশুটি শিহরিত হলো। সহসা এই শিশুটির পরিবর্তে আপন শিশুটিকে আনয়নের চিন্তা তার মনে উদিত হলো! পাপ যেন মূর্তিমান হয়ে তাকে

আহ্বান করছিলো। সকলের অজ্ঞাতে নিঃশব্দে দ্রুতগতিতে সে তার চিন্তাকে কাজে পরিণত করলো।

সকালে শিশুর ক্রন্দন ধ্বনিত হলে শিবরানী তাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন। সকলে মনে করলো চক্রবর্তীর শিশুর পরমায়ুতে শ্যামাদাসবাবুর শিশুর জীবন রক্ষা হয়েছে। কেননা, চক্রবর্তীর সন্তানটি মারা গেছে। প্রতিশ্রুতিমত চক্রবর্তী জমি পেলো এবং সিংহবাহিনীর প্রসাদ পাওয়ার ব্যবস্থাও হলো। কিন্তু তার স্বভাবজ তীব্র লোভ লালসার পরিবর্তন হলো না। এই ঘটনার প্রায় দশ বছর পরে শিবরানী মারা গেলে শ্যামাদাসবাবু শ্রাদ্ধোপলক্ষে বিপুল আয়োজন আরম্ভ করলেন। চক্রবর্তী প্রায় সবসময় সেখানে থেকে সমস্ত আয়োজন দেখাশোনা করে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিলো এই যে, শ্রাদ্ধের প্রয়োজনে অগ্রদানী ব্রাহ্মণ পাওয়া যাচ্ছিলো না; অকস্মাৎ কে একজন চক্রবর্তীকে অগ্রদানী হওয়ার প্রস্তাব করলে শ্যামাদাবাবু দানসামগ্রীর সঙ্গে পঁচিশ বিঘা এবং বছরে পঞ্চাশ টাকা জমিদারী সম্পত্তির মুনাফা দিতে সম্মত হলে চক্রবর্তী শ্রাদ্ধের দিন আপন পুত্রের কাছ থেকে অগ্রদান গ্রহণ করলো এবং গোশালের বসে গোগ্রাসে পিণ্ড ভোজন করলো। চিরঅতৃপ্ত, আহারলোলুপ চক্রবর্তীর লোভ প্রশমিত হলো না। শিবরানীর মৃত্যুর চোদ্দ বছর পরে শ্যামাদাসবাবুর বংশধরের মৃত্যুতে অগ্রদান গ্রহণের জন্য চক্রবর্তীর কাছে প্রস্তাব এলো। সে বাবার পা জড়িয়ে অগ্রদান গ্রহণ করতে অস্বীতার করলো। কেননা, সে আনে, যার শ্রাদ্ধে অগ্রদানী হিসেবে পিণ্ড ভক্ষণ করতে হবে সে তার আত্মজআপন পুত্র; শ্যামাদাসবাবুর পুত্র নয়। কিন্তু কেন সে অস্বীকার করছে তা বলবার উপায় নেই, , বশবর্তী হয়ে সে একদিন আপন পুত্রকে বিসর্জন দিয়েছিল। আজ তারই শ্রাদ্ধে দান । মর্মান্তিক কাজ নিয়তিন অমোঘ শাস্তির ন্যায় তার উপর নেমে এসেছে। শ্যামাদাবাবু চক্রবর্তী সান্ত্বনা দেবার চেষ্টায় নিজের ও বিধবা পুত্রবধুর কথা বলে একাজের জন্য আর দশ বিঘা দিতে প্রতিশ্রুত হলেন। পিতা যদি স্বয়ং পুত্রের শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করতে পারেন তবে অনাল চক্রবর্তী তার নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করতে পারবে না কেন? কিন্তু তিনি জানতেন না পুত্র তার নয়, পুত্র চক্রবর্তীরই—তাই তার এই করুণ আবেদন। জমিদারের কাছে করুণ প্রার্থনা করে

চক্রবর্তী মুক্তি পেলো না; কেননা সে ধনী শ্যামাদাসবাবুর অন্নদাস। লোভের বশবর্তী হয়ে চব্বিশ বছর আগে সে যে চরম নাতিহীনতার কাজ করে অন্ন সংগ্রাহের ব্যবস্থা করেছিলো আজ তাই যেন আপন পুত্রের শ্রাদ্ধের পিণ্ডাকারে তার সম্মুখে উপস্থিত; আর সেই ভয়ংকর পিণ্ড তাকে গ্রহণ করতে হবে। খাদ্যলোলুপ চক্রবর্তী জীবনে আজ প্রথমে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আলোড়িত -তাই পুরোহিতকে বলতে হলো—খাও হে চক্রবর্তী। যাকে খাওয়ার কথা কোনোদিন স্মরণ করিয়ে দিতে হয়নি, আর পুরোহিতের মুখ দিয়ে যেন নিয়তির সেই অমোঘ শাস্তির বাণী, নির্মম ট্র্যাজেডির নিয়তি নির্ধারিত বাণী উচ্চারিত হলো।

সমালোচ্য 'অগ্রদানী' গল্পটি কোন জাতীয় সে সম্পর্কে সংশয়ের, বিতর্কর অবকাশ আছে। এটি কী চরিত্রপ্রধান ছোটগল্প না আখ্যানধর্মী গল্প। আখ্যানধর্মী গল্পে আখ্যায়িকা মুখ্য— "সংহতি, তীক্ষতা ও ইঙ্গিতমূলক উপসংহারের চেয়ে কাহিনী বর্ণনার মন্থর রীতিটি যেন তার শিল্পীস্বভাবের অনুকূল। * * * প্রকৃতিগতভাবে যারা ঔপন্যাসিক, আখ্যায়িকা (Tale) শ্রেণীর ছোটগল্প রচনার দিকে তাদের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে।" গল্পটির নামকরণে প্রমাণিত যে, খাদ্যলোলুপ উদরসর্বস্ব নীতিহীন পূর্ণ চক্রবর্তীর চরিত্র চিত্রণ আলোচ্য গল্পের মূল লক্ষ।

অবশ্য নামকরণে ঘটনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পূর্ণ চক্রবর্তী পুর্বে অগ্রদানী ব্রাহ্মণ ছিল না, লোভের বশবর্তী হয়ে সে জমিদারপত্নীর শ্রাদ্ধের অগ্রদান গ্রহণ করে সমাজে পতিতরূপে পরিগণিত হয়েছে। জৈব প্রবৃত্তিতাড়িত উদর-সর্বস্ব আত্মকেন্দ্রিক পূর্ণ চক্রবর্তী স্ত্রীপূত্র-পাপপূণ্য ভবিষ্যত ইত্যাদির কথা না ভেবে স্থূল জৈবিক ললাভের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। অপ্রতিরোধ্য জৈবিক লোভের ফলে তাকে অগ্রদানী ব্রাহ্মণরূপ নিজের মৃতপুত্রের পিণ্ড ভক্ষণের মত মর্মান্তিক কাজ করতে হয়েছে। এই পরিণতি অত্যন্ত মর্মান্তিক পরিণতি! সুতরাং চরিত্রচিত্রণ সমালোচ্য গল্পটির মূল লক্ষ হলেও চরিত্রপ্রধান গল্পরূপে 'অগ্রদানী' গল্পটি গড়ে ওঠেনি। গল্পকারের বর্ণনাশক্তিতে, পর্যবেক্ষণে ও সংলাপের বিন্যাসে চক্রবর্তী চরিত্র জীবন্ত ও উজ্জ্বল। কিন্তু অমোঘ নিয়তির নির্দেশে তার মর্মান্তিক পরিণতির ঘটনাই আলোচ্য গল্পে প্রাধান্য লাভ করেছে।

"অগ্রদানী' গল্পের পরিকল্পনাও অভিনব। মানুষের গোপনতম প্রবৃত্তিই যে তার জীবনে নিয়তির ভূমিকা গ্রহণ করে এই গল্পটির নায়ক পূর্ণ চক্রর্তর জীবনের করুণ পরিণতি তারই প্রমাণ। খাদ্যের প্রতি এক সর্বগ্রাসী লোলুপতা বোধই পূর্ণ চক্রবর্তী জীবনের গোপনতম প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তিরূপিণী নিয়তি তাকে সারাজীবন পরিচালিত করেছে এবং শেষ পর্যন্ত অনিবার্য ট্র্যাজেডির দিকে ঠেলে দিয়েছে।" লেখক চমকপ্রদ ঘটনার বিন্যাসে মূল চরিত্রটিকে চরম ট্র্যাজেডির দিকে যেভাবে ঠেলে দিয়েছেন তাতে ঘটনা বা কাহিনীর প্রাধান্য লক্ষগোচর রে প্রাধান্য নয়। আসলে 'অগ্রদানী' গল্পটি বৃত্তান্তবাহী গল্প, এ জাতীয় গল্প মূলত আখ্যায়িকাধর্মী। "আখ্যায়িকা (Tale) প্রসঙ্গে ছোটগল্পের ঘটনার কথা মনে পড়বে। মন্থরগতি 'টেলের'-এর সঙ্গে এক শীর্ষমূলক সংক্ষিপ্ত নাটকীয় গল্পের পার্থক্য আছে। ছোটগল্পে ঘটনা কবে, কিন্তু সেই ঘটনা জটিল ও গুরুভার হবে না। কিন্তু একটি ঘটনা ৰা বৃত্তান্তই ছোটগল্প-র যে কোনো-রকম বৃত্তান্তেই ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যে থাকে না। বৃত্তান্তকেই যদি ছোটগল্প বলা সত। তা হলে আমাদের 'আষ্টাদশ পুরাণ' নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প বলে পরিগণিত হত। যদিও গল্প পিপাসা মানুষের একটি আদিম পিপাসা, তবুও যে কোনোরকম গল্পকেই আধুনিক সমালোচকেরা সার্থক ছোটগল্প বলতে রাজী হবেন না। বৃত্তান্তবাহী ছোটগল্পগুলি প্রকৃতপক্ষে সার্থক ছোটগল্পও নয় কারণ 'বৃত্তান্ত' ভাবায় না, একটি সুলভ সমাপ্তি দিয়ে পাঠকের মনোরঞ্জন করার চেষ্টা করে।" গল্পকার তারাশঙ্কর 'অগ্রদানী' গল্পে পূর্ণ চক্রবর্তীর ট্রাজেডি ঘটানোর জন্য দুটি আকস্মিক ঘটনার সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন গল্পে—প্রথমত, শ্যামদাসবাবুর পত্নী শিবরানীর মৃত্যু এবং দ্বিতীয়ত, শ্যামদাসবাবুর বংশধররূপী চক্রবর্তীর নিজ পুত্রের মৃত্যু। এর জন্য গল্পকারকে কালব্যাপ্তি গ্রহণ করতে হয়েছে এবং পূর্ণ চক্রবর্তীর যৌবন থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত সময়সীমা গ্রহণ করতে হয়েছে। জীবনের খণ্ডাংশকে ধরার যে চেষ্টা আধুনিক ছোটগল্পের অভিপ্রেত বিষয় তা প্রায় এ গল্পে উপেক্ষিত। ছোটগল্পের আঙ্গিকগত বিশিষ্টতা এখানে রক্ষিত হয়েছে বলে মনে হয় না। এমনকি আধুনিক ছোটগল্পের আত্মা রূপে বর্ণিত তীক্ষ্ণাগ্র সাংকেতিকতা ও ব্যঞ্জনধর্মিতাও এখানে অনুপস্থিত। সূচনা-সমাপ্তিহীন, আদি-অন্তহীন ছোটগল্পের চালচিত্রে চকিত বিদ্যুদালোকে জীবনের যে উদ্ভাসন ঘটে তাও এখানে প্রায় নেই বললেই চলে। কাহিনী পরিণাম

এখানে মুখ্য বলে গল্পটিকে চরিত্রপ্রধান আখ্যায়িকাধর্মী বা বৃত্তান্তবাহী গল্প বলাই সঙ্গত।

তারাশঙ্করের গল্পে ভয়ানক রৌদ্ররসের লীলা ব্যতীত নিয়তির এক দুদম রহস্যলীলাও প্রত্যক্ষ করা যায়। "তাঁর প্রতিভাদৃষ্টিতে নকল জীবনের মধ্যেই তিনি একই দুয়ে জীবনশক্তির রহস্যলীলা প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রবৃত্তিরূপে প্রকাশিত মানুষের জীবনে এই জীবনশক্তিকেই তিনি পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়েছেন। * * * তারাশঙ্করের সাহিত্যে এই অখণ্ড মানবজীবনই স্বমহিমায় প্রকাশিত। ভালমন্দবোধের ব্যক্তিসংস্কারের উর্ধ্বে উঠে তিনি জীবনকে তার আপন স্বরূপ উদ্ঘাটিত করেছেন। * * * তারাশঙ্করের সাহিত্যে প্রবৃত্তিই মানুষের নিয়তি। এই প্রবৃত্তির হাত থেকে মানুষের মুক্তি নেই, অমোঘ নিয়তির অনিবার্য পরিণামকে এড়িয়ে যাবার কোন শক্তি নেই তার।" 'অগ্রদানী' গল্পেও এই অমোঘ নিয়তির অনিবার্যতা—তবে এখানে নিয়তির লীলা কার্যকারণ সূত্রে গ্রথিত। ব্রাক্ষণ পূর্ণ চক্রবর্তী জীবনের সর্বস তার রসনাতেই একাগ্রীভূত। সাড়ে ছ' ফুট লম্বা পূর্ণ চক্রবর্তী যেন ভোজন লোলুপতার প্রতিমূত; ভোজনপোলপিতা তার প্রবৃত্তি নয়, একেবারে ধাতুপ্রকৃতি হয়ে উঠেছে। আহারের লোভে সে ব্রাক্ষ্মণ হয়েও অন্যের আচ্ছষ্ট খাবার গোগ্রাসে গিলতে থাকে। 'অগ্রদানী' গল্পের পরিণামরস ভয়ানক না বীভৎস রস তা বিতর্কিত। "কিন্তু মানুষের প্রবৃত্তির লীলা যে কত বিচিত্র এবং ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে আলোচ্য গল্পটি তার প্রমাণ। প্রকৃতপক্ষে এই গল্পটিতেও 'বেদেনী' গল্পটির মতই আদিম প্রবল অপর একটি লীলারহস্য চিত্রিত হয়েছে। 'বেদেনী' গল্পে রাধিকা বেদেনীর কাছে দৈহিক কামনা হল আদিম প্রবৃত্তি আর অগ্রদানী' গল্পের নায়ক পূর্ণ চক্রবর্তীর আদিম প্রবৃত্তি হলে ক্ষুধা।"

'অগ্রগানী' গল্পে ঔদরিক ব্রাক্ষণের গল্প বলা হয়নি; তারাশঙ্করের দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্রে গল্পের প্রথমাংশে পরিবেশিত কৌতুকরস নির্বাসিত হয়ে পরিণতিতে ভয়াবহ নির্মম জীবন-নাট্যের রস পরিবেশিত। সন্তানভাগ্যে ভাগ্যবান পূর্ণ চক্রবর্তী আপন নবজাত শিশুর সঙ্গে প্রভূত ঐশ্বর্যশালী। অথচ পুত্রভাগে বঞ্চিত শ্যামাদাসবাবুর মুমূর্ষ সন্তানের বিনিময় ঘটিয়ে দশ বিঘা জমি ও সিংহবাহিনীর প্রসাদের অধিকারী হয়ে আপন ভাগ্যকে

জয় করতে সচেষ্ট হলো। কিন্তু তাতেও তার লোভের নিবৃত্তি ঘটেনি। "বৃহত্তর প্রাপ্তির প্রলোভনে শ্যামাদাসের স্ত্রীর শ্রাদ্ধে অগ্রদানী সেজে আপন সন্তানের হাত থেকে পিণ্ড গ্রহণ করতে হলো তাকে। কিন্তু এই পাপকর্মা লোভী ব্রাহ্মণের প্রবৃত্তিরূপিণী নিয়তি সর্বশেষে দেখা দিল চরম দণ্ডের আকারে। নিজের যে শিশুটিকে লোভের বশে শ্যামাদাসের সন্তান বলে চালিয়ে দিয়েছিল তারই শ্রাদ্ধে অগ্রদানী সেজে পিণ্ড গ্রহণের আহ্বান এল। নিয়তির এই নির্মম প্রহারে অসহায় মানবাত্মা আর্তনাদ করে উঠেছে। কিন্তু তার অমোঘ বিধানের হাত থেকে মুক্তি নেই। শ্রাদ্ধের দিন গোশালায় বসিয়া বিধবা বন্ধু পিণ্ডপাত্র চক্রবর্তীর হাতে তুলিয়া দিল। পুরোহিত বলিল, খাও হে চক্রবর্তী। পুরোহিতের কণ্ঠে এ যেন নিয়তিরই চরম দণ্ডাদেশ উচ্চারিত হল।"চক্রবর্তীর আদিম প্রবত্তি এই যে ক্ষুধার জন্য শাস্তিরূপে নিয়তির আবির্ভাব মানুষের সেই আদিম প্রবৃত্তিকেই হরপ্রসাদ মিত্র তাঁর তারাশঙ্কর' গ্রন্থে 'Elemental passion' বলেছেন। "এই 'elemental passion' মানুষের মৌলিক বৃত্তি এবং প্রবৃত্তি জীবদেহের মতোই যা তার অস্তিত্বের সহজাত উপাদান, তারই অনাবৃত বস্তু শরীরের ওপরে তারাশঙ্কর সৃষ্টিবেদী রচনা করেছেন। ফলে তার সব গল্পেরই বিষয়বস্তুতে সেই আদিম জীবনস্বভাবের নগ্নরূপ অল্পবিস্তর প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। * * * বস্তুত লোক-স্বভাবের আদিম অপরিশুদ্ধ মাংসল স্থূলতা ও নগ্নতার মধ্যে জীবনের সত্য রসকে আহরণ করার সাধনাই তারাশঙ্করের সাহিত্য ব্রতে মুখ্য প্রয়াস। এই অর্থেই তাঁর 'নারী ও নাগিনী', 'বোবা কান্না', 'দেবতার ব্যাধি', ডাইনী', 'বেদেনী', অগ্রদানী ইত্যাদি গল্পে তান্ত্রিক জীবনরসের রৌদ্র-বীভৎস ভয়ানক স্বাদুতই একান্ত হয়ে উঠেছে।" পরিণতির অসামান্যতায় অগ্রদানী' গল্প অনন্য। লোভের দুর্জয় আকর্ষণ চক্রবর্তীকে রসাতলের শেষ ধাপে এনেছে। নিজের মৃত পুত্রের পিণ্ড হাতে চক্রবর্তী যেন পুরোহিতের বাক্যে শেষ দণ্ডাজ্ঞা উচ্চারিত হতে শুনেছে। বিধবা বন্ধুর হাত থেকে গৃহীত পিণ্ড তারই পুত্রবধূর হাত থেকে গৃহীত এবং তার নিজেরই পুত্রের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। বিমূঢ়চিত্ত চক্রবর্তী এই প্রথম সর্বগ্রাসী খাদ্যলোলুপতা থেকে বিরত—তাই তাকে খাওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হয়। এ যেন। ছোটগল্পের সেই বক্রোক্তি ও আয়রনির অন্তর্ভেদী তীক্ষ্মাতা। "ছোটগল্পের ইঙ্গিতমূলক পরিণতি প্রধানত দু জাতীয় হতে পারে। প্রথমত,

পরিণতির ব্যঞ্জনাধর্মিতা (suggestiveness)! সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে জীবনের মর্মতল আলোকিত হয়। দ্বিতীয়, আর এক শ্রেণীর পরিণতি আছে। যেখানে বক্রোক্তি ও আয়রনির অন্তর্ভেদী তীক্ষ্ণতা শরফলকের মত নির্মম ঔজ্জ্বল্যে জ্বলে ওঠে।

তারাশঙ্করের সুবিখ্যাত গল্প অগ্রদানী'র পরিসমাপ্তি এই ট্র্যাজিক আয়রনির একটি কর উদাহরণ। * * * 'খাও হে চক্রবর্তী' উদরপরায়ণ ব্রাহ্মণের কাছে এই আহ্বানটি যেন য় নিয়তির নিষ্ঠুর বিদ্রুপ-বজ্রবিদ্রুপের অগ্নিরেখায় জ্বালাময়—যেমন বীভৎস তেমনি বে। ছোটগল্পের এই জাতীয় ইঙ্গিতমূলক পরিণতির বাঙলা নামকরণ করা যায় ব্যঞ্জনাগর্ভ উপসংহার ও বক্রোক্তিজীবিত উপসংহার। 'অগ্রদানী' গল্পের শেষতম উচ্চারিত বাক্যে যেন গল্পের সমগ্র রসপ্রবাহ স্তব্ধ হয়ে আছে। গল্প হয়তো খুবই সাধারণ কিন্তু শেষতম বাক্যের সংযক্তিই গল্পটিকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করে তুলেছে—এর বিদ্যুদ্দীপ্ত চকিত উপসংহার নিয়তিরই অট্টহাস্যে উচ্চকিত হয়ে উঠেছে।

পূর্ণ চক্রবর্তীর অগ্রদানী ব্রাহ্মণে পরিণত হওয়ার কাহিনী এবং তার অন্তিম ফলশ্রুতিতে ব্যক্তিজীবনের মর্মন্তুদ ট্র্যাজেডিকে কেন্দ্র করে অগ্রদানী গল্পের সূচনা, ব্যাপ্তি ও পরিণতি। সুতরাং গল্পের নামকরণ পূর্ণ চক্রবর্তী কেন্দ্রিক যেমন তেমনই তার অগ্রদানীতে পরিণত হওয়ার ফলে জীবনে যে অমোঘ নিয়তির নির্মম বিধান নেমে আসে তাকে কেন্দ্র করেও বটে। আলোচনায় প্রথমাংশে অগ্রদানী সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা দেখেছি—মৃত ব্যক্তির শ্রদ্ধাদি কার্যের সময় প্রেতের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত দান যে ব্রাহ্মণ অগ্রে গ্রহণ করে এবং পিণ্ড ভোজন করে তাকে অগ্রদানী বলা হয়। এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ প্রেত সম্পাদনের তিলাদি দান গ্রহণ করে বলে সমাজে পতিত ব্রাহ্মণরূপে পরিগণিত; অথচ অগ্রদানী ব্রাহ্মণ না হলে শ্রাদ্ধও সফল হয় না। নামকরণের মাধ্যমে গল্পকার তাঁর সৃষ্টির বিশেষ উদ্দেশ্য প্রতিফলিত করতে চান।

সাধারণভাবে গল্পের কাহিনীসংস্থান ও ভাবধর্মিতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বিষয়বস্তু, নায়ক-নায়িকা, কেন্দ্রীয় চরিত্র, কাহিনীর কেন্দ্রস্থলে বিরাজিত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, রচয়িতার উপলব্ধিগত জীবনসত্য, লেখকের সৃষ্টিভাবনার দ্যোতক কোনও প্রতীক প্রভৃতি যে কোনো একটিকে অবলম্বন করে স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির নামকরণ করেন। সৃষ্টিশীল

রচনার কেন্দ্রবিন্দু সম্পর্কে পাঠককে আভাস প্রদানের ইচ্ছাও নামকরণের অন্যতম শর্ত। অগ্রদানী' গল্পে পূর্ণ চক্রবর্তী নামে এক উদরসর্বস্ব, পরান্নলোভী, নির্লজ্জ, দীনচিত্ত ব্রাহ্মণের অদৃষ্টের করুণ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্র পূর্ণ চক্রবর্তী; কিন্তু পূর্ণ চক্রবর্তীর অর্থাৎ কেন্দ্রীয় চরিত্রের চরিত্রচিত্রণ গল্পের মৌল বিষয় বিষয় নয়। যদি তাই উদ্দেশ্য হতো তাহলে কেন্দ্রীয় চরিত্রের নামে গল্পের নামকরণ হতো। লোভের অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ কিভাবে পূর্ণ চক্রবর্তীকে নীতি-বোধবির্জিত ব্যক্তিতে পরিণত করেছে এবং তার অস্বাভাবিক চরিত্র কিভাবে তাকে পরিণামহীন মহাভয়ংকরত্বের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে, কী ভয়ংকর শোচনীয় পরিণামে পাঠকচিত্ত শিহরিত হয়, লেখক সেই অন্তিম ঘটনাকেন্দ্রিক নামকরণও করেন নি। গল্পের নামকরণকালে তারাশঙ্কর এমন একটি শব্দ নির্বাচন করেছেন যার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় চরিত্রের আদিম জৈবিক সর্বগ্রাসী লোভ ও তার ভয়ংকর পরিণতির চিত্ত আলোড়নকারী। পরিণামী ব্যঞ্জনা ব্যঞ্জিত হয়েছে। চক্রবর্তী প্রথম থেকেই অগ্রদানী ব্রাহ্মণ ছিল না, ঔদরিক লোভের বশবর্তী হয়ে সে অগ্রদানী ব্রাহ্মণ হয়েছে।

চক্রবর্তীর পুত্র বদলের সাংঘাতিক ঘটনাটি ঘটার প্রায় দশ বছর পরে শ্যামাদাসপত্নী শিবরানীর মৃত্যু হলো, শ্রাদ্ধের জন্য অগ্রদানী ব্রাহ্মণ পাওয়া যাচ্ছিল না; অথচ অগ্রদানী ব্যতীত শ্রাদ্ধ সফল হয় না। তখন চক্রবর্তীকে অগ্রদানী হওয়ার প্রস্তাব জানানো হয় এবং শ্যামাদাসবাদ তাকে পঁচিশ বিঘা জমি ও বছরে পঞ্চাশ টাকা জমিদারী সম্পত্তির মুনাফা প্রদানে প্রতিশ্রুত হলেন। যদিও চক্রবর্তী পূর্বে শ্যামাদাসবাবুর কাছ থেকে আপন সন্তানের বিনিময়ে দশ বিঘা জমি ও সিংহবাহিনীর প্রসাদ লাভ করেছিল। তবুও সে ললাভের প্রতিরোধ করতে পারল না এবং শ্রাদ্ধের দিন আপন পুত্রের হাত থেকে জমিদারপত্নীর পিণ্ড গ্রহণ করে ভোজন করার ফলে অগ্রদানী ব্রাহ্মণে পরিণত হল। কিন্তু এই পাতিত বরণের ফলে যে হীনতা বোধের জন্ম হয় তা চক্রবর্তীর ছিল না। আসলে তার খাদ্যলোলুপতাই তাকে অগ্রদানীতে পরিণত করেছে। জৈবিক তাড়নায় তার মনুষ্যত্ববোধ আচ্ছন্ন ছিল। ভোজের সন্ধান পেলে সে বিনা নিমন্ত্রণে সেখানে হাজির হতো; গৃহকতার পক্ষ থেকে স্বেচ্ছায় গ্রাম-গ্রামান্তর ঘুরে নিমন্ত্রণ করে আসতো।

লোভের তাড়নাতেই সে মুমুর্ষ শিশুপুত্রের সঙ্গে নিজের শিশুসন্তানের বদল ঘটিয়েছে। স্বীয় স্ত্রী পুত্রকে বঞ্চিত করে মিষ্টান্ন গ্রহণে সে ইতস্তত করতো না। প্রকৃতপক্ষে, লোভের জন্যই তার পাপের পথে চক্রমণ এবং আপন পুত্রের হাতে পিণ্ড ভক্ষণের ন্যায় ভয়ংকর পরিণাম। কিন্তু নিজের পুত্রের হাতে পিণ্ড ভক্ষণ করেও চক্রবর্তীর লালসার নিবৃত্তি হয়নি। এর চোদ্দ বছর পরে শ্যামাদাসবাবুর বংশধর-রূপী তার নিজের পুত্রের অকাল মৃত্যুতে তার পিণ্ড ভক্ষণের ভয়াবহ সম্ভাবনায় বিপর্যস্ত ও বিচলিত চক্রবর্তী অন্নদাতার কাছে করুণ আর্তনাদ জানিয়েছে; কিন্তু তার সমস্ত আবেদন ব্যর্থ হয়েছে। জমিদারের অন্নদাস হয়ে সে যে অগ্রদান বৃত্তি গ্রহণ করেছিল তাই তাকে অতলান্ত বিপর্যয়ের সর্বশেষ সীমায় নিয়ে গেছে। শ্রাদ্ধের দিন শ্যামাদাসবাবুর বংশধরের বিধবা পত্নীর কাছ থেকে অর্থাৎ আপন পুত্রবধূর হাত থেকে নিজ পুত্রের পিণ্ড গ্রহণ করতে হয়েছে এবং পুরোহিতের 'খাও হে চক্রবর্তী' সংলাপে যেন নিয়তির চরম বিধানের অতর্কিত মহাবাণী উচ্চারিত হয়েছে এবং চক্রবর্তীর ট্র্যাজেডির ষোলকলা পূর্ণ হয়েছে। অগ্রদানীর দীর্ঘ হাত প্রসারিত করে মৃত পুত্রের পিণ্ড তাকে গ্রহণ করতে হয়েছে। 'অগ্রদানী' নামকরণ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ও তার করুণ পরিণতির ঘটনা উভয়েরই প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে—তাই ও এ জাতীয় নামকরণ সার্থক হয়ে ওঠে গল্পের আবহমণ্ডলে।

সংকেতধর্মিতা, ব্যঞ্জনাবাহিতা ছোটগল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলেও 'অগ্রদানী' গল্পে তার সংকেতধর্মিতা, ব্যঞ্জনবাহিতা সাংকেতিক বাক্যের প্রয়োগ অনুপস্থিত বলা চলে। যে ব্যঞ্জনাধর্মী সমাপ্তি ছোটগল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষণ তার কোনো পরিচয় এখানে নেই। ব্যঞ্জনাময় পরিসমাপ্তির পরিবর্তে এখানে কাহিনী সমধিকভাবে পরিণাম প্রধান। অবশ্য ব্যঞ্জনাধর্মী পরিসমাপ্তি না হলেও অগ্রদানী' গল্পে কয়েকটি এমন ব্যঞ্জনগর্ভ বাক্যের প্রয়োগ ঘটেছে যার মাধ্যমে গল্পটির কেন্দ্রীয় ভাবসত্য পাঠকের গোচরে আসে। কয়েকটি স্মরণীয় বাক্যচিত্রকল্প কিভাবে গল্পের সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত গল্পটিকে একমুখিনতার দিকে নিয়ে গেছে, তার কাহিনী পরিণামকে তীব্র গতিবেগসম্পন্ন করেছে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে নিম্নোক্ত বাক্যবন্ধ-বিশ্লেষণে

১. মায়াহীন অন্তর ও রূপময় কায়া লইয়া হৈম যেন উজ্জ্বল বালুস্তরময়ী মরুভূমি, প্রভাতের পর হইতেই দিবসের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মরুর মতোই প্রখর হইতে প্রখর তর হইয়া ওঠে।

২. বাপ যে চামার, লোভী চামারের ছেলে চাষাও যে হয়েছে, সেটুকুও ভাগ্যি মাননা।

৩. চক্রবর্তীর লোলুপতা অকস্মাৎ যেন সাপের মত বিবর হইতে ফণা বিস্তার করিয়া বাহির হইয়া বিষ উদগার করিল।

৪. 'সে ভাবিতেছিল, বিধিলিপি। তাহার শিশুটা, মরিয়া যদি এটি বাঁচিত, তবে চক্রবর্তী অন্তভ বাঁচিত।

৫. 'সে বসিয়া আকাশজোড়া অন্ধকারের দিকে চাহিয়া আপন ভাগ্যের কথা ভাবিতেছিল। তাহার ভাগ্যাকাশ এমনি অন্ধকার।

৬. অকস্মাৎ সে শিহরিয়া উঠিল। ভয়ে সর্বাঙ্গ তাহার থর থর করিয়া কাপে। না, না, সে হয় না। জানিতে পারিলে সর্বনাশ হইবে। দেখিতে দেখিতে তাহার সঙ্গ ঘামে ভিজিয়া

৭. পুরোহিত বলিল, খাও হে চক্রবর্তী।

প্রথম বাক্যবন্ধে চক্রবর্তী গৃহিণীর রূপ ও প্রকৃতির পরিচয় প্রকাশিত। এই উপমাগর্ভ বাক্যটিতে গল্পকার চক্রবর্তী পত্নী হৈমবতীর চরিত্ররূপ প্রকাশ করেছেন। হৈমবতী রূপসী রমণী, চরম দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ তাকে ম্লান করেনি। শীর্ণদেহ, রুক্ষকেশ এবং ছিন্নবস্ত্র সত্ত্বেও। তাকে দেবী দুর্গার মত মনে হয়। কিন্তু দেহ সৌন্দর্য থাকলে কী হবে তার অন্তর বিশুষ্ক; দারিদ্র্যের নিদারুণ উত্তাপে তার অন্তরের সুকুমার বৃত্তিগুলি আর নেই। শুধু দারিদ্র্যই নয় চক্রবর্তীর ন্যায় উদর সর্বস্ব। খাদ্যলোলুপ জৈবিক বৃত্তির দ্বারা পরিচালিত মানুষের সঙ্গে বস করতে করতে হৈমবতীর নারীর স্বাভাবিক কোমল বৃত্তিগুলির বিকাশ ব্যাহভ হয়েছে, তার পরিবর্তে তীব্র তিক্ততা সমগ্র চিত্তকে অধিকার করেছে। গল্পকার তার শৈল্পিক দৃষ্টিতে হৈমবতীকে বালুকার স্তরে স্তরে আচ্ছাদিত মরুভূমির সঙ্গে উপমিত করেছেন। বালুকাস্তরে আলোক প্রতিফলিত হয়ে যে ঔজ্জ্বল্যের সৃষ্টি করে তা সৌন্দর্য পিপাসাকে মুগ্ধ করলেও, ঔজ্জ্বল্যের অন্তরালে থাকে শুষ্ক জলহীন

বালুকাময় বন্ধ্যত্ব। হৈমর দেহসৌন্দর্য মরুভূমির বহিরঙ্গ ঔজ্জ্বল্যের ন্যায়; সংসার ও জীবন সম্পর্কে একটা তীব্র তিক্ততা ও হতাশা হৈমর চিত্তকে এমনই আচ্ছন্ন করেছে যে দিবসের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যতাপে বালুকারাশি যেমন উত্তপ্ত হতে থাকে সেই রকম দিন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্য, হতাশা, স্বামীর উদরসর্বস্বতা, জান্তবতা সন্তানদের ইতরতার ফলে হৈমবতী তার জীবনের ব্যর্থতাবোধের বেদনায় তিক্ততায় প্রখরতর হয়ে ওঠে। সার্থক উপপ্রয়োগে হৈমবতী চরিত্রের এমন অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ বিশ্লেষণ তারাশঙ্করের শৈল্পিক নিপুণতারক পরিচয় বহন করে।

দ্বিতীয় বাক্যবন্ধে হৈমবতী চরিত্রের যে তিক্ততার প্রকাশ ঘটেছে তাকে স্বামীর চরিত্র সম্পর্কে তীব্র ক্ষোভের প্রকাশ বলা চলে। স্বামীকে 'লোভী চামার' বলার মাধ্যমে তার ঔদরিকতা, মানবিক বৃত্তিহীনতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। চক্রবর্তীর আত্মসর্বস্ব হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতা প্রতি ইঙ্গিত প্রদাস করা হয়েছে 'চামার' শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে। হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার আত্মসর্বস্ব ব্যক্তির পুত্রের পক্ষে অসভ্য ও ইতর হওয়াই স্বাভাবিক। তবে চামার অপেক্ষা চাষা হওয়া ভালো বলে মনে করে হৈমবতী। তার পুত্র পিতা পূর্ণ চক্রবর্তীর ন্যায় সম্পূর্ণ অমানুষ হয়নি— এটাই সান্ত্বনা। চাষা হওয়া হৈমবতীর কাছে অনেক গ্রহণীয়; কেননা, চাষা অন্তত আত্মসর্বস্ব, খাদ্যলোলুপ, উদরপরায়ণ, মনুষ্যত্বহীন নয়।

তৃতীয় বাক্যে উদরসর্বস্ব, খাদ্যলোলুপ, আত্মপরায়ণ, নির্লজ্জ, হীনচিত্ত, পাপাচারী চক্রবর্তী চরিত্রের রূপটি চিত্রিত। কিভাবে পূর্ণ চক্রবর্তীর অমানবিকতা তাকে লোভী করে তুলেছে, আপন সন্তান সম্পর্কে মায়ামমতাহীন করে তুলেছে তারই অবিস্মরণীর চিত্র আলোচ্য বাক্যাংশে উপস্থাপিত। আদিম বৃত্তির লীলা ব্যক্তি চরিত্রে যে কত ভয়াবহরূপে প্রকাশিত হতে পারে এখানে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সামনে খাদ্য দেখলেই চক্রবর্তীর অপ্রতিরোধ্য লুব্ধতা সহসা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলত এবং সে সমস্ত বিচার শক্তিহীন লোলুপতার মূর্তিতে পরিণত হতো। পূর্ণ চক্রবর্তীর এই সর্বনাশা লোভ গল্পকারের দৃষ্টিতে বিবরের সাপের সঙ্গে তুলনীয়। ক্রুদ্ধ সাপ যেমন বিবর থেকে

বহির্গত হয়ে বিষ উপ্পারণ করে তেমনি চক্রবর্তীর লোভ লোলুপতা সমস্ত লজ্জা-শোভনতা সম্মান ইত্যাদি যেন বিধ্বস্ত করে দিত। সর্বগ্রাসী খাদ্যলোলুপতার এই যে আদিম জান্তবতা তা যেন বিবর-বাসী ক্রুদ্ধ সাপের অকস্মাৎ বিষ উদগারণ। তারাশঙ্কর অসামান্য লিপিকৌশলে চক্রবর্তী চরিত্র রূপায়ণে তার দক্ষতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

চতুর্থ বাক্যবন্ধেপূর্ণ চক্রবর্তীর অন্যতর মানসিকতার প্রকাশ। উদরসর্বস্ব ব্রাহ্মণের অপ্রতিরোধ্য পাশব লোভের ফলে তার পুত্রের বেঁচে থাকা এবং শ্যামাদাসের পুত্রের মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার মধ্যে নির্মম নিয়তির সাক্ষাৎ লাভ করেছিল। অর্থনৈতিক দুর্দশার ফলে পিতৃসত্তাসম্পন্ন ব্যক্তি কীভাবে আপন পুত্রের মৃত্যু কল্পনা করতে পারে তা সত্যই বিস্ময়ের। চক্রবর্তীর গৃহে নিষ্ঠর দারিদ্রের মধ্যে তার পুত্রের আবির্ভাব ঘটেছে, এবং এ আবিভাব অবাঞ্ছিত। আর মাদাসবাবুর ন্যায় ধনীর গৃহে পুত্র হয়েও বাঁচে না। সুতরাং 'বিধিলিপি'র ভূমিকা দুদিকেই বিবাপ্ত। শ্যামাদাসবাবুর জীবনের সঙ্গে চক্রবর্তীর জীবন যেন কোন অচ্ছেদ্যবন্ধন সূত্রে জড়িত। যদি চক্রবর্তীর পুত্রের পরিবর্তে শ্যামাদাসবাবুর পুত্রের জীবনরক্ষা হতো তবে চক্রবর্তীর সংসারে অর্থনৈতিক মুক্তির স্বাদ ফিরে আসতো। কিন্তু তা হওয়ার নয়; চক্রবর্তীর অদৃষ্ট যদি সপ্রসন্ন হতো তবে শ্যামাদাসবাবুর গৃহিণী শিবরাণীর নবজাতক বেঁচে যেত। চক্রবর্তীর দভাগ্য যেমন অপরিবর্তনীয়, অনড়, অচল; তেমনি শ্যামাদাসবাবুর পুত্রের মৃত্যু অনিবার্য, অচ্ছেদ্য নিয়তি সূত্রে উভয়ে বাঁধা।

পঞ্চম বাক্যবন্ধে আপিন ভাগ্যের ভাবনায় ভাবিত চক্রবর্তীর বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার রাত্রিতে সূতিকাগারের বারান্দায় বসে নিদ্রাহীন চক্রবর্তী মনে মনে আপন দুভার্গের দুরদৃষ্টের পর্যালোচনায় রত। তার মনে হয়েছিল শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন, তমসাচ্ছন্ন রাত্রির ন্যায় তার ভাগ্যাকাশও অন্ধকারাচ্ছন্ন। শ্যামাদাসবাবুর প্রস্তাব সেই নিচ্ছিদ্র অন্ধকারে ক্ষীণ রশ্মির আকাশ সৃষ্টি করলেও পুনরায় তা আবার গহন গভীর অন্ধকারেই নিমজ্জিত হয়; কেননা, চক্রবর্তী বুঝতে পেরেছিল যে, শ্যামাদাসবাবুর সন্তানের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আলোচ্য বাক্যাংশে তারাশঙ্করের বর্ণনানৈপূণ্যের পরিচয় লক্ষ করা যায়। প্রকৃতির পটভূমিকায় মানবচিত্তের ব্যাখ্যা ও

প্রকৃতির সঙ্গে মানবচিত্তের সাযুজ্য সৃষ্টি করে তিনি তার অবস্থানটিকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছেন।

ষষ্ঠ বাক্যবন্ধে গল্পকার এক নাটকীয় পরিস্থিত সৃষ্টি করেছেন। এখানে লেখক পূর্ণ চক্রবর্তীর মানসিক অবস্থা চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছে চক্রবর্তীর মানসিকতা ও স্নায়বিক উত্তেজনার বিবরণ প্রদানান্তে তিনি নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টির সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন।

সপ্তম বাক্যবন্ধে উদরসর্বস্ব, খাদ্যলোলুপ, নির্লজ্জ, হীনচিত্ত ব্রাহ্মণ পূর্ণ চক্রবর্তীর জান্তব লালসাতাড়িত চরিত্র ও তার ভয়ঙ্কর পরিণতি কী নিদারূণ ট্র্যাজেডির সৃষ্টি করতে পারে তার স্থিরচিত্র প্রকাশিত। লোভের দুর্জয় আকর্ষণ যে চক্রবর্তীকে রসাতলের শেষ ধাপে নিয়ে গেছে, অন্তহীন অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত করেছে —এখানে যেন তারই শৈল্পিক প্রকাশ। নিজের মৃত পুত্রের পিণ্ড হাতে নিয়ে চক্রবর্তী যেন পুরোহিতের বাক্যে নিয়তির নিষ্ঠুর ক্ষমাহীন দণ্ডাজ্ঞা উচ্চারিত হতে শুনেছে। যে বিধবা বধূর হাত থেকে সে পিণ্ড গ্রহণ করেছে সে তারই পুত্রবধূ এবং গৃহীত পিণ্ড তার পুত্রেরই উদ্দেশে প্রদত্ত। বিমূঢ়চিত্ত চক্রবর্তী প্রসারিত হস্তে আপন পুত্রের পিণ্ড হাতে নিয়ে স্তব্ধবাক, নিশ্চল; তাই পুরোহিতকে তাকে খাওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হয়েছে এই প্রথম তার খাদ্যলোলুপতার নিবৃত্তি হয়েছে। গল্পকার যেন তান্ত্রিসুলভ নিরাসক্তিতে অর্থগুঢ় সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মাধ্যমে নিয়তির অমোঘ অনিবার্যতা প্রকাশ করেছেন। এখানে লেখকের শিল্পীসত্তার সংযত নৈর্ব্যক্তিক প্রকাশ লক্ষণীয়।

গল্পকার তারাশঙ্কর 'অগ্রদানী' গল্পটিকে চরিত্রপ্রধান গল্পরূপে গড়ে তুলতে চেয়েছেন, গল্পটির নামকরণ এই বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়। উদরসর্বস্ব, খাদ্যলোলুপ, লোভী নির্লজ্জ, ন্যায়নীতিবর্জিত, হীনচিত্ত ব্রাহ্মণ পূর্ণ চক্রবর্তীর এখানে কাহিনী বা ঘটনার যথাযথ প্রাধান্য অনুপস্থিত নয়। লেখকের বর্ণনাশক্তিতে, নির্বাচিত ঘটনার যথাযথ উপস্থাপনে এবং চরিত্রোচিত সংলাপ বিন্যাসে চক্রবর্তী চরিত্র ও অন্যান্য অপ্রধান চরিত্রগুলি জীবন্ত ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কিন্তু নিয়তির যে অনিবার্য বিধান এবং তার ফলে যে মর্মান্তিক পরিণতি গল্পটির পরিণামী রস আলোচ্য গল্পে কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে

লেখক তারও যথাযথ আয়োজন করেছেন এবং মর্মান্তিক পরিণতির এই অনিবার্যতা কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে পাঠকচিত্তকে অধিকার করে। পূর্ণ চক্রবর্তী পূর্বে অগ্রদানী ব্রাহ্মণ না থাকলেও নানা অবস্থার ফলে সে পরিস্থিতির শিকার হয়েছে। দারিদ্রের নির্মম নিষ্করুণ থেকে বাঁচার তাগিদে ও সন্তানদের বাঁচানোর তাগিদেই তাকে শেষ পর্যন্ত অগ্রদানী ব্রাহ্মণ হতে হয়েছে। অবশ্য এর জন্য তার লোলুপতাকেও দায়ী করা চলে। কিন্তু ভরসর্বস্বতা, লোলুপতা, খাদ্যের প্রতি সীমাহীন লোভ ইত্যাদি যে তাকে শেষ পর্যন্ত মর্মান্তিক পিরণতির শেষ সোপানে নিয়ে যাবে এমন ভাবা যায় না। গল্পের অন্তিম পরিণামে দেখি, চক্রবর্তীর অপ্রতিরোধ্য জৈবিক লোভ তাকে অগ্রদানী ব্রাহ্মণরূপে মৃতপুত্রের পিণ্ড গ্রহণের নমান্তিক পরিণতিতে পৌঁছে দিয়েছে। চরিত্রটি অন্তর্নিহিত দুর্বলতাই তার ট্র্যাজেডির একমাত্র শরণ নয়। জমিদার বংশধররূপী, আপন পুত্রের অকালমৃত্যুর বহিরঙ্গ ঘটনাও তার ট্র্যাজেডির যে দায়ী তা সম্ভবক অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং গল্পে অন্তর্নিহিত দুর্বলতার চেয়ে ঘটনা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। অতএব গল্পটিকে শুধুই বৃত্তান্তধর্মী বা আখ্যানধর্মী গল্প বলা না তাও সংশয়ের। চক্রবর্তী চরিত্রের ট্র্যাজেডি ঘটানোর জন্য গল্পকার যে সমস্ত ঘটনার আয়োজন করেছেন। তার মধ্যে শিবরানীর মৃত্যু অন্যতম। ছোটগল্পরূপে গড়ে তোলার গঠন পরিকল্পনায় 'অগ্রদানী' গল্পে আংশিক ত্রুটি সংলক্ষ। জীবনের খণ্ডাংশন ধরার যে চেষ্টা ছোটগল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এখানে তারও বিচ্যুতি আছে। সমালোচ্য গল্প চক্রবর্তীর যৌবন থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত প্রায় তিরিশ বছরের দীর্ঘ সময়সীমা ব্যাপ্তির দিক থেকে খণ্ডাংশের রূপায়ণকে বোঝায় না।

আধুনিক ছোটগল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ইঙ্গিতধর্মিতা বা ব্যঞ্জনাধর্মী পরিণাম। অগ্রদানী গল্পে সেই ব্যঞ্জনাধর্মির্তা অনুপস্থিত। আধুনিক ছোটগল্প যে 'শেষ হয়ে হইল না শেষ'— এখানে তার কোনো অতৃপ্তির ব্যঞ্জনবোধ নেই। 'অগ্রদানী' গল্পে কাহিনী পরিণাম এতই প্রধান যে পাঠকের আর কিছুই জানার থাকে না, তবে চক্রবর্তীর ভয়ংকর পরিণাম পাঠকচিত্তে সে আলোড়ন সৃষ্টি করে তাকে পরিণানী ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ না বললেও রসসমৃদ্ধ পরিণাম বলা যেতে পারে। আর এই রসসমৃদ্ধ পরিণাম যে কোনো শিল্পের ন্যায় ছোটগল্পেরও অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'অগ্রদানী' গল্পে সংকেতধর্মিতা না থাকলেও উদ্দেশ্যের

একমুখিনতা আছে—যাকে ছোটগল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। গল্পের চরম পরিণতির দিকে দৃষ্টিপাত করেই জন্য একমুখী ঘটনার আয়োজন করেছেন। চরিত্রটিকে চরম পরিণতিতে নিয়ে যাওয়াই গল্পকারের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং তিনি সে উদ্দেশ্য মুহূর্তের জন্য বিস্মৃত হননি। ফলে উদ্দেশ্যের একমুখিনতায় গল্পটিকে সার্থক বলতে হবে। অন্যান্য চরিত্র ও আনুষঙ্গিক ঘটনা সমালোচ্য চরিত্রপ্রধান একমুখী গল্পের সহায়ক সর্তরূপে উপস্থিত। সর্বপরি আলোচ্য গল্পে আছে লেখকের অসাধারণ শিল্পনৈপূণ্য, যা গল্পটিকে অন্যতম ছোটগল্পে পরিণত করেছে। সর্বগ্রাসী জান্তব লোভ যে ব্যক্তিমানুষকে সর্বনাশের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করে গল্পকার সেই সত্যের প্রতি অঙ্গুলি-নিদের্শ করে ছোটগল্পের কারুকৃতিকে অসাধারণ শিল্পাদর্শে প্রতিষ্ঠিত করেছেন— "আদিম বৃত্তির লীলা আর একদিক থেকে চরমরূপে প্রকাশ পেয়েছে তারাশঙ্করের বিখ্যাত 'অগ্রদানী' গল্পে, উদরসর্বস্ব, নির্লজ্জ, হীনচিত্ত, পূর্ণ চক্রবর্তীর যে পরিণাম এতে দেখানো হয়েছে তা যেমন কুৎসিত, তেমনি কল্পনাতীতরূপে ভয়ঙ্কর। লোভের দুর্জয় আকর্ষণে বিমূঢ়চিত্ত চক্রবর্তী রসাতলের শেষ ধাপে নেমেছে—সিংহবাহিনীর অমৃতবৎ ভোগ পরিণামে নিজ পুত্রের বিষাক্ত পিণ্ড হয়ে চক্রবর্তীর গলায় প্রবেশ করেছে। এই গল্পে লেখক সীমাহীন এক নিষ্ঠুর বিচারকের ভূমিকায় চক্রবর্তীর ওপর নিষ্ঠুরতম দণ্ড বিধান করেছেন। *** অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তিমান কোনো লেখক কিছুতেই নির্মমতার এই স্তরে নামতে পারতেন না। কিন্তু তারাশঙ্করের লেখনী অকম্পিত। তান্ত্রিকসুলভ নিরাসক্তি নিয়ে তিনি লোভের খঙ্গে চক্রবর্তীকে বলি দিয়েছেন। গল্পটি তার নির্ভীক শিল্পিসত্তার আর একটি নির্ভুল নিদর্শন।"

'অগ্রদানী' গল্পে, তারাশঙ্করের অন্যান্য অনেক গল্পের মত আদিম জৈব আবেগের তীব্রতা, এলিমেন্টাল প্যাসনের নগ্নরূপ প্রকাশিত। তরক সৃষ্ট প্রধান চরিত্রগুলির অধিকাংশই কদাকার, কুৎসিত, আদিম, জৈবিক প্রবৃত্তির দ্বারা যেমন পরিচালিত, তেমনি আবার সরলতায় উজ্জ্বলও বটে। তাঁর সৃষ্টির জগতে এমন অনেক চরিত্র আছে যেগুলি জান্তব প্রবৃত্তির সার্ধম্যে পশুজগতের সমগোত্রীয়ও। 'অগ্রদানী' গল্পের চক্রবর্তী চরিত্রে জৈবিক তাড়নার এই ভয়ংকর রূপটি অতি নগ্নভাবে প্রকাশিত। 'অগ্রদানী' গল্পে

এলিমেন্টাল প্যাসন-এর এই যে তীব্র, নগ্ন, সর্বগ্রাসী, বীভৎস রূপ প্রকাশিত তা একমাত্র তুলনীয় হতে পারে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাগৈতিহাসিক গল্পের ভিখু চরিত্রের সঙ্গে। উভয় ক্ষেত্রেই শিল্পীর নৈর্ব্যক্তিক নিরাসক্তি অনন্য। স্বাভাবিকভাবে এই জাতিয় গল্পের পরিণামী রস, চরিত্র, আনুষঙ্গিক ঘটনা স্বভাববিকৃত হয়। এই স্বভাববিকৃতির দিকে লক্ষ রেখেই বোধ হয় কেউ কেউ 'অগ্রদানী' গল্পে 'মর্বিডিটির' প্রকাশ লক্ষ করেছেন।

ঐ গল্পের বিষয়বস্তুতে মর্বিডিটি থাকলেও এর গঠনকৌশলের নিপুণতা স্বীকার্য। নাম গল্পটিতে তারাশঙ্করের অন্যান্য গল্পের ন্যায় নাটকীয়তার যথাযথ প্রকাশ লক্ষ করা যায়। গল্পটি নাট্যলক্ষণক্রান্ত এবং নাটক ও নাটকীয়তার উপাদানে আকর্ষণীয় এবং উপভোগ্য। ক্রিয়া ও সংলাপ নাটকের যেমন প্রধান উপাদান তেমনি অপ্রত্যাশিতের আঘাতে অভ্যস্ত বনের বিপর্যয়—নাটকীয়তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'অগ্রদানী' গল্পে নাটিক ক্রিয়া ও সংলাপের অন্তরালভাবে আছে আকস্মিক ঘটনাপুঞ্জের তীব্রতা, চরিত্রে ব্যর্থ জীবনের হাহাকার, সন্তান মোহের তীব্র আকুলতা, আত্মরক্ষার জৈবিক আকাঙক্ষা, সর্বোপরি অন্তিমে নাটকীয় চমকের নবতম আঘাত। সমস্ত কিছুর অন্তরালে আছে গল্পকারের নৈর্ব্যক্তিকতা, অসাধারণ সংযম, নির্বচিত ঘটনার মাধ্যমে মূল চরিত্রকে ঘটনার অনিবার্য ভয়ঙ্কর পরিস্থিতের সামনে দাঁড় করাননা। অমোঘ নিয়তি এমন দুরতিক্রম্য অনিবার্য বিধান বাংলা সাহিত্যে সত্যই দুর্লভ। 'নির্মমতায় ও কুটিল আয়রণির মর্মান্তিকতায় বাংলা সাহিত্যে অগ্রদানী তুলনাহীন'—এ মন্তব্য যথার্থ। তীক্ষ্নতায় ও বিদ্যুদ্দীপ্ত চকিত উপসংহারে নিয়তির অট্টবজ্রহস্য যেভাবে 'অগ্রদনী' গল্পে প্রতিধ্বনিত হয়েছে তা তারাশঙ্করের 'তান্ত্রিকসুলভ নিরাসক্তির' ফলশ্রুতি।

৫.৫ অনুশীলনী

১। 'বেদেনী' গল্পে জৈব প্রবৃত্তির প্রাবল্য কিভাবে ধরা পড়েছে আলোচনা করো।

২। 'বেদেনী' গল্পের যে সমাজ চিত্র ধরা পড়ে তা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখ।

৩। ছোটগল্প হিসেবে 'ডাইনি' গল্পের সার্থকতা আলোচনা করো।

৪। 'ডাইনি' গল্পটি কতদূর সার্থক নারী জীবনের ট্রাজেডি হয়ে উঠেছে বর্ণনা করো।

৫। 'পৌষলক্ষী' গল্পের মুকুন্দ চরিত্রটি সম্পর্কে লেখ।

৬। 'অগ্রদানী' শব্দের অর্থ কি? 'অগ্রদানী' গল্পের নামকরণ কতদূর সার্থক হয়েছে আলোচনা করো।

৭। 'অগ্রদানী' গল্পে কতদূর ভয়ানক রুদ্ররোষ পরিলক্ষিত হয় আলোচনা করো।

৮। ছোটগল্প হিসেবে অগ্রদানী সার্থকতা লেখ।

৯। 'অগ্রদানী' গল্পের পূর্ণ চক্রবর্তী চরিত্রটি ব্যাখ্যা করো।

৫.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১। তারাশঙ্করের গল্পপঞ্চাশৎ, ভূমিকা।

২। আমার সাহিত্যজীবন -তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩। পরিচয়, পুস্তক পরিচয়, পৌষ ১৩৫৪।

৪। বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ধারা, মার্কসবাদী, ১ম সংকলন, অক্টোবর ১৯৪৮।

৫। আমার কালের কথা; তারাশঙ্কর স্মৃতিকথা, প্রথম খণ্ড।

৬। বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার

৭। বাংলা গল্প-বিচিত্রা

৮। বাংলা উপন্যাসের ধারা, অচ্যুত গোস্বামী

৯। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বাংলা গল্পবিচিত্রা

১০। জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ, প্রথম খণ্ড,

১১। গল্পগুচ্ছ-এপ্রিল-জুন-১৯৯৮ সম্পাদক-অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়। তারাশঙ্করের ছোটগল্পে মানুষ,

১২। শিল্পরূপ তারাশঙ্করের ছোটগল্প-প্রবন্ধ-হীরেন চট্টোপাধ্যায়

১৩। সাহিত্যে ছোটগল্প নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ

১৪। তারাশঙ্কর দেশকাল সাহিত্য ও সম্পাদনা-উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, পুস্তক বিপনি।

১৫। সাহিত্য ও সংস্কৃতি-সঞ্জীব কুমার বসু, তারাশঙ্কর সংখ্যা, বৈশাখ-আশাঢ় -১৩৭৯।

একক ৬ তারাশঙ্করের নির্বাচিত দুটি গল্প – পদ্মবউ, খাজাঞ্চিবাবু

বিন্যাসক্রম

৬.১ পদ্মবউ

৬.২ খাজাঞ্চিবাবু

৬.৩ অনুশীলনী

৬.৪ গ্রন্থপঞ্জি

৬.১ পদ্মবউ : পাঠকের দর্পণে

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্র পরবর্তী কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে এক অন্যতম বিশেষ কল্লোলযুগের অচিন্ত্য সেনগুপ্ত তারাশঙ্করের সাহিত্য সম্পর্কে বলেছেন, তার সাহিত্যের দুই প্রধান উপজীব্য—মাটি আর মানুষ। মাটির মমত্ব আর মানুষের মহিমা।' (কালি ও কলম: ১৩৭৮)। একথা যে যথার্থ তা আমরা তাঁর কথাসাহিত্যের বিশাল সম্ভারের দিকে মষ্টি রাখলে সহজেই বুঝে যাই। বলতে গেলে তারাশঙ্করবাবু সমাজ ও ব্যক্তিজীবনকে অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে সব সময় দেখার চেষ্টা করেছেন। আর এ জন্য তাঁর হাতে বাঙালি সমাজ জীবনের চবি চরিত্র ও ঘটনাগত পারম্পর্যে প্রাণবন্ত হয়ে চিত্রিত হয়েছে, যার সত্যিই তুলনা মেলা ভার। তারাশঙ্করের হাতেই বাংলা সাহিত্যের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে বলা যায়। জানিনা, এ কারণে শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র গুপ্ত মহাশয় এক সাহিত্য সভায় তারাশঙ্করবাবুকে 'বঙ্গ সরস্বতীর খাসতালুকের মন্ডল প্রজা' আখ্যা দিয়েছিলেন কিনা! তবে, বাংলা কথাসাহিত্যে তারাশঙ্কর যে নিজস্ব একটা খাসতালুক গড়ে তুলেছিলেন তা একবাক্যে মেনে নিতেই হয়। রাঢ় বাংলার রুক্ষ মাটি ও সমাজবদ্ধ মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গে তাঁর যে অন্তরে একটা নাড়ির টান ছিল তা তাঁর

অধিকাংশ গল্পেই লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে সংসারজীবনে সুখ-দুঃখ মিলন বিচ্ছেদের ব্যাপারগুলি লক্ষ করা যায় নানান প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে তাঁর গল্পে বার বার উঠে এসেছে। কখনো তা সামাজিক প্রেক্ষাপটে, কখনো অর্থনৈতিক পিষ্টনে সংস্কারবদ্ধতার ঘেরাটোপে। এজন্য স্বভাবতই তাঁর ছোটগল্প-র ক্ষেএ মূলত ট্রাজেডি রসের।'পদ্মবউ' গল্পটি যার অন্যথা নয়।

বিশিষ্ট সাহিত্যরসিক জগদীশ ভট্টাচার্য মহাশয় 'পদ্মবউ' গল্পটির উপসংহার সম্পর্কে অবাস্তব' ব্যাপার পরীলক্ষিত করুন না কেন—গল্পটি যে ট্রাজেডি রসে শেষমেষ পাঠকহৃদয়কে দুলিয়ে দিয়ে যায় এক জীবনজিজ্ঞেসার মুখোমুখি আমাদের দাঁড় করিয়ে আমারা তা অস্বীকার করতে পারিনা। সেযুগে সমাজবদ্ধ মানবজীবনে কুষ্ঠরোগীদের জীবন কেমন যন্ত্রণাময় ও একইসঙ্গে কুসংস্কারবর্ণত সমাজে তারা কেমন ঘৃণার পাত্র ও অচ্ছুত ছিল তা তারাশঙ্করবাবু আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে কেবল দেখিয়েই দেননি, কোনো করুনার হাতও তাদের দিকে এগিয়ে আসত না তার নির্মম বাস্তবসত্য-ছবি আমাদের কাছে তুলে ধরে পরক্ষণে আমাদেরসে বিবেক দংশনে তাড়িত করে ছেন। ভাবলে সত্যিই অবাক হতে হয়—সেযুগটা কেমন অবৈজ্ঞানিক কুসংস্কার আচ্ছন্ন ছিল। এমনকি, সেকালের গ্রামে যারা চিকিৎসার কার্যে ব্রতী ছিলেন, তাঁদের মধ্যেও ছিল এ সংস্কারবোধ। তা নাহলে এক নতুন পাস করা ডাক্তার কুষ্ঠরোগাক্রান্ত শিক্ষক মশায়কে দেখে শিউরে উঠে বাবুদের বৈঠকখানায় এ কথা বললেন কেন—এ করেছেন কি গয়? এই সব নীরোগ শিশু, এদের দেহে এই বয়স থেকে লেপ্রসির বীজ ঢুকলে আর রক্ষে হে? কুষ্ঠরোগ যে ছোঁয়াচে। এমনকি এও বলেন, ওর ইনফেকশন হয় নিঃশ্বাসের সঙ্গে নাকের মধ্যেই রোগটার প্রথম সূত্রপাত।

"জলসাঘর" গল্প সংকলনের অন্তর্ভুক্ত 'পদ্মবউ' গল্পটিতে লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ উজ্জ্বল প্রতিভার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। এই গল্পের নায়ক পাঠশালার পন্ডিত চন্দ্রমশাই। নায়িকা হলে চন্দ্রমশাইয়ের স্ত্রী পদ্মবউ। গল্পটির কাহিনী এরকম :

পাঠশালার পন্ডিত চন্দ্রমশায়ের সর্বাঙ্গে একদিন নিষ্ঠুর কুষ্ঠব্যাধির আক্রমণ প্রকট হয়। ফলত তাঁর দেহবিকৃতির জন্য পাঠশালার পড়তে আসা শিশুরা আতঙ্কিত হয়ে ওঠে।

বালক কিশোরেরাও ভয় পায়। তবু কিন্তু চন্দ্রমশায়ের পাঠশালা চলে। পাঠশালা চলার কারণ ভাষ শিক্ষাদেবার পটুত্ব, সর্বোপরি তার জ্ঞানস্পৃহা প্রবল বলে। বলতে গেলে পাঠশালাই তার ধ্যানজ্ঞান। নিজের অবলম্বন বলতে এই পাঠশালা, পুস্তক আর তার স্ত্রী পদ্মবউ। কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হওয়ার জন্য বাইরে বার হন না। কেউ দেখা করতে এলে নিজেকে তার কেমন যেন অপরাধী বলে মনে হয়।

পাঠশালায় স্বামীর সঙ্গে পদ্মবউও ছাত্রদের পড়িয়ে থাকেন। এমনিতে পদ্মবউ ছাত্রবৃত্তি পাশ করা মেয়ে হওয়ার জন্য চন্দ্রমশায় না করেন না। পদ্মবউ পাঠশালায় ছোটছেলেদের পড়ানোর জন্য চন্দ্রমহাশয় বড়দের দিকে নজর দেন। অবশ্য পদ্মবউ ববাবর স্বামীর প্রতি এমন সহৃদয় ছিলেন না। বলা ভালো স্বামীর প্রতি এমন উদার ছিলেন না। বিশেষ করে স্বামীর যখন শরীরে কুষ্ঠরোগ দেখা দেয়। তখন সোজা স্বামীর শরীরে কুষ্ঠরোগের বীভৎসতা দেখে ভয়। পেয়ে বাপের বাড়ি পালিয়ে যান। পদ্মবউয়ের বাবা কিন্তু পদ্মবউয়ের পালিয়ে-আসা ব্যাপারটাকে মেনে নিলেন না। নানাভাবে পদ্মবউকে বোঝাতে থাকেন। এমনকি এও বলেন নিতান্ত মন্দভাগ্য ও পূর্বজন্মের বহু খারাপ কর্ম না থাকলে রোগ হয় না। পদ্ম যদি নিজেই ঘৃণা করে স্বামীকে পরিত্যাগ করে তাহলে ফলস্বরূপ পরজন্মে সাধারণত হয়তো এরকম দুরারোগ্য ব্যাধির কবলে পড়তে হতে পারে। বাবার কথায় পদ্মের মন নরম হয়, যে সমস্তরাত্রি মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে পরের দিন সকালেই বাবাকে প্রণাম করে বাবাকে সঙ্গে নিয়ে পুনরায় স্বামীর ঘর করতে চন্দ্রমশায়ের কাছে ফিরে আসে। শুধু ফিরেই আসে না। পাতিব্রত্যের আদর্শ নিয়ে সতীস্ত্রীর মতন নিষ্ঠার সঙ্গে স্বামী-সেবা শুরু করে। স্বামীর পরিশ্রম লাঘবের জন্যে ছাত্র যেমন পড়ায়, সময়ে সময়ে দুষ্টুছাত্রদের শাসনও করে।

কিন্তু বিধাতা যেন তাদের প্রতি বিমুখ। হঠাৎ ভাগ্যের বিপর্যয় ঘটল। পাশ করা এক নতুন ডাক্তারের প্ররাোচনায় ছাত্র আসা বন্ধ হওয়াতে পাঠশালা বন্ধ হয়ে গেল। পাঠশালা বন্ধ হওয়ার জন্যে আর্থিক অবস্থা ভেঙে পড়াতে জীবিকা সংস্থানের জন্য পদ্মর জীবনে শুরু হয়ে গেল এক কঠিন সংগ্রাম। ধান ভেনে, চাল কুটে সে অভাবী সংসারের সংস্থানের ব্যবস্থা করতে লাগল। স্রেফ দুটো খেয়ে বেঁচেবর্তে থাকার জন্য। কিন্তু

নিয়তির বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম কত দিন চলবে? তারপর হঠাৎই একদিন মুখুজ্জে-গিন্নী তাকে বলে যান তারও কুষ্ঠরোগ হয়েছে। পদ্মবউ মুখুজ্জে গিন্নীর কথায় সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে, মানসিক বিপর্যয় ঘটে যায়। পাতিব্রত্যের এই পুরস্কার? স্বভাবতই দেবতাদের প্রতি তার অচল ভক্তি নষ্ট হয়ে গেল। দেয়ালে লাগানো সব দেবদেবীর ছবিগুলো টেনে চুরমার করে ভেঙে ফেলতে লাগল। ভীত হয়ে চন্দ্রমশাই এগিয়ে এসে পদ্মকে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু তার বৃথা চেষ্টা, পদ্মবউ কিছুতেই শান্ত হল না। দেবদেবীর ছবি চুরমার করা থেকে তাকে কিছুতেই নিরস্ত করা গেল না। পদ্মবউ সব একদষ্টিতে কিছুক্ষণ স্বামীর দিকে চেয়ে হা-হা করে কেঁদে ভারকেন্দ্রচ্যুত মাটির প্রতিমার তন সশব্দে পড়ে গেল মুছায়। সে মুছা আর ভাঙল না। এই হলো গল্প। কিন্তু এরপরেই গল্পে উপসংহার হিসেবে যে শেষ বাক্যটি লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এনেছেন—"ডাক্তার খানিকক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে পরীক্ষা করিয়া বলিল, নিউট্রিশনর অভাবে এর বেরিবেরি হয়েছিল।"—তখন আমরা সহজেই এক অপ্রত্যাশিত চমকের বশবর্তী হয়ে এক ভয়ংকর ট্রাজেডির মুখোমুখি হই, সঙ্গে সঙ্গে পদ্মবউয়ের জন্য গভীর বেদনাবোধে আচ্ছন্ন হয়ে যাই। প্রকৃত ছোটগল্পের যে শিল্পরুপ-—তার সার্থক নিদর্শন বোধহয় এটাই। 'পদ্মবউ' গল্পটি হয়ে ওঠে যথার্থ ছোটগল্পের শিল্প-সমন্বিত একটি সার্থক গল্প। বিশিষ্ট সাহিত্যরসিক জগদীশ ভট্টাচার্য মহাশয় 'পদ্মবউ' গল্পটির উপসংহার সম্পর্কে অবাস্তবতা লঙঘ করুন না কেন—গল্পটির আসল মাদকতা ও তাৎপর্য কিন্তু রয়েছে গল্পের শেষ বাক্যেই!

'পদ্মবউ' গল্পটির মধ্যে আমরা মোটামুটি লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমে যে। কতকগুলি চিত্র পাই তা এরকম:

১. গল্পের শুরুতে পন্ডিত চন্দ্রমশায়ের পাঠশালার পরিবেশের সঙ্গে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত চন্দ্রমশায়ের শারীরিক বর্ণনার সঙ্গে পদ্মবউয়ের পাব্রিত্যের উজ্জ্বল প্রকাশ। কি স্বামী চন্দ্রমশায়ের পাঠশালার শিক্ষাদানের সঙ্গী হিসেবে, কি নিষ্ঠাবতী প্রেমময়ী সতীগৃহিণীরুপে! পারস্পরিক কথোপকথনে ও লেখকের সুমধুর ভাষ্যে যা পরিস্ফুট। দুটি দৃষ্টান্ত রাখছি পদ্মবউয়ের পাব্রিত্যের উদাহরণস্বরূপ:

ক. মশায়—গিন্নী বলিল, আবার বই নিয়ে বসলে কেন? ছেলেদের পড়া নিয়ে ছুটি দিয়ে দাও। জল গরম হয়ে গেছে, স্নান করে ফেল।

আকাশের দিকে চাহিয়া চন্দ্রমশায়ের বইখানা রাখিয়া দিয়া বলিল, বেলা অনেক হয়েছে বটে। তারপর অল্প হাসিয়া আবার বলিল, কিন্তু বেলা যে আর হ'ল না পদ্মবউ, আর যে পারি না।

মশায়—গিন্নী কোনও উওর দিল না, ছোট ছেলেদের ডাকিয়া বলিল, আয়, তোদের পড়া ধরব, আয়।

খ. মশায়-গিন্নী বঁটা লইয়া উঠানটা পরিষ্কার করিতে লাগিল। বঁটা দিতে দিতে বলিল, ওসব কথা তুমি কেন আমায় বল?

চন্দ্রমশায় ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, সত্যি পদ্মবউ, আর যে পারছি না! পদ্মমশউয়ের চোখ ছল-ছল করিয়া উঠিল। সে নীরবেই উঠানের ঝাঁটা দিতে লাগিল। বঁটা দেওয়া শেষ হইলে সে উঠানে একটা জলচৌকি,গামছা ও বালতি পাতিয়া দিল। নিমের তেলের শিশি ও গামছা নামাইয়া দিয়া বলিল, মাখ তেল মাখ। চন্দ্রমশায় তেল মাখিতে বসিল; পদ্মবউ লইয়া আসিল জলের হাঁড়ি-নিমপাতা-ফুটানো গরম জল। হাঁড়ির মুখে গামছা দিয়া গামলার জল ঢালিয়া যে হাতের তালু স্বামীর সম্মুখে পাতিয়া বলিল, দাও দেখি একটু, পিঠে দিয়ে দিই মালিশ করে।

২. চন্দ্রমশায়ের কুষ্ঠরোগের সূত্রপাত ধরা পড়াতে পদ্মবউয়ের মনের ভীতি ও স্বামীগৃহ ত্যাগ করার বাসনায় ছবি। যেমন :

কিন্তু দশ বৎসর পূর্বে যেদিন চন্দ্রমশায়ের এই ব্যাধির সূত্রপাত প্রথম আবিষ্কৃত হয়, সে পদ্মবউ কাপিয়া উঠিয়াছিল। শুনিয়া সে রান্নাঘরের চালার খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিল আপনার হতভাগ্যের কথা। চন্দ্রমশায় তখন ঘরের মধ্যে উপুড় হইয়া পড়িয়া শুধু কঁদিতে পদ্মবউয়ের মনে পড়িল তাহাদের গ্রামের সেই গলিত কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ভিক্ষুকটার কথা, বীভৎস মূর্তি, আর কি দুর্গন্ধ তাহার সর্বশরীরে। টপটপ করিয়া জল চোখ হইতে মাটির উ ঝরিয়া পড়িতেছিল। রান্না অর্ধেক হইয়াছিল, সে রান্না শেষ হইল না—পুড়িয়া

গেল। চন্দ্র ও খাইল না। সমস্ত দিন পড়িয়া রইল। সন্ধ্যার সময় উঠিয়া বসিয়া ডাকিল, পদ্মবউ। কেহ উওর দিল না। আবার সে ডাকিল, পদ্মবউ! সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে ঝিঝি পাকা ডাকিতেছিল শুধু মানুষের সাড়া পাওয়া গেল না।

পদ্মবউ তখন পালাইয়া গিয়াছে। ক্রোশ চারেক দূরে তাহার বাপের বাড়ি, সেখানে সে তখন মায়ের কোলের উপর পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কঁদিতেছিল। মাও কাঁদিতে ছিল। পদ্মের বাপ কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতির লোক। সে শুনিয়া বলিল, ছি মা, বড় অন্যায় কাজ করেছ তুমি। চল, আজই তোমায় সেখানে রেখে আসব আমি। পদ্ম ডুকরিয়া কঁদিয়া উঠিল বলিল,

না, আমি পারব না বাবা, সে আমি পারব না।

৩. পদ্মের মনের পরিবর্তন ও স্বামীগৃহে ফেরা।

৪. পদ্মের জীবনসংগ্রামের ছবির সঙ্গে পদ্মের অসুখে আক্রান্ত হওয়ার ছবি।

উপরিউক্ত ছবির মধ্যে ৩ নং ও ৪ নং-এর উদাহরণ রাখলাম না। পাঠকেরা গল্পটির নিবিড়পাঠে আশা করি ছবি দুটি অবগত হবেন। যদিও এ গল্পে পাঠশালার ছাত্ররা যেমন চঞ্চল ও কেউ কেউ দৃষ্টমতির হয় সে ছবি ও গল্পের লেখক চিত্রিত করেছেন, তেমনি গল্পের শেষে এসে পদ্মবউয়ের বিশ্বাসের অপমৃত্যুর ছবি লেখক হাজির করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি এ দুটি ছবি তুলে না ধরে উপরিউক্ত (উদাহরণে যা বলা হয়েছে) চারটি ছবির কথা আমি তুলে ধরেছি মূলত ‘পদ্মবউ’ গল্পের নায়ক চন্দ্রমশায় হলেও তার ভরকেন্দ্রস্বরূপ নায়িকা পদ্ম যে এ গল্পের আসল চাবিকাঠি তা প্রত্যক্ষগোচর করানোর জন্য। লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। ‘পদ্মবউ’ চরিত্রটিকে ঘটনা-পারম্পর্যে এভাবে অঙ্কিত না করলে ‘পদ্মবউ’ গল্পে যেমন নাটকীয়তা থাকত না, তেমনি পদ্মবউ গল্পটি সত্যিকারের এক বেদনাবিধুর করুণ রসজনিত ট্রাজিক কাহিনিরূপে পূর্ণায়ত রূপ পেত না। গল্পটির শিল্পগুণ এখানেই। এ গল্পে পদ্মবউকে লেখক যেমন একজন পতিব্রতা-নারীরুপে হাজির করেছেন, তেমনি হাজির করেছেন বাস্তবসত্যের প্রতিভূরূপে এক চিরন্তন রক্তমাংসের বাঙালি নারী রূপ।

প্রত্যেক বাঙালি নারী যেমন চায় সুস্থ সবল শরীর, এবং মান-মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে। তাই দেখি গল্পে মুখুজ্জে-গিন্নীর মুখে যখন পদ্ম অসুখের কথা শোনে–তখনই সে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। যার জন্যে বার বার সে যেমন আয়নায় নিজের মুখ দেখে, শরীর দেখে, তেমনি আবার নিজের রোগকে নিজেই পরখ করে। যখন নিজের রোগ সম্পর্কে একটা ধারণায় পৌছয় তখন ঘৃণ্য বা অচ্ছুত হয়ে বেঁচে থাকার যন্ত্রণা তার হৃদয়কে দগ্ধ করে, সঙ্গে সঙ্গে তার চিরন্তন বিশ্বাসকেও। আপামর বাঙালি নারীর মধ্যে সচরাচর সংসারজীবনে যা প্রত্যক্ষ গোচর হয়।

গল্পের ট্রাজেডির যে ছবি লেখক তারাশঙ্কর আমাদের কাছে হাজির করেছেন তা-ও বেশ বিস্ময়কর ও বেদনাবিধুর। কুষ্ঠরোগ হয়েছে বলে সন্দেহে পদ্মর মানসিক বিপর্যয়ের এবং দেবদ্বিজের প্রতি বিশ্বাসভঙ্গের কারণ-পদ্মর মৃত্যু যে পুষ্টির অভাবে বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হওয়ার ফলে দুর্বলজনিত কারণে তা গল্পের শেষে লেখক স্পষ্ট করে দিয়েছেন ডাক্তারের পরীক্ষজনিত বিধানে।

কাজেই নামকরণ ‘পদ্মবউ’ ছাড়া এ গল্পে আর কী-ই বা হতে পারে? বিশেষ করে গল্পের প্রাণ বায়ু যখন পদ্মকে কেন্দ্র করে ঘটনার পারম্পর্যে নাটকীয়তার টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে। ‘পদ্মবউ’ নামটি সব অর্থেই যে তাৎপর্যময় তা বোধকরি বলার অপেক্ষা রাখে না। নামকরণের দিক দিয়ে তারাশঙ্করবাবু এখানে শরৎচন্দ্রের অনুসারী বলা যায়। চরিত্রগত নাম আমরা তার আগে বহুলভাবে ব্যবহৃত হতে দেখি শরৎচন্দ্রের রচনায়। যেমন ‘নতুনদা,’ ‘রামের সুমতি’, ‘মেজদিদি’, ‘বড়দিদি’, ‘দেবদাস’, ‘বিরাজবৌ',মহেশ’ ইত্যাদি। গল্প ও উপন্যাসের উভয় ক্ষেত্রেই চরিত্রগত নাম আমরা শরৎসাহিত্যে বেশি লক্ষ করি। তারাশঙ্কর অবশ্য ছোটগল্পের ক্ষেত্রে চরিত্রগত নাম মূলত বেশিকিছু গল্পে ব্যবহার করেছেন লক্ষ্য করা যায়।

‘পদ্মবউ’ গল্পটির সাধুভাষায় রচিত হলেও গল্পে চরিত্রদের কথাবার্তার চলিত শব্দের প্রয়োগ, যা আমরা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্পে প্রত্যক্ষ করি—তা এ গল্পে বিদ্যমান পূর্ণমাত্রায়। ছোট ছোট চরিত্রের মুখনিঃসৃত ব্যবহৃত বাক্যে লেখক শরৎচন্দ্র যেমন এক অদ্ভুতনাটকীয়তায় দৃশ্যের পর দৃশ্য রচনা করে ঘটনার পারম্পর্যে প্রয়োজনমতন ঘাত-

প্রতিঘাতের মাধ্যমে বা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মাধ্যমে কাহিনী বা গল্পের প্লটকে প্রসারিত করেন—ঠিক তেমনটিই এ গল্পে লক্ষ্য করা যায়। কাজেই, 'পদ্মবউ' গল্পে আমরা কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এক যোগ্য উওরসূরি রূপে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাই তা বোধকরি বলা অনুচিত হবে না।

তবে, এ গল্পটি পাঠে আমরা যে ধারণায় স্বভাবতই উপনীত হই—তারাশঙ্করের গ্রামবাস জীবনে সেযুগে কুষ্ঠরোগের গ্রাম বাংলায় যেমন ভাল সুচিকিৎসার সুযোগ ছিল না, তেমনি কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে মানবসমাজে এক ভয়ংকর কুসংস্কারজনিত আতঙ্ক ছিল। সে আতঙ্ক অনেক মানুষকে বিভ্রান্তের দিকে ঠেলে দিত। পদ্মবউ' গল্পে 'পদ্মবউ' চরিত্রটিকে সামনে রেখে তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। শুধু 'পদ্মবউ' বলি কেন—চন্দ্রমশায়, নতুন পাস করা ডাক্তার ও মুখুজ্জে-গিন্নী চরিত্রগুলিকে ও বেশ জীবন্ত করেও। পদ্মবউ' গল্পের পেছনে আসল কথা এটিই!

'পদ্মবউ' গল্পের মূল সুর একটাই—মানুষের আদিমতম প্রবৃত্তি যে মানুষের বাঁচতে চাওয়া, বলতে গেলে বাঁচার আকাঙ্খা, এবং তা এ গল্পে আকারে-ইঙ্গিতে লেখক হাজির করেছেন পাঠশালা বন্ধ হবার সঙ্গে পদ্মবউয়ের সংগ্রামমূলক জীবনযাপনের ভেতর দিয়ে। যদিও সে সংগ্রাম তার দীর্ঘস্থায়ি হয়নি অসুখজনিত কারণে। এদিক দিয়ে ভাবলেও 'পদ্মবউ' গল্পটি লেখক তারাশঙ্করের এক সুচিন্তিত বাোধের উজ্জ্বল ফসল বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। শিল্প নৈপুণ্যগতভাবে আমরা যতই খুঁত বার করি না কেন!

৬.২ খাজাঞ্চিবাবু : হারিয়ে যাওয়া সময়ের মানুষ

তারাশঙ্কর তাঁর গল্প-উপন্যাসে অনেক জায়গাতেই হারিয়ে-যাওয়া সময়ের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধামিশ্রিত বেদনাকে ভাষা দিয়েছেন। গল্পটি প্রথম নতুন পত্রিকার মাঘ ১৩৪২ সংস্থা প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তী কালে ১৩৪৪ সালের শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত 'জলসাঘর' গল্পগয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এখানে-'জলসাঘর', 'পদ্মবউ', 'ডাক-হরকরা', 'প্রতীক্ষা', মধু মাষ্টার 'তারিণীমাঝি', 'খাজাঞ্চিবাবু', 'টহলদার', 'ট্যারা',রাখাল বাঁড়ুজ্জে', নারী ও

নাগিনী' এগারোটি গল্প আছে। আবার ১৩৫৪ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত রামধনু' গল্পগ্রন্থে 'খাজাঞ্চিবাবু'গল্পটি আছে।

'তারাশঙ্করের শিল্পিমানস'-এর লেখক নিতাই বসু বলেছেন-"রবীন্দ্রনাথ নাকি জনৈক খ্যাতনামা কবিকে (তারাশঙ্করের ধারণা, ইনি সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র) লেখক এক চিঠিতে ইউরোপের গল্পলেখকদের সঙ্গে তারাশঙ্গরের তুলনা করেছিলেন। 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে রানী চন্দ লিখেছেন, "আমার খুব ভাল লাগে তারাশঙ্করের ছোটগল্প, তার ভিতরে আছে একটা স্মৃতি -যার সঙ্গে পুর্বেকার ওই যেমন জমিদারের ঘরে ঘটে থাকে শাসন, পালন, শোষণ দেখিয়েছে; সত্য করে তুলেছে তার লেখা।"

তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছের সম্পাদক জগদীশ ভট্টাচার্যের উক্তি— "বাংলা কথাসাহিত্যে এই পরিপূর্ণ জীবনবোধের সার্থকতম কবিশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। একাধারে অনুরক্ত এবং অনাসক্ত। তাই তাঁর দৃষ্টিতে ললিতে কঠোর কাজের বিপরীত সত্যজীবনের স্নিগ্ধ ও হিংস্র, চির -পুরাতন অথচ নিত্যনবীন বাস্তবরূপটি সম্যকভাবে ধরা পড়েছে। শুভে অশুভে স্থাপিত পৃথিবী পাদপীঠে, তার প্রচন্ড সুন্দর মহিমা'র রসরহস্য উন্মীলনে তাই তারাশঙ্কর অদ্বিতীয়, অভূতপূর্ব।" খাজাঞ্চিবাবু গল্পের শুরু মানভূম জেলার এক ফায়ার ব্রিকস কারখানার পুরানো আমলের ব্যারাক বাড়ির মত মেস বাড়ির বর্ণনায়। এই ফায়ার ব্রিকস কারখানায় চল্লিশ বছর কর্মরত খাজাঞ্চিবাবুই গল্পের আলোচ্য চরিত্র।

খুবই সাধারণ এক চরিত্র, অথচ পনেরো বছর ধরে বদিবাবু এই কারখানায় খাজাঞ্চি পদে বহাল। গল্পের শুরুতেই শোনা যায় কারখানায় সাহেবী মেজাজের মতুন ম্যানেজার এসেছেন। যার হুকুমে সকালের শিফট সাড়ে ছটায় শুরু হলে সব কর্মিকেই এর পাঁচ মিনিটের মধ্যে উপস্থিত হতে হবে নইলে আধবেলা অনুপস্থিত বলে গণ্য হবে।

ঘটনার সময় শীতকাল, কারখানার নতুন পুরানো সব কর্মচারিই সাড়ে ছটায় ভোঁ বাজার সঙ্গে সঙ্গে যে যে অবস্থায় ছিল পড়িমরি করে দৌড়ে গেছিল। আশ্বিনী, ভিখারী, বদি, শশি এই সমস্ত কর্মিরা কারখানায় গিয়ে দেখে যে তখনো দশ মিনিট বাকি সাড়ে ছটা বাজতে। তাই অনেকেই রাগে গজ গজ করতে থাকে। কারখানার কাজ শুরুর আগে একটা অব্যবস্থা দেখে দিল সার্ভেয়ার ম্যানেজারকে বলেন যে খাজাঞ্চিবাবু

ইচ্ছাকৃতভাবে আগে কারখানার ভোঁ বাজিয়েছেন, কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে কারখানায় অনুগত খাজাঞ্চিবাবু আগের দিনের কাজ অসম্পূর্ণ আছে বলেই এই কাজ করেছেন বলে কৈফিয়ৎ দেন,তবু ম্যানেজার সকলের রাগ ভাঙাতে তখন গজ চাল করে সাতটা থেকে সাড়ে সাতটার বিরতি দেন। এরপরের গল্প খাজাঞ্চির সঙ্গে রানেজারের সামান্য কথা কাটাকাটির কথা। প্রকৃতপক্ষে ষাট বছর বয়স্ক পুরোনো ধ্যানধারণার খাজাঞ্চিবাবু কারখানার ভালো চেয়েই যে কোনো কাজ করে থাকেন, অথচ নতুন কালের মানুষের এমন কি নতুন ম্যানেজার পর্যন্ত খাজাঞ্চিবাবুর সেন্টিমেন্টকে গুরুত্ব দিতে চান না। খাজাঞ্চিবাবু এরপর ঘটনাক্রমে নতুন ম্যানেজারের সইকরা ভাউচারের একশ দশ টাকা স্টোর ডিপার্টমেন্টের পিওনকে না দিয়ে ম্যানেজারের কাছে এর সত্যতা জানতে গিয়ে অপমানিত হয়েছেন, তবু খাজাঞ্চিবাবু খড় কেনার টাকা দিতে দ্বিধাগ্রস্ত। আসলে খাজাঞ্চিবাবু পুরোনো দিনের মানুষ যার কাছে কারখানা হলো অন্নদাতা এবং এর জন্য তার মমতা ও অন্যরকম। অথচ আজকের দিনের ম্যানেজার কে ইডিয়ট বলে গালি দিয়েছেন। আসলে খাজাঞ্চিবাবুর কাছে কারখানা হল পরিবারের মত সেখানে কে ক্ষমতা বা মর্যাদার বড় সেটার থেকেও নিষ্ঠা ও আনুগত্য অনেক বড় ব্যাপার। অথচ নতুন যুগের কাছে এই বৃদ্ধ খাজাঞ্চি অচল।

এমন কি কারখানার কর্মিদের মেসবাড়ি মেরামতের সময়ও নতুন ম্যানেজার খাজাঞ্চির তক্তপোশটা নিজের মর্জিমত ঘুরিয়ে দিয়েছেন। এখন কি খাজাঞ্চিবাবুকে ঘরের আরেক সঙ্গী গোবিন্দর কাছেও খাজাঞ্চিবাবুকে ছোট করতে চেয়েছেন। খাজাঞ্চিবাবু সহজ সরল মানুষ। অথচ ঘরের মাঝখানে জুতোজোড়া রাখায় ম্যানেজারের নির্দেশে সেটিকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আবার সেদিনই সন্ধ্যাবেলায় ম্যানেজারের নির্দেশে খাজাঞ্চিবাবুর সাধের হুঁকোটা জানলার প্রান্ত থেকে ডুয়েতে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। একনিষ্ঠ পুরানো মূল্যবোধের মানুষ খাজাঞ্চি অত্যন্ত অভিমানে বলেই ফেলেছেন যে এই কারকানার অন্ন তাঁর ঘুচে গেল। এই ভাবেই অত্যন্ত সৎ এবং ভালোমানুষ বৃদ্ধ খাজাঞ্চি যে কারখানাকে তার আপনার করে নিয়েছিলেন সেখানেই নতুন ম্যানেজারের সঙ্গে তাঁর সংঘাত বেধে গেল। এরপর থেকে ছুতায় নাতায় ম্যানেজারবাবু খাজাঞ্চিকে নানাভাবে অপদস্থ করতে

লাগলেন। এরপর একদিন অ্যাকাউন্ট্যান্ট আশ্বিনী ক্যাশখাতা ম্যানেজারকে দেখালে তিনি আঁকাবাকা হিসাব লেখা দেখে এর কারণ জানতে চাইলে আশ্বিনী বলেছিল যে খাজাঞ্চিবাবু চোখে কম দেখেন, অথচ চশমা নিতে চান না, কারণ তাতে চোখ খারাপ হয়ে যাবে। এরপর খাজাঞ্চিবাবুকে ডেকে পাঠিয়ে ম্যানেজার ক্রুদ্ধভাবে তার বয়স জানতে চান এবং তাঁকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে এভাবে কাজ করা চলবে না। খাজাঞ্চিবাবু যে অনেক দিনের চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে এই কারখানায় মঙ্গল চেয়ে এসেছেন, তাকেও গুরুত্ব না দিয়ে তাকে চুড়ান্ত সর্তক করা হয়েছে, এরপর খাজাঞ্চিবাবু রাতারাতি চশমা এনে অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে যখন নতুন উদ্যমে কাজে লাগাতে চেয়েছেন, তখনই নিয়তির চরম পরিহাসের মত ম্যানেজারের কাছ থেকে তিনি জানতে পেরেছেন ইংরেজি জানা অ্যাকান্ট্যান্ট রাখা হবে এবং ওর চাকরি চলে যাচ্ছে। এর পরেই ম্যানেজার খাজাঞ্চিবাবুর হাতে পরবর্ত তিন মাসের অগ্রিম মাইনের চিঠি এবং ওর পদত্যাগ পত্রের চিঠি হাতে দিয়ে সই করিয়ে নিয়েছেন। কত সহঁজে কত হৃদয়হীন কাজ করেছেন ম্যানেজার। খাজাঞ্চিবাবু বৃদ্ধ হয়ে ছিলেন ঠিকই কিন্তু যেভাবে তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে তা লেখকের কাছে চুড়ান্ত গর্হিত কাজে। যাকে মানবিকতার মাপকাঠিতে ফেলা যায় না। উপরন্তু খাজাঞ্চিবাবুর এতকালের নিষ্ঠা ও একাগ্রতাকে উপহাস করেই ম্যানেজারবাবু বলেছিলেন যে তার যে রকম অনুরাগশীল মন, তাতে এই নিষ্ঠা নিয়ে ভগবানকে ডাকলে অনেক কাজ হবে। অত্যন্ত সহজ সরল প্রৌঢ় খাজাঞ্চিবাবু এই অপ্রত্যাশিত আঘাতকে অত্যন্ত শান্তভাবে মেনে নিয়ে পাইপয়সার হিসাব দিয়ে ক্যাশের চার্জ বুঝিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু অন্যান্য কর্মিরা তাদের এতদিনের সাথীকে আজকে অকেজো মনে হলেও চোখের জলেই বিদায় সম্বর্ধনা দিয়েছে।

লেখকের বর্ণনায় এই খাজাঞ্চিবাবুর পুরানো কালের মানুষ হিসাবে কালের নিয়মে সরে যেতে বাধ্য হলেও ওর নিষ্ঠা একাগ্রতাকে কুর্নিশ করেছেন। কারণ গল্পের শেষে দেখা যায় আরেকদিন ভোরেই কয়েকজন খালাসির মাথায় মাল চাপিয়ে স্টেশনের পথে ধাবমান খাজাঞ্চিবাবু যেন আচম্বিতেই বলেছেন যে আজকে কারখানায় সিটি বাজল না। অর্থাৎ চাকরি হিসাবে এরা কাজ করেন না। ওঁদের কাজ অনেকটা গড়েপিঠে তৈরি

করার কাজ অর্থাৎ এরা গড়ে তোলার কারিগর, শুধুমাত্র মাইনে করা কর্মিমাত্র নয়। তখন খালসি বলেছিল যে বাবু এখনো সময় হয়নি, অর্থাৎ সাড়ে ছটায় গাড়িতে খাজাঞ্চিবাবু স্টেশন ছাড়বেন তারপর কারখানার ভোঁ বাজবে। এরপর খাজাঞ্চিবাবুর সম্বিত ফিরে এল এবং ম্লান হেসে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে যেন ভগবানের হাতে কারখানাকে সঁপে দিয়ে চলে গেলেন। গল্পের শেষছত্রে দেখা যায় যে নতুন। চমশা নিয়ে পরিষ্কার ভাবে আকাশের দিকচক্রবালে কারখানা চালু হওয়ার ধোঁয়ার ঢাকা পড়া আকাশেই দেখত পেলেন খাজাঞ্চিবাবু।।

গল্পের গঠন কৌশল সম্পর্কে সাম্প্রতিককালের সমালোচক Dr. Spearce বলেছেন "A good short story is a piece of fiction, dealing with a single incident, material or spiritual, that can be read at one sitting; it is original, it must sparkle; excite are impress and it must have unity of effective impression; it should move man even line from its exposition to its close" [A Dictionary of Modern Critical Terms - Edited by Roger Fowler.] তারাশঙ্করের অনেক গল্পের মত এই গল্প সম্পর্কেও উপরের মন্তব্য অনেকাংশেই সঠিক।

'খাজাঞ্চিবাবু' গল্পটি অত্যন্ত সুপরিকল্পিত এবং গতিশীল ঘটনাকেন্দ্রিক গল্প। তারাশঙ্কর গল্পের শুরুতেই শেকভের গল্পের মত গল্পটির গতিপ্রকৃতির রূপটি তুলে ধরেছেন। এক সরল রৈখিক পথেই গল্পের কাহিনী এগিয়ে গেছে। গল্পের শুরুতেই এক শীতকালের সকালে মানভূম। ফায়ার ব্রিকস্ ফলে ইট তৈরির কারখানায় হঠাৎ শোরগোল হওয়ার জন্য সংস্থার একনিষ্ঠ ও বয়োবৃদ্ধ কর্মি খাজাঞ্চিবাবুকেই দায়ী করা হয়েছে। যদিও খাজাঞ্চিবাবু কারখানার বকেয়া কাজ শেষ করার ভাবনা থেকেই কারখানার নতুন ম্যানেজারের তৈরি করা কারখানায় হাজিরার সময়ের মিনিট দশেক আগে ভোঁ বাজিয়েছেন। অথচ সকলেই তার কর্তব্য নিষ্ঠাকে ভুলে তার কাজের এক্তিয়ার জানতে চেয়েছে। এমনকি নতুন ম্যানেজারও তাকে চুড়ান্ত সতর্ক করেছেন। নিজের কাজের গন্ডি অতিক্রম করায়, সেখানে কারখানায় জন্য সেবামনোবৃত্তি কোনো গুরুত্বই পায় নি।

উপরন্তু নতুন ম্যানেজার এই পুরানোপন্থী ভালো মানুষ খাজাঞ্চিকে পরিহাস করে তাঁর কর্জ্য নিষ্ঠা ঈশ্বর সাধনায় নিয়োগের পরামর্শ দিয়েছেন। অবশেষে ষাট বছর বয়সে পৌছোননা চোখে কম-দেখা বৃদ্ধ খাজাঞ্চির ব্যক্তিগত বাসস্থানে ও হস্তক্ষেপ করেছেন ম্যানেজার যেহেতু পদে তিনি কারখানার আবাসনেরও দায়িত্বপ্রাপ্ত। মন ভেঙে গেছে খাজাঞ্চিবাবর। তিনি মনে প্রমাদ গুনেছেনে যে এই কারখানায় চাকরি তার গেল। অবশেষে সেই দুর্ঘটনার খবর গভাবে পেশ করেছেন ম্যানেজার এবং তিনমাসের অগ্রিম মাইনে দিয়ে পুরানো খাজাঞ্চিকে এর নোটিশে সই করিয়ে নতুন ইংরেজি জানা অ্যাকান্টকিপারের বন্দোবস্ত করতে চেয়েছেন ম্যানেজার। মানভূম ফায়ার ব্রিকসের নুন খাওয়া চল্লিশ বছরের বেশি কাজ করা খাজাঞ্চিবাবু চোখের জলে নতুন চশমাধারী হয়ে বিদায় নিয়েছেন। বিদায় বেলায়ও তার মানবিক চিন্তা কারখানাকে ঘিরে ব্যক্ত হয়েছে। মনের ব্যথা মনে চেপে ভগবানের হাতে তার এত সাধের কারখানাকে সমর্পন করেই যেন বিদায় নিয়েছেন খাজাঞ্চিবাবু তথা বোদ দা। যিনি কারখানায় অনেক সুখ-দুঃখের সাথী, দীর্ঘ পনেরো বছর তিনিই ছিলেন পাই পয়সার হিসাব রক্ষক ক্যাশবাক্স জিম্মাদার খাজাঞ্চিবাবু। দীর্ঘ চল্লিশ বছরের এই কাজে অনেক জমানো সুখদুঃখ মাথায় নিয়ে বিদায় নিয়েছেন খাজাঞ্চিবাবু। নতুন কালের টানে কারখানায় নতুন বাতাস এলেও গল্পলেখকের অন্তরের অন্তস্তলের সবটুকুউজাড় করে পেয়েছেন পুরানো দিনের পুরানো মূল্যবোধের আজকে বাতিল হওয়া খাজাঞ্চিবাবু। গল্পে যার একটি নাম আছে, অথচ ম্যানেজার নতুন কালের চালক হলেও অবশ্যম্ভাবী নিয়মে কারখানায় বহাল হলেও লেখকের করুণার পাত্রও নয়। কারণ তারাশঙ্করের সমস্ত মমত্ব বর্ষিত হয়েছে সাধারণ নগণ্য ঐ খাজাঞ্চিবাবুর প্রতি। তাই গল্পের নামকরণ ও তাঁর নামেই। অর্থাৎ চরিত্রের নামেই নামকরণ। গল্পের সমাপতনেও তার জীবনের একটি পরিণতি চিহ্নিত হয়েছে।

"Short stories tend to be less complex than novels. Usually a short story focuses on one incident, has a single plot, a single setting, a small number of chareacters, and covers a short period of time"

[Concise Enclylopadia Britanica.] তারাশঙ্করের খাজাঞ্চিবাবু একই রকম ভাবেই চরিএয়িত। ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য তাতে বিরাজমান। প্লাট হিসাবে খাজাঞ্চিবাবুও ছোটগল্পের ধর্ম বজায় রেখেই এগিয়েছে। তিরিশের দশকের পরিবর্তিত সভ্যতার পটভূমিতে দাঁড়িয়ে তিনি দেখেছেন ঘুনধরা সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিদায়ী বিষণ্ণতা, কিন্তু তারাশঙ্করের অকপট শ্রদ্ধা নিবেদন বিলীয়মান প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থায়, তাই তিনি বলেছেন 'সেকাল আমি শ্রদ্ধা করি, তার মহিমার কাছে আমি নতমস্তক।(আমার কালের কথা, ২য় সংস্কারণ-পৃঃ ২২১)।

এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মানভূম ফায়ার ব্রিক্স কারখানার বৃদ্ধ খাজাঞ্চিবাবু। যিনি দীর্ঘ চল্লিশবছর এই কারখানায় আছেন, আর গত পনেরো বছর ধরে খাজাঞ্চির দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। কালের বদল ঘটেছে সময়ের নিয়মেই। পুরোনো কারখানায় নতুন ম্যানেজার এসেছেন। ম্যানেজার। আধুনিক কালের নব্য শিক্ষিত আধুনিক ধ্যান ধারণার মানুষ; পুরোনো কালকে তিনি খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখেন না, কারণ সময় এলে পুরোনোকে কঠোর ভাবেই বিদায় দিতে হয়। যদিও এটাই কালের অমোঘ নিয়েম। তবু বুড়ো হলেও একান্ত কারখানাগত প্রাণ খাজাঞ্চি আজকে কারখানার অনেকের কাছেই অপাংক্তেয়। কারণ আগের দিনের না শেষ হওয়া কাজের জন্য খাজাঞ্চিবাবু শীতের সকালে সাড়ে ছটায় জায়গায় ছটা কুড়িতে কারখানার ভোঁ বাজালে প্রায় সকল কারই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এমনকি নতুন ম্যানেজারের হুকুমে সকালে সাড়ে ছটায় পাঁচ মিনিট বেশি হলে আধবেলা অনুপস্থিতির বেতন কাটা যাবের ঘোষণায় প্রায় সব কর্মচারিই ক্ষুদ্ধ। অথচ আগের দিনের কাজ অনেক অসমাপ্ত থাকায় খাজাঞ্চি দশ মিনিট আগে কাজে উপস্থিতির ভো বাজালে প্রায় সকলেই অপ্রস্তুত হয়ে কারখানায় এসে হই হল্লা করতে থাকে এবং সার্ভেয়ার থেকে ম্যানেজার সকলেই খাজাঞ্চির কর্তব্যনিষ্ঠাকে গুরুত্ব না দিয়ে করে হুকুম করে তিনি দশ মিনিট আগে ভো দিয়েছেন কেন তাই জানতে চেয়েছেন। এমন কি খাজাঞ্চিবাবুর মূল্যবোধকে পাত্তা না দিয়ে ম্যানেজার কারখানার কর্মিদের আধঘন্টার জন্য কাজ চালুর পরবর্তীতে ছুটি দিয়ে পরিস্থিতি

সামলেছেন, ম্যানেজারের সঙ্গে খাজাঞ্চির গন্ডোগোল শুরু হল এখান থেকেই, যায় অন্তিম পরিনতি খাজাঞ্চির চাকরি নাশ।

খাজাঞ্চিবাবু কারখানায় প্রায় প্রথম থেকে নানা উত্থান-পতনের সাথী, অথচ কত সহজেই তাঁর বয়স ষাট হয়েছে বলে এবং কাজে সামান্য স্থবিরতা এসেছে বলে তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার উদ্যেগী নতুন ম্যানেজার। ঘটনাচক্রে দেখা গেছে যে, খাজাঞ্চিবাবু পুরোনো আমলের মানুষ বলে এবং বয়সের কারণে কিছুটা আড়ষ্ট হলেও তার দীর্ঘকালীন কারখানা সেবার মূল্যমান তিনমাসের বেতন অতিরিক্ত হিসাবে প্রাপ্তি এবং সঙ্গে ম্যানেজারের অমূল্য উপদেশ—"আপনার যেরকম অনুরাগশীল মন, তাতে এই নিষ্ঠা নিয়ে ভগবানকে ডাকলে অনেক কাজ হবে আপনার।" এছাড়া খাজাঞ্চিবাবু কারখানার যে ব্যারকবাড়ির মত মেসে অন্যান্য কর্মিদের সঙ্গে দীর্ঘকাল বসবাস করেছেন সেখানেও পদাধিকার বলে নতুন ম্যানেজার তার বসবাসের ঘরের চৌকি থেকে হুঁকো এমনকি চটিজুতো পর্যন্ত নানাভাবে সরিয়ে দিয়ে বৃদ্ধ মানুষটিকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছেন। একসময় মনের ক্ষোভ দুঃখে খাজাঞ্চিবাবু বলেই ফেলেছেন-"নাঃ এখানকার অন্ন আমার ঘুচুলে এরা।" যদিও গল্পেলেখকের সমস্ত সহানুভূতি এই পুরোনো মানুষটিকে ঘিরেই ব্যক্ত হয়েছে। গল্পের নামকরণ ও তার নামেই হয়েছে। লেখক তার একটি নামও দিয়েছেন বদি বা বোদ। গল্পকার লিখেছেন-"কর্মচারীরা কিন্তু এত সহজে বিদায় দিল না। তাহারা সভা করিল, বিদায়-ভোজ দিল, গলায় মালা পরাইয়া দিল, অনেকের চোখে জল ও দেখা দিল।" অর্থাৎ দীর্ঘদিনের এক সহকর্মীকে ম্যানেজারের নির্দেশে ছেড়ে দিতে হলেও অনেকেরই মন ভারাক্রান্ত হয়েছিল। একদিন ভোরবেলায় কারখানার খালাসীদের মাথায় মাল চাপিয়ে খাজাঞ্চিবাবু চিরতরের মত কারখানা থেকে বিদায় নিলেন। কিন্তু বিদায় বেলায়ও কি খেয়ালের বশে জিজ্ঞেসা করলেন যে সেদিন ভো বাজিয়ে কাজ শুরু হল না কেন। উত্তরে খালাসীরা বলল যে খাজাঞ্চিবাবু গাড়ি যখন স্টেশন ছেড়ে যাবে তখনই সকলে সাড়ে ছটা বাজবে। এরপর লেখকের কী দরদী বর্ণনা --"খাজাঞ্চি একবার পিছনের দিকে ফিরিয়া চাহিল, কারখানার চিমনি হইতে গলগল করিয়া ধোঁয়া বাহির হইতেছে। সে চোখ ফিরাইয়া

লইল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ম্লান হাসিয়া আপন মনেই সে বলিয়া উঠিল, ভগবান আছেন।" অর্থাৎ কারখানা ছেড়ে শেষবারের মত চলে যাবার মুহুর্তেও খাজাঞ্চিবাবুর মনে কারখানার প্রতি মমতা, ভালোবাসা অন্নদাতা প্রতি একান্ত নিষ্ঠাকেই প্রমাণ করে।

যে কারখানায় দীর্ঘকাল কাজ করে তার চোখে ঝাপসা হয়ে এসেছিল বয়সের ভারে ও অন্যান্য কারণে, সেখানে থেকেই নতুন চমশা নিয়েও আর কাজ না করতে পারলে ও "চশমা অবত পরিষ্কার দৃষ্টির সম্মুখে ও যে সেখানে শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া - ওই কারখানার চিমনির উদগিরিত ধোঁয়ার আড়ালে আকাশ কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।" অর্থাৎ শেষ বেলাতেও অভিসম্পাত নয়, বরং ভালোবাসার আলোই বর্ষিত হয়েছে।

'খাজাঞ্চিবাবু' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র খাজাঞ্চি বাবু এর ঠিক বিপ্রতীপ চরিত্র ম্যানেজারবাবু। মানভূম জেলায় ফায়ার ব্রিকসের কারখানা, সেখানে ম্যানেজার নতুন লোক, সাহেবী মেজাজ। গল্পে এর পরের বর্ননা "তাহার নতুন বন্দোবস্ত নিয়ম হইয়াছে, সাড়ে ছয়টায় সিটি বাজিবার পাঁচ মিনিটের মধ্যে সকলকে আপিসে হাজির বই সহি করিতে হইবে। তাহার অর্ধেক এবং মিনিটও বিলম্ব হইলে অর্ধেক দিন অনুপস্থিত লেখা হইবে।" নতুন ম্যানেজারের এই কর্মকান্ড অনেকের অপছন্দ। শীতের সকালে কারখানার প্রায় সব কর্মচারিই কাজে যাবার জন্য তৈরি হয়েছিল। গল্পে পাওয়া যায়"অশ্বিনী চা খায় না, সে গরম দুধের বাটিতে চুমুক দিতেছিল; ভিখারী আউটডোরে কাজ করে, সে নীল রঙের প্যান্টটা পরিয়ে মোজা জোড়াটা খুঁজিতেছিল; তরুণ বদি রাজে পঁচিশটা ডন ফেলে। সে একাদশ ডনটি ফেলিতেছিল; বুড়া শশী মিস্ত্রী গত রাত্রের উদ্বৃত্ত মাংসের চর্বিগুলা গিলিতেছিল; ঠিক এই সময়েই কারখানায় ভো বাজিয়ে উঠিল -ভোঁ-ভো—ভো—

...বদি একাদশ ডনটাতে ব্যায়াম শেষ করিয়া লাফ দিয়া উঠিয়া বলিল, স্লেভারি। ওঁ। সে তাড়াতাড়ি একটা জামা টানিয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়িল।"এরপর কারখানায় পৌঁছে সকলেই দেখেছে যে সাড়ে ছটার দশ মিনিট আগেই ভোঁ বেজেছিল। বদি মাথা গরম করে ঘুষি পাকিয়ে খাজাঞ্চিবাবুর নাকের কাছে এনেছিল। সার্ভেয়ার খাজাঞ্চিকে দশ মিনিট আগে ভোঁ বাজাবার জন্য কৈফিয়ৎ তলব করেছিল এরপর নতুন ম্যানেজারের

কৈফিয়ৎ তলবে খাজাঞ্চিবাবু তাঁর কর্তব্য নিষ্ঠার ভরেই বলেছিলেন—"স্যার কাল থেকে অনেক কাজ বাকি পড়ে আছে, গাড়ি লোডিং শেষ হয়নি, দশ নম্বর কিলেন"

-ওঁকে থামিয়ে দিয়ে ম্যানেজার বলেছিলেন কারখানায় গন্ডোগোলের কারণ কি? প্রত্যুত্তরে সার্ভেয়ার অভিযোগ জানায় যে, ম্যানেজার বাবু শীতের সকালে সাড়ে ছটায় সকলের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করলেও খাজাঞ্চিবাবু ছটা কুড়ি মিনিটে সিটি দেওয়ার হুকুম দিয়েছেন। ম্যানেজার তাঁর হাত ঘড়িতে দেখেছিলেন যে তখন সাড়ে ছটা বাজতে দুমিনিট বাকি আছে। তাই পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রত্যেককে কাজ চালু করে সাতটা থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত সময় দিয়েছেন সকালের খাবার খেয়ে আসার জন্য। এর পরই খাজাঞ্চিবাবুকে জিজ্ঞেসা করে ম্যানেজার তাঁকে সাবধান করে দিয়েছেন যেন কোনোভাবেই তার কথার অন্যথা না হয়। অশাক আগের দিনের কাজ পড়ে থাকলেও খাজাঞ্চিবাবু যেহেতু কারখানার মালিক নয়, অব কাজ শুরু করার অন্য কোনরকম হুকুম তার দেওয়া চলবে না। এ কথা ম্যানেজার কারভাবে বলে দিয়েছেন। এখানে ম্যানেজার কারখানা মালিকের নিযুক্ত সর্বোচ্চ প্রশাসকের ভূমিকা পালন করেছেন, যেখানে সময়ানুবর্তিতার ক্ষেত্রে নিয়মই শেষ কথা, কোনো মমত্ব বোধ বড় নয়।

তারপরেই খড় কেনার জন্য একশো দশটাকার ভাউচারে সই করে ম্যানেজার স্টোর ডিপার্টমেন্টের পিওনকে খাজাঞ্চির কাছ থেকে নিয়মমত টাকা আনতে পাঠিয়েছেন, কিন্তু খাজাঞ্চিবাবু তার পুরোনো দিনের অভ্যাসমত টাকা দেওয়ার ব্যাপারে ম্যানেজারের কাছ থেকে সব জেনে তবেই টাকা দিয়েছেন। এই ঘটনা খাজাঞ্চির ম্যানেজারের ওপরে খবরদারির ইষ্টি বলে ভেবেছেন। ম্যানেজার তাই খাজাঞ্চির ওপর বেজায় রুষ্ট হয়েছেন। ঐ দিন বেলা বয়ে স্নাহারের জন্য দেড় ঘন্টায় ফুটতে কারখানার মেসরে এসে স্নানের উদে খাজাঞ্চিকে স্টোর কিপার ম্যানেজার মেন মানুষ জানতে চেয়েছেন। উত্তরে খাজাঞ্চিকে ম্যানেজার ভালো লোক, পাকা লোক বলে উল্লেখ করেছিলেন। এরপর খাজাঞ্চি যখন তাঁর জুতোজাড়া ঘরের মাঝখানে রেখে মানে গেছে তখন ম্যানেজার মেসবাড়ি মেরামত ও চুনকামের তদারকিতে এসে খাজারি ঘরের মাঝে জুতো এবং তাঁর খাটে অন্য আরেক জনের খাটের থেকে ভিন্ন মুখী হওয়ার

অন্যদিকে সরিয়ে দিয়েছেন। ওদিকে ভিজে কাপড়ে খাজাঞ্চি ঐদৃশ্য দেখে যারপরনাই দুঃখিত হয়ে ম্যানেজারকে তার শাে়য়ার ব্যবস্থা দীর্ঘ চৌদ্দবছর ঐ রকম আছে বলতে ম্যানেজার রেগে গিয়ে তাকে কলের সঙ্গে এক নিয়মে থাকার কথা বলে চলে যান। এতে খাজাঞ্চির ঘরের অন্য সহকর্মি গোবিন্দ খানিক অবাক হলেও প্রৌঢ় খাজাঞ্চির কথামত তক্তপোশ পূর্বস্থানে সাজিয়ে দেয়। কিন্তু খাজাঞ্চি আরো লক্ষ করেন যে তার জুতো জোড়া এবং হুঁকো অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মনের দুঃখে বিরক্ত হয়ে খাজাঞ্চি বলেছিলেন

"নাঃ এখানকার অন্ন আমার ঘুচুলে এরা।"

এরপর সেই দিন সন্ধ্যাবেলায় ম্যানেজারের সঙ্গে খাজাঞ্চির আরেকপ্রস্ত কথা কাটাকাটি ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। খাজাঞ্চির কিছু পুরোনো অভ্যাস ছিল জুতো ঘরের মাঝখানে রাখা অথবা হুঁকো জানালার তাকে রেখে দেওয়া—যার সবগুলো ভালো অভ্যাস ছিল না, কিন্তু নতুন ম্যানেজার কারখানার মেসবাড়ি মেরামত ও চুনকামের কাজ তদারকি করার সময় কর্তৃপক্ষ হিসাবে খাজাঞ্চির সঙ্গে কিছুটা রূঢ় ব্যবহার করেছিলেন, যদিও শশী মিস্ত্রির ঘরের দেওয়াল নোংরা করাও ম্যানেজারের নজরে পড়েছিল, যা হোক পরদিন সকাল বেলায় আবার এসেছিলেন, হাতঘড়ি দেখতে দেখতে খাজাঞ্চির ঘরের সামনে দিয়ে চলে এসেছিলেন। এর কিছু পরেই অ্যাকউন্ট্যান্ট অশ্বিনী ম্যানেজারকে ক্যাশখাতা দেখাতে থাকলে ম্যানেজার খাতায় লেখার আঁকাবাঁকা লাইন দেখে এরকারণ জানতে চাইলে অশ্বিনী বলেছিলেন যে খাজাঞ্চিবাবু চোখে ভালো না দেখতে পেলেও চশমা নেবেন না, কারণ তাতে চোখ খারপ হয়ে যাবে। এরপর ম্যানেজারের নির্দেশে বেয়ারা খাজাঞ্চিবাবুকে ডেকে আনলে ম্যানেজার কঠোর ধমকের সুরে জানতে চেয়েছিলেন যে, খাজাঞ্চিবাবুর বয়স কত হয়েছে এবং চোখে না দেখে, চশমা না নিয়ে কাজ করার জন্য তাকে ভৎর্সনা করতেও ছাড়েন নি। এরপরেই খাজাঞ্চিবাবু অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে ম্যানেজারের কাজ থেকে এক বেলা ছুটি নিয়ে আসানসোল কোম্পানির মোটরগাড়ি গেলে সেখান থেকে চশমা কিনে মেসের ঘরে উৎফুল্ল হয়ে সকলের পরিষ্কার দেখার দৃষ্টান্ত দিচ্ছিলেন।

কিন্তু গল্পের ড্রামাটিক আয়রনি এরপরেই উন্মোচিত, এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই ম্যানেজার খাজাঞ্চিবাবুকে ডেকে বলেছিলেন যে অত্যন্ত দুঃখিত হলেও তাকে জানাতে হচ্ছে যে কোম্পানি খাজাঞ্চিবাবু রিটায়ার করতে অনুরোধ করে চিঠি দিয়েছে। এখন ইংরেজিতে অ্যাকাউন্ট রাখা এবং নতুন লোককে জায়গা করে দিতে খাজাঞ্চির সরে যাওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন হবে। ম্যানেজার খাজাঞ্চিকে পদত্যাগ সই করিয়ে কোম্পানির অনুদান অতিরিক্ত তিনমাসের ও বোনাস দিয়েছে বলে জানিয়েছেন এবং এরপর খানিকটা পরিহাসের ভঙ্গিতে ম্যানেজার লেছিলেন-"ধরুন বয়স অনেক হল আপনার। আর আপনার যে রকম অনুরাগশীল মন, তাতে এই নিষ্ঠা নিয়ে ভগবানকে ডাকলে অনেক কাজ হবে আপনার।"এরপরের ঘটনা অতিদ্রুত ঘটেছে। কারখানার অন্যান্য কর্মীরা খাজাঞ্চিবাবুকে বিদায় সম্বর্ধনা, মালা, বিদায় ভাজ দিয়ে অনেকের চোখের জলে কর্ম থেকে বিদায় জানিয়েছিল। পরদিন ভোরবেলার কারখানার কয়েকজন খালাসীর মাথায় মালপত্র চাপিয়ে খাজাঞ্চিবাবু চোখে নতুন চশমা নিয়ে নিরাশ মনে কারখানার ভালো চিন্তা করতে করতে কারখানার ভবিষ্যত ভগবানের জিম্মায় বেখে আবার কারখানা কেন সকালের কাজে বস্তে হয়নি জানতে চাওয়ার তার মনের একান্ত অনুরাগই প্রকাশ পেয়েছে। যার উত্তরে খালসীরা বলেছে যে খাজাঞ্চিবাবু ট্রেন যখন স্টেশন থেকে ছাড়বে তখনই কারখানার সকালের সিট চালু হবে। ম্যানেজার এই কারখানার প্রশাসনিক প্রধান হলেও গল্পের শেষে কিন্তু কারখানার আত্মার আত্নীয় হয়েই বিদায় নিয়েছেন রিটায়ার্ড খাজাঞ্চি বোদ বাবু বা বদি বাবু। এখানেই গল্পের সমাপ্তি ঘটেছে। ছোটগল্পের নানাভাবে একাধিক ঘটনা বা চরিত্রের মেলা বা কার্যকলাপ গল্পের পরিকাঠামোর ক্ষেত্রেই অপ্রয়োজনীয়। তারাশঙ্কর ছোটগল্পের আর্টিস্ট হলেও গল্পকার হিসাবে সহজ সরল অথচ জীবনমুখ্য গল্পে চরিত্র চিত্রণে স্বাভাবিক কুশলতারই পরিচয় দিয়েছেন। আলোচ্য গল্পে অপ্রধান চরিত্র কারখানার নামাঙ্কিত ও অনামাঙ্কিত বেশ কিছু চরিত্র। যেমন অ্যাকাউন্ট্যান্ট অশ্বিনী যে খাজাঞ্চিবাবুর ক্যাশখাতা ম্যানেজারের কাছে নিয়ে গেছিল। এছাড়া মিস্ত্রি শশী, ভিখারী, বদি, গোবিন্দ, এছাড়া নামহীন চরিএ, যারা করাখানায় কাজ অনুসারে পরিচিত সার্ভেয়ার, স্টোর কীপার, স্টোর ডিমার্টমেন্টের পিওন, খালাসী প্রমুখ চরিত্র।

গল্পের নামকরণ কোন কেন্দ্রীয় চরিত্র, প্রধানতম ঘটনা, ইঙ্গিতে বা সংকেত ইত্যাদি নানারকম ভাবে হতে পারে। তারশঙ্করের 'খাজাঞ্চিবাবু' গল্পের নামকরণ কাহিনি কেন্দ্রীয় বা অন্যতম চরিত্র খাজাঞ্চিকে কেন্দ্র করেই। গল্পের ভরকেন্ডে খাজাঞ্চিই আছেন। তাঁর মানভূম ফায়ার ব্রিকস কারখানায় কর্মজীবনের পরিণতি এই গল্পের প্রধানতম আলোচ্য বিষয়। গল্পের কাহিনী ও অত্যন্ত একমুখী ভাবে সেই দিকেই অগ্রসর হয়েছে। যাকে Rising action, Climax, Falling action এবং সর্বশেষে Cafastrophy অথ্যাৎ খাজাঞ্চিবাবু কর্মজীবনে আকস্মিক পরিসমাপ্তির মধ্যে দিয়েই ব্যক্ত হয়েছে। মানভূম ফায়ার ব্রিক্স কোম্পানীর গোড়া থেকে দীর্ঘ চল্লিশ বছরের কর্মি খাজাঞ্চি এবং শেষে চোদ্দ বছর তিনি খাজাঞ্চি পদে কর্মরত ছিলেন।

এই গল্পের শুরুতেই দেখা যায় যে ঐ ফায়ার ব্রিকস কারখানার খাজাঞ্চিবাবু কারখানার ম্যানেজারের জারি করা সকালের হাজিরার সময় সাড়ে ছটার দশ মিনিট আগে একদিন কারখানার ভোঁ বাজিয়েছেন। কারখানায় নতুন নিয়ম হয়েছিল যে, সকাল সাড়ে ছটার একমিনিট পর এলে কর্মর আধবেলা অনুপস্থিতি ধরা হবে। ফলে প্রাণের তাগিদে সকলেই সাড়ে ছটায়ও দশ মিনিটের আগে কারখানায় এসে দেখেছিল যে খাজাঞ্চিবাবু ঐ কান্ড করেছেন। অথচ খাজাঞ্চি নিজের কোনো উদ্দেশ্য এই কাজ করেননি, মূলত কোম্পানির ভালো চেয়ে আগের দিনের বকেয়া কাজে ঐ দিনে শেষ করার তাগিদে দশ মিনিট আগে কারখানার ভো দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু এতে কারখানায় সাময়িক অশান্তি দেখা দিলে ম্যানেজার কাজ শুরু করার পরে সাতটা থেকে সাড়ে সাতটা সকলকে খেয়ে আসার বিরতি ঘোষণা করে তখনকার মত অশান্তি সামলান। কিন্তু অনতিকাল পরেই খাজাঞ্চিবাবুকে ডেকে পাঠিয়ে নতুন ম্যানেজার তার কর্তব্য নিষ্ঠাকে গুরুত্ব না দিয়ে ভবিষ্যতের জন্য এমন কাজে সর্তক থাকতে পরামর্শ দেন। পাকে চক্রে এরপরেই কারখানার যে মেসবাড়িতে অন্য কর্মচারিদের সঙ্গে খাজাঞ্চিবাবু থাকতেন সেখানেও ম্যানেজার মেরামত ও চুনকামের তদারকিতে গিয়ে অন্যান্য দুএকজন কর্মির সঙ্গে খাজাঞ্চিবাবুরও দু-একটি বদ অভ্যাস (ঘরের মাঝখানে জুতো রাখা, চৌকিতে অন্যদের থেকে ভিন্নমুখী রাখা, হুঁকো জানলায় রাখা ইত্যাদি কারণে)

অসন্তুষ্ট হয়েনতুন ব্যবস্থার আয়োজন করেন। যা খাজাঞ্চির মত পুরোনো মূল্যবোধের প্রকৃত কর্মিমানুষের মনকে অশান্ত করে তোলে, খাজাঞ্চি-এক কর্মিকে বলে ফেলেন যে ম্যানেজার বাবুর জন্য তার কারখানার চাকরি থাকবে না। এবং ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! এর অল্পদিন পরই ক্যাশখাতা দেখতে গিয়ে খাতায় আঁকাবাঁকা লেখা ইত্যাদি দেখে ম্যানেজার খাজাঞ্চিবাবুকে ডেকে তার বয়স বাড়লে ও চশমা না নেবার জন্য তিরস্কার করেন। এর পরপরেই খাজাঞ্চিবাবু আসানসোল থেকে একবেলার মধ্যে নতুন চশমা এনে নতুন এবং পরিষ্কার দৃষ্টিতে সব কিছু দেখতে পেলেও নিজের চাকরি যে আর কদিনের মধ্যে সত্যিই চলে যাবে তা বুঝতে পারেন নি।

গল্পের কাহিনী খুব দ্রুত গতিতে ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে গেছে যখন দেখা যায় যে, ম্যানেজার কর্তৃপক্ষকে বলে ষাট বছরেই খাজাঞ্চির বরখাস্তের নোটিশে তাকে সই করিয়ে তাকে বদান্যতা করে তিন মাসের আগাম বেতন দেওয়ার কথা জানিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজারের পরিহাস সূচক ও শোনা যায় যে এই বয়সে খাজাঞ্চিবাবু ঐ রকম নিষ্ঠা নিয়ে কাজ না করে ভগবানকে ডাকলে ভবিষ্যতে তার মঙ্গল হবে। এই কথায় অত্যন্ত ব্যথিত হলেও ধীর স্থির খাজাঞ্চিবাবু প্রকৃত ভদ্র ভালো মানুষের মত কারখানা থেকে বিদায় নেবার প্রস্তুতি নিয়েছেন। কিন্তু বিদায় বেলায় ও খাজাঞ্চিবাবু নিদারুণ কর্তব্যনিষ্ঠা থেকে তাকে স্টেশনে মাল সহ পৌঁছে দেবার জন্য উপস্থিত খালাসীদের কাছে কারখানার নিয়মিত সকালের শিফ্ট শুরু হওয়ার কথা জানতে চেয়ে শুনেছেন যে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই খাজাঞ্চিবাবুর রেলগাড়ি ছাড়বে আর তখনই সাড়ে ছটার শিফট শুরু হবে কারখানায়। গল্পের পরিসমাপ্তি এই সঙ্গে দ্রুত এসে যায়। অথচ খাজাঞ্চিবাবু যে কারখানার শুধুমাত্র একজন বেতনভুক কর্মচারীই ছিলেন না। তিনি ছিলেন কারখানার প্রকৃত হিতাকাঙ্খীর একজন। সেই দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাই খাজাঞ্চিবাবু গল্প শেষ হয়েছে খাজাঞ্চিবাবু দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে কিন্তু তাতে অভিসম্পাত নেই, আছে অন্তরের অব্যক্ত যন্ত্রণা, অথচ কারখানার ভবিষ্যতেও একই রকম এগিয়ে চলার প্রতি আন্তরিক দরদ। যা লেখকের কলমে এইরকম ভাবে প্রকাশিত “সঙ্গে সঙ্গে আপন হইতেই দৃষ্টি আকাশের দিকে নিবদ্ধ হইল। কিন্তু কোথায়

আকাশ! চশমা—অবারিত পরিষ্কার দৃষ্টির সম্মুখেও যে সেখানে শুধু ধোঁয়া, ধোঁয়া আর ধোঁয়া—ওই কারখানার চিমনির উদগিরিত ধোঁয়ার আড়ালে আকাশ কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।"

৬.৩ অনুশীলনী

১। 'পদ্মবউ' গল্পে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কি চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন আলোচনা করো।

২। 'খাজাঞ্চিবাবু' ছোট গল্পের গল্পকৌশল আলোচনা করো

৩। 'খাজাঞ্চিবাবু' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করো।

৬.৪ গ্রন্থপঞ্জী

১। তারাশঙ্করের গল্পপঞ্চাশৎ, ভূমিকা।

২। আমার সাহিত্যজীবন -তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩। পরিচয়, পুস্তক পরিচয়, পৌষ ১৩৫৪।

৪। বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ধারা, মার্কসবাদী, ১ম সংকলন, অক্টোবর ১৯৪৮।

৫। আমার কালের কথা; তারাশঙ্কর স্মৃতিকথা, প্রথম খণ্ড।

৬। বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার

৭। বাংলা গল্প-বিচিত্রা

৮। বাংলা উপন্যাসের ধারা, অচ্যুত গোস্বামী

৯। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বাংলা গল্পবিচিত্রা

১০। জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ, প্রথম খণ্ড,

১১। গল্পগুচ্ছ-এপ্রিল-জুন-১৯৯৮ সম্পাদক-অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়। তারাশঙ্করের ছোটগল্পে মানুষ,

১২। শিল্পরূপ তারাশঙ্করের ছোটগল্প-প্রবন্ধ-হীরেন চট্টোপাধ্যায়

১৩। সাহিত্যে ছোটগল্প নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ

১৪। তারাশঙ্কর দেশকাল সাহিত্য ও সম্পাদনা-উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, পুস্তক বিপনি।

১৫। সাহিত্য ও সংস্কৃতি-সঞ্জীব কুমার বসু, তারাশঙ্কর সংখ্যা, বৈশাখ-আশাঢ় -১৩৭৯।

একক ৭ তারাশঙ্করের নির্বাচিত আরও তিনটি গল্প

– ডাকহরকরার, ট্যারা, না

বিন্যাসক্রম

৭.১ ডাকহরকরার

৭.২ ট্যারা

৭.৩ না

৭.৪ অনুশীলনী

৭.৫ গ্রন্থপঞ্জি

৭.১ ডাকহরকরা : একটি সমীক্ষা

৮ মার্চ ১৯৩৭ রবীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠিতে- তারাশঙ্কর জানাচ্ছেন ।

‘গল্প সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু জানবার বাসনা করি। আজকাল বাংলা সাহিত্যে গল্পের ফুলবনে নানা ফুল ফুটছে। কিন্তু আধিকংশেরই দেখি গল্পের মধ্যে কাঠামোর চেয়ে বর্ণবৈচিত্র্যের পরেই ঝোঁক বেশি। গল্পের মধ্যে কি আখ্যানভাগ থাকবে না? মানুষ থাকবে না, থাকবে শুধু মানুষের মনের একটি দীর্ঘনিশ্বাস, অথবা পুলকিত—দৃষ্টির একটি পলক? আকাশবিহারী নারদের বীনাবিষ্কৃত পারিজাতের আঘাতে ইন্দুমতীর জীবনান্ত হয়েছিল; কিন্তু তার শোকে অজরাজার বিলাপ, বেদনা কি কম মর্মস্পশী না, সাহিত্যের আসরে স্কুল বলে তার আদর কম হবে? আমি আখ্যানবৈচিত্র্য এবং মানুষের রূপের পক্ষপাতী।’

এই বোধের ভিত্তিতেই তাঁর সাহিত্যের দুই প্রধান উপজীব্য-মাটির মমত্ব আর মানুষের মহিমা। পাখির ছানাটির মরে যাবার কৈশোর আর্তি ঘিরে প্রথম রচনা, প্রথম কবিতাটির সহজ জন্ম। তাঁর অনুভুতি বিরাট, সাধনা বিরাট এবং সে সাধনার বিকাশ-প্রকাশও বিশাল বিস্তৃত সিন্ধুপ্রতিম বিপুল উত্তালতা, তদুপম নির্ঘোর্য আর অতলান্তার রহস্যাবর্ত। মানবপ্রেমে কত অন্ত্যজ অন্তেবাসীদের ঘরে অতিথি হয়েছেন তারাশঙ্কর-হাড়ি, মুচি ডেম, বেদে পটুয়া— মালাকর, লাঠিয়াল, চৌকিদার, ডাকহরকরা—সকলের মধ্যেই রয়েছে এক রসময় অমৃতদ্যুতি। বিষয়-বৈচিত্রে যেমন ব্যাপ্তি ও গভীরতা, তেমনি মালবচরিত্রও কাম ক্রোধ লাোভ মাোহ। মাৎসর্ঘের নিবার স্বাধীন প্রবণতায় প্রখর।

যদিও কল্লোল পত্রিকাই তারাশঙ্করকে আবিষ্কার করেছে। তবুও তাঁর পথ ছিল ভিন্ন, জীবনবাোধ ছিল গভীরত্র। মহাকালের প্রলয়লীলাকেই একমাত্র সত্য বলে মানেননি, তিনি নিজেই বলেছেন :

‘বিদ্রোহ ও বিপ্লবে প্রভেদ আছে। আমি বিদ্রোহের ছিলাম না। বর্তমানকে ভেঙেচুরে তাকে অগ্রাহ্য করে শূন্যবাদের মধ্যে জীবনকে শেষ করার কল্পনায় আমার মনের পরিতৃপ্তি কোনদিন হয়নি।

.... আমার মনে ভেঙে গড়ার গভীর স্বপ্ন ছিল। উত্তাল ঊর্মিলতার মধ্যে তটভূমিতে আছড়ে পড়ে ফিরে গিয়ে তটভূমি ভেঙে এবং আবর্ত সৃষ্টি করেই তৃপ্তি

পারার মত মনের গঠন আমার ছিল না। ওই ঊর্মিলতার নিচে যে স্রোতধারা প্রবাহিত হয়, যে স্রোত অহরহ সমুদ্রের বুকের ভিতর প্রবাহিত হয় আপনার বেগে আপনার পথে, আমার মনের গতি অনেকটা সেই ধরনের।’ (আমার সাহিত্য জীবন, প্রথম পর্ব)

নতুন কালের আবির্ভাব তারাশঙ্করের লেখায় একটি ধ্রুব সত্য। কিন্তু তিনি নবীনকালের মূল্যবোধ বহির্ভূত হৃয়দহীন ভোগসর্বস্বতাকে শ্রেয় বলে মেনে নিতে পারেন নি। তিনি মানুষের অপরাজেয় অভিযানে বিশ্বাসী। দুইকালের সত্য এক অসামান্য রূপকের মধ্য দিয়ে তার কাছে প্রতিভাত – ‘আমার সেকাল তার প্রকালের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নাই। চিরকালের একটি ধারা আমি তার থে দেখতে পাই।.....আমি সকল কালের সকল

ফুলের মালা গেঁথেই পরাতে চাই মহাকালের নায়। ওই অর্ধনারীশ্বর মূর্তি আমার কালের রূপ ভেদ করেই একদা আমাকে দেখা দেবেন, সদিন আমার মাল্যরচনা সার্থক হবে।' (আমার কালের কথা)

ডাকহরকরা এই ভাবনারই একটি প্রতিনিধিস্থানীর গল্প, যেখানে জৈবজীবনের প্রবণতার ঈর্ষা লোভ বর্বর প্রবৃত্তি উচু সুরে বাঁধা অথচ জীবনবোধের গভীরতায় ঝরে পড়েছে শিব সুন্দরের আশীর্বাদ।

গল্পটির প্রথম প্রকাশ প্রবাসী পত্রিকায় কার্তিক, ১৩৪৩ এ। পরে ১৩৪৪ সালে প্রকাশিত 'জলসাঘর' গ্রন্থে সেটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পরে ১৩৫৪ সালে প্রকাশিত 'রামধনু' গ্রন্থে সেটি সংকলিত হয়।

এই গল্পে নতুন ও পুরোনের মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব। ডাকহরকরা কর্তব্যনিষ্ঠ দীনুর সঙ্গে তারই আত্মজের দ্বন্দ্ব।

নিতাই, দীনুর একমাত্র পুত্র, পথভ্রষ্ট। গল্পের দীনু ডাকবাহক। বিশ্বস্ততার সঙ্গে এই কাজ সে করে চলেছে। তারই পুত্র নির্মা নিতাই এক দিন নির্জন পথে আক্রমণ করে পিতাকে, উদ্দেশ্য অর্থ লুণ্ঠন।

নিষ্ঠুর আঘাতে জর্জরিত পিতা প্রাণান্তকর চেষ্টায় সরকারি ডাক রক্ষায় সমর্থ হয়। নিতাই - নিরুদ্দেশ। সত্যবাদী দীনু কবুল করে পুত্রের কীর্তি। বহুবৎসর পরে দীনুর নামে আফ্রিকা থেকে আসে পাঁচশো টাকা। প্রেরক পুত্র নিতাই, সে মৃত। এই অব্র আঘাত একলহমায় নিষ্ঠুর সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করার পিতাকে। সে কাজে ইস্তফা দেয়। এ গল্পে মাঙ্গলিক বিচারবোধের সঙ্গে স্থূল আদিম প্রবৃত্তির লড়াই এগিয়েছে ধাপে ধাপে। গল্পের শুরু করেছেন একেবারেই নিজস্ব শৈল্পিক ভঙ্গিমায়। ডাক্তার ডাকে চালিয়েছে—বস্তুত, এই ডাক্তারের সঙ্গে কোন সম্পর্কই নেই গল্পের। প্রধান চরিত্র দীনু এসেছে আরো পরে –'উওর আসিল ডাক সরকার বাহাদুরের ডাক'–

তার পূর্বে পাঠকের সমস্ত মনোযোগ ডাক্তারের প্রতিই নিবদ্ধ থাকে। অর্থাৎ এডগার অ্যালন পো যে বলেছিলেন, 'from the very initial sentence' ছোটগল্প শুরু হয়ে

যায়, তারাশঙ্করের কলম সেই ব্যাপারে সংস্কারমুক্ত ও দ্বিধাহীন। কোন আঁটোসাঁটো ভাষা নয়, ইঙ্গিতপূর্ণ ব্যঞ্জনায় সম্ভাবনাময় নয়, অনেকটা ছড়ানো কিন্তু সটান পাঠকের মন ছুঁয়ে যায়, সহজ সরল অতির্যক ও বলিষ্ঠ।

দীনুর প্রাথমিক পরিচিত এইরকম—দীপু ডোম ডাক-হরকরা-মেল রানার, সাতমাইল দূরবর্তী আমদপুর স্টেশন হইতে ডাক লইয়া চলিয়াছে; হরিপুর পোষ্ট অপিসে। এই পরিচিতির ঠিক আগেই অপ্রধান চরিত্র ডাক্তারের দৃষ্টিতেই দীপুর সামগ্রিক অবয়বের অনুপুঙ্খ বর্ণনার উদ্ভাস—

ঘন্টাধ্বনি স্পষ্টতর হইয়া উঠিল, লোকটির হাতের আলোতেই ডাক্তার দেখিল— 'বেঁটে কালো, আধা বয়সী এক জোয়ান কাঁধের উপর মেল ব্যাগ ঝুলাইয়া সমান একটি তাল বজায় রাখিয়া ছুটিতে ছুটিতে চলিয়াছে। তাহার মাথায় ছেড়া একটি মাথালি,একহাতে একটি বল্লম, ওই বল্লমটারই ফুলার সঙ্গে ঝুলানো ঘন্টা ঝুনঝুন শব্দে বাজিতেছে।'

এই বর্ণনা লিখিত হলেও শ্রব্য। পাঠকের মনোযোগ মুহূর্তেই ডাক্তারের দিক থেকে ঐ গতিশীল মানুষটির দিকেই ঘুরে যায়। এ প্রসঙ্গে জরাসন্ধের মতামত মূল্যবান :

'প্রত্যেক লেখকের রচনাই তার দৃষ্ট এবং পরিচিত দেশ ও সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে লেখকমাত্রই আঞ্চলিক, কিন্তু যে মানুষের কথা তিনি (তারাশঙ্কর) বলেন, তাদের চেহারা বেশভুষা ভাষা রীতিনীতি একটি বিশেষ দেশ বা অঞ্চলের হলেও তারা দশজনের অন্তরস্পর্শ করে, তাদের মধ্যে এমন কিছু দেখতে পাই, যা সর্বদেশের সর্বকালের...'

গল্প বলে শ্রোতাকে টেনে নিয়ে যাবার ঝোঁকটা রপ্ত করেছিলেন তারাশঙ্কর। সর্বত্রই যে খুব উপাদেয়, তা নয় কিন্তু কোন অন্তরেখ না থাকলেও পাঠক কে টানে ঠিকই। তার বর্ণনা নৈব্যক্তিক, কিন্তু পরিপূর্ণ। ডাকঘরে পৌঁছে যাবার পর বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিচিত্র লোকের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে স্বাদু টেনশান না থাকলেও যথেষ্ট কৌতুলোদ্দীপক – 'কই হে, কাগজ খানা দাও দেখি, যুদ্ধের খবরটা একবার দেখি! ....কালীবাবুর সংবাদপত্রের সংবাদের জন্য উৎকট নেশা, তিনি হাত বাড়াইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন ।আর

ছিল গোবিন্দ রায়, লোকটি স্কুলমাষ্টার, তাহার নেশা যত ফ্রী স্যাম্পলের।.....আর আসিয়াছিল, আকাবাঁকা হাতের লেখা চিঠির জন্য কয়জন যুবক। প্রৌঢ় রামনাথ চাটুজ্জ্যেও আজ আসিয়াছিল দূর দেশে তাহার জামাইয়ের খুব অসুখ, চাটুজ্জ্যে উৎকণ্ঠিত হইয়া একপাশে দাঁড়াইয়া ছিল। প্রত্যেকখানি চিঠির ঠিকানা পিয়ন পড়িয়া শেষ করে, এদিকে চাটুজ্জ্যে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে—এচিঠি তাহার নয়। ইনসিওর-রেজিষ্ট্রির কাজ শেষ হইয়া গেল। দীনুর এবার ছুটি সে বাড়ি চলিল।.....

...পথে রামনাথ চাটুজ্জ্যের বাড়িতে তখন মেয়েদের বুকফাটা কান্নার রব উঠিয়াছে। সে ধ্বনির মর্মচ্ছেদী বেদনাস্পর্শে এই প্রভাতেও শ্রাবণের আকাশ যেন কাঁদি ফাঁদি কয়িতেছিল।

দীনু চলিতে চলিতেই একবার আপন মনে বলিল আহা!'

দীর্ঘ বর্ণনা, বহুমুখী তথ্যের ইঙ্গিতবাহী, বিষামৃতের বাহক ডাকহরকরা। আন্তজার্তিক সংবাদ পরিবেশনের পরোক্ষ দায়িত্ব থেকে শুরু করে পারিবারিক স্নেহ-প্রেম—শোক-দুঃখ সমস্ত সংবাদেরই অংশীদার সে। দীনুর ঐ 'আহা' শব্দটির বিস্তার কত দূরগামী! এ শোক শুধু বৃদ্ধ রামতারণের বাড়িরই নয়, মানসিক সাযুজ্যে, দীনুও শোকগ্রস্ত। শুধু তাই নয় পরবর্তীকালে দীনুর জীবনের যে সর্বযানের নিধোর্ন, তাও কি ধ্বনিত হয় না ঐ 'আহা' শব্দে? প্রখ্যাত সমালোচক হার্বার্ট গোল্ড সম্ভবত এই ইঙ্গিতধর্মিতার কথা মনে রেখেই তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'International Symposium on the short story তে বলেছেন: The story typically centres on the inward meaning of a crucialto concentrate on some significant moment, some instant of perception অথাৎ এটা স্পষ্ট যে ঘটনার নানা অভী চিত্রময় হয়ে ওঠে এই পর্যবেক্ষণ দক্ষতার গুণেই।

এ গল্প দ্বন্দ্বের গল্প, মূল্য বোধের দ্বন্দ্ব, বিষাদমন্থর প্রাচীনের সঙ্গে নবীনপ্রজন্মের লড়াই। গল্পের মোড়কের পরতে পরতে জড়িয়ে আছে সেই জট।

হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম, অবিশ্রান্ত গতিতে সরকারি ডাক বিশ্বস্ততার সঙ্গে পৌছে দিয়েছে পিতা দীনু, আর একই বৈপরীত্যে পুত্র নিতাইয়ের জীবনচর্চার চিত্র দীনুর স্ত্রীর জবানিতে এইরকম:

দীনু স্ত্রীকে প্রশ্ন করিল,নেতাই কোণা, মাঠে গিয়েছে? নিতাই দীনুর একমাত্র পুত্র। স্ত্রী বলিল জানিনা না বাপু,কাল সনজেতে সেই বেরিয়েছে । এখন ফেরে নাই।সারা রাত আখরাতে মদ খেয়েছে।আর ঢোল বাজিয়ে সাব চেঁচিয়েছে। দুবার আমি আমি ডাকতে গেলাম তো আমাকে তেড়ে মারতে এল।

দীনুর মেজাজ গরম হইয়া উঠিল, সে রুক্ষ স্বরে বলিল, লবাবের বেটা লবাব।

এই কথা শুধু পিতা দীনুর না, নিষ্কর্মা, ধৃষ্ট, আয়েসী প্রজন্মের প্রতি স্বয়ং লেখকেই ধিক্কার। 'আমার সাহিত্য জীবন প্রথম পর্বে' তিনি কবুল করেছেন তা

'আমার পাত্রপাত্রীর মুখে আমার ভাবনা চিনার ভাষাই বেরিয়ে আসে। ঠিক একই কথা পাশ্চাত্য সমালোচনার Louis Harap বলেন The artist becomes the expressive instrument of all the people নিতাই যে যুবশ্রেণীর প্রতিনিধি; সেখানে কোমলতার চেয়ে রুক্ষতা, নমনীয়তার চেয়ে কঠিন্য বেশি। লোভ পাপ হিংসা ঔদ্ধত্য, সর্বদাই উদগ্র উৎকণ্ঠ। দীনুর গানে আধ্যত্মিক নিবেদন, ওরে আনার কালো মেয়ে ভোবন কারিছে আলো, আর নিতাইয়ের তরল মস্তিষ্কের ঝঙ্কার 'পীরিতি হল শূল সখী, পীরিতি হল শুল। ও আমি উঠিতে লারি, আমার হাত ধরে তুলগো।' পিতা-পুত্রের প্রতিটি সাক্ষাৎতিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে পাঠককে। দীনুর ঘাম ঝরানো সৎপথে পরিশ্রমের বৈপরীত্যে নিতাইয়ের দাম্ভিক আচরণ নিতাই ট্র্যাক খুলিয়ে ঠং করিয়া একটা টাকা দুড়িয়া ফেলিয়া দিল। যেন নিতাই তুচ্ছ বস্তু সেটা। আর এই অর্থগমের উৎস সম্বন্ধে তার ব্যঙ্গমিশ্রিত তাচ্ছিল্য :

নিই হি করিয়া হাসিয়া নিতাই উওর দিল, রাজারা মানিক কোথায় পায়?

অসদাচরণ, অর্থপ্রাচুর্য, অনাবশ্যক আড়ম্বর নিতাইয়ের বিপদগামিতাকে একটু একটু করে উন্মুক্ত করেছে। গদ্য নিজেই এখানে প্রতীক।

অথচ ‘বেঁটে কালো আধবয়সী’ দীনুর স্নেহ-দৃষ্টিতে পুত্র নিতাইয়ের শারীরিক সৌন্দর্য ভরা জোয়ান হইয়া নিতাই। সুন্দর সুগঠিত সবল দেহখানিকে যেন কালো পাথর কুঁদিয়া তৈয়ারি করিয়াছে। সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া একটা অস্থির চঞ্চলতা খেলা করিতেছে, মনে হয় ইচ্ছা করিলে নিতাই আকাশে উড়িয়া যাইতে পারে।

এই বর্ণনা ভাস্করের দক্ষহাতে ছেনি-বাটালিতে কুঁদে কাটা। নবীন প্রজন্মকে স্বাগত জানিয়ে প্রবীণের স্নেহ দৃষ্টির উদারতা।

কিন্তু এই স্নেহাদরকে উপেক্ষা করেছে নিতাই, পিতার প্রতিটি কাজেই তার চরম তাচ্ছিল্য ‘সারা পথ, টুকুর ধুকুর করে ছোটা, উকি মানুষে পারে? এ উক্তি যেমন শ্রমবিমুখতার স্মারক, তেমনি যাও যাও বকো না বেশি তুমি। বুদ্ধি থাকলে এতদিন বড়নোক হয়ে যেতে তুমি কোনদিন।

—এই নিদারুণ উদ্ধৃতি অসৎমনোবৃত্তির ইঙ্গিতবাহী। এই দ্বন্দ্বের চরম মুহূর্ত চিত্রিত করেছে*ন* তারাশঙ্করের টানটান, রুদ্ধশ্বাস চলচ্চিত্রের মতো ঘটনাগুলি :

ডাকাত। ডাকলুটিতে আসিয়াছে। মুহুর্তে দীনু ক্ষিপ্রগতিতে সরিয়া দাঁড়াইয়া হাতের বল্লমটা উচু করিয়া ধরিল, বলিল,

খবরদার, সরকারের ডাক। এই দেখ, বস্তাটা দাও বলছি।

দীনুর হাতের বল্লমটা থরথর করিয়া কাপিয়া উঠিল, সে বিকৃত কণ্ঠস্বরে বলিয়া উঠিল --নেতাই?

নিতাই ধাঁ করিয়া দীনুর কম্পিত হস্ত হইতে বল্লমটা কাড়িয়া লইল। পার—মূহর্তে স শিকারী পশুর মত মেল ব্যাগের উপর লাকাইয়া পড়িল, দীনুপড়িয়া গেল, মাথার মাথালিটা গড়াইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু তবুও সবলে মেল-ব্যাগ দীনু নিজের বুকের মধ্যে আঁকড়াই ধরিয়া বলিল, সর্ব্বনাশ হবে নেতাই- কালাপানি—ফাঁসি হয়ে যাবে-

নিতাই ক্ষুধার্ত পশুর মত ব্যাগটা ধরিয়া টানিতেছিল, টানিতে টানিতেই হিংস্রভাবে সে বলিল, তখন বললে না কেন-বশে রেখে দিলাম এমন করে? দাও বলছি, রাতরাতি

দেশ ছেড়ে পালাব, চল। দীনু এবার উচ্চকণ্ঠে স্কিার করিয়া উঠিল ডাকাত-ডাকাত। নিতাই বিপুল হিংস্রতায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। এলড়াই প্রজন্মগত ব্যবধামের কালসীমাকে অতিক্রম করে গেছে। চিরন্তন ন্যায়অন্যায়, সৎ-অসৎ মূল্যবোধের যুদ্ধ। এ যুদ্ধ পুণ্যের জয় হয়েছে ঠিকই। নিতাই লাঠির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করেছে পিতা দীনুকে। তা সত্ত্বে ব্যাগটি রক্ষায় সম্পূর্ণ সমর্থ বৃদ্ধ পিতা :

'আলোটা অতি নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল, নিতাই ব্যস্তভাবে আর একবার ব্যাগটা ধরিয়া আকর্ষণ করিল, কিন্তু দীনুর জ্ঞান তখন লুপ্ত হয় নাই, অগত্যা নিতাই ব্যাগটা ছাড়িয়া দিয়া ছুটিয়া অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়া গেল।'

তারাশঙ্কর দীনুর আত্মদ্বন্দ্বের রূপটিও ফুটিয়েছেন তীক্ষ্মভাবে। কখনো দীর্ঘশ্বাস, কখনো ইতস্তত স্বরক্ষেপণ, কখনো নির্বাক ভঙ্গী— এই টুকরো অভিব্যক্তিগুলি পরের পরে সাজিয়েছেন লেখক। আপন পুত্রের কুকীর্তি গোপন না করে সংবোধের সঙ্গে পুত্র স্নেহের তীব্র আশ্লেষ আচ্ছন্ন করেছে দীনুকে। তার পিতৃসত্তা বারবার পুত্রকে, তার অপরাধবোধকে আড়াল করতে চাইছে :

'দীনু অকস্মাৎ যেন বলিয়া উঠিল, হুজুর। কিছু বলবে আমায়? কি বলবে, বল? দীনু অতিকষ্টে বলিল, হুজুর আমার ছেলে তোমার ছেলে তোমার ছেলেকে তুমি দেখতে চাও? দীনু নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল, কহিল হা হুজুর।'

এই বাঁচা পিতৃত্বের স্নেহাসক্তির। কিন্তু শুভ-অশুভের দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত শিউরে উঠিলেও দীর্ঘলালিত কর্তব্যনিষ্ঠার তাগিদে কবুল করেছে মেলরানার তার পুত্রেরই নাম- দীনু বিহবলের মত চাহিয়া থাকিতে থাকিতে বলিল, হুজুর আমার ছেলে নেতাই।

-এই বিহবল যন্ত্রণা নিজের হৃৎপিন্ডের উপড়ে ফেলার :

অথচ'পুলিশ কিন্তু নিতাইকে পাইল না সে রাত্রি হইতে নিতাই নিরুদ্দেশ। সন্দেহ নেই এই দুটি ঘোষণায় স্বস্তি পেয়েছে পিতা দীনু, আর সম্ভবত নিতাইয়ের ভবিষৎ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন থেকেও পাঠকেও গোপন স্বাচ্ছন্দ্যঅনুভব করেছেন।

এ গল্পের পরিণতি পরে আলোচ্য। তৎপূর্বে বলা উচিত, আলোর ব্যবহার অসাধারণ তীকী তাৎপর্য বহন করেছে। প্রকৃতি সার্থক উদ্দীপন বিভাব। প্রতীক সম্পর্ক কোলরীজ বলেন: a symbol is characterized by a transluence of the special in the indi vidual, or in the general in the special, or of the universal in the general. দীনুর মানসিক উত্থান পতনের সমান্তরালে শ্রাবণসন্ধ্যা, লণ্ঠন অথবা জোনাকির আলো কিংবা কার্তিকের হিম-ঝরা রাত অসাধারণ ব্যঞ্জনাগভী।

গল্পের প্রারম্ভেই দেখি শ্রাবণমাসের কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিতে 'চারিপাশে শুধু অজস্র সঞ্চরমান নোকির দীপ্ত জুলে আর নেবে জুলে আর নেবে, যেন অসীম অনন্ত গাঢ় মৃত্যু-পরিবাপ্তির মাঝখানে ক্ষণস্থায়ী জীবনদীপ্তি জন্ম জন্মান্তরের মধ্যে দিয়া বিকাশ পাইয়া পাইয়া চলিয়াছে।'

ডাকহরকরার চিরন্তন ছুটে চলার সঙ্গে সমীকৃত এই জীবনদীপ্তির বিকাশ। মুহূর্তে দীনু পার হয়ে যায় যোজনদূরত্ব, ঠিক জোনাকির মতোই ক্ষুদ্র তার হারে আলোর দীপ্তি। আর পরমুহুর্তে লেখক হারিকেনের আলোর শিখায় ধোঁয়াটে কম্পমানতাকে প্রকট করেছেন :

'হাতের হারিকেনটার শিখা দ্রুতগমনের জন্য কঁপিয়া কঁপিয়া ধোঁয়ার চিমনিটাকে প্রায় কালো করিয়া তুলিয়াছে।'

এই কম্পমানতা পথশ্রম, ক্লান্তি, দুর্যোগ, শ্বাপদশঙ্কা লুণ্ঠনভীতি-সমস্ত কিছুকেই একযোগে প্রকট করেছে। জমাট অন্ধকার ভেদ করে অজগর জিহ্বার মতো বিদ্যুৎ রেখার' আনাগোনা সুতীক্ষ্ম নীলরেখায় দিগন্ত পারিব্যাপ্ত করে বজ্রপাত শঙ্কাবহুল কর্মজীবনের প্রতীক, তেমনি। দায়িত্বটি যে শুরু, সে সত্যেরও দ্যোতক। নিতাই এবং দীনুর সংঘাতের ঠিক পূর্বেই প্রকৃতির ছমছম রূপ:

'তারকাদীপ্তিহীন মেঘলা আকাশ যেন অন্ধকারের মধ্যে মাটির বুকে নামিয়া আসিয়াছে, দীনুর হাতের আলোটা ধোঁয়ার কালিতে অন্ধ চক্ষুর মত জ্যোতিহীন পান্ডুর।'

আসন্ন প্রাণঘাতী দুর্যোগের পটভূমি নির্মাণ করেছে এই বিবৃতি। আফ্রিকা থেকে দীনুর নামে অজানা প্রেরক প্রদও সাড়ে পাঁচশো টাকা দীনুর মনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, সেখানেও প্রকৃতির সক্রিয় ভূমিকা।

কার্তিক মাসের স্বল্প শীতকাতর রাত্রির শেষ প্রহরে দীনুর অনুভূতিতে হিমশীতল শীতজর্জর; 'আকাশে শেষ রাত্রির জ্যোৎস্না তখন ঘোলাটে হইয়া আসিয়াছে। চাঁদ পাণ্ডুর সাতভাই' তারাগুলি ও ডুবিল বলিয়া। শেষ রাত্রির বাতাসে যেন হিম করিতেছে।' -প্রতিমুহূর্তের উৎকণ্ঠা, তীক্ষ্ম টানটান টেনশন্ দীনু এবং পাঠক উভয়কেই একযোগে অধিকার করেছে।

এই প্রতীকায়িত বিভাবে বিষয়ের গভীরে বিষয়ীর সম্পূর্ণ আত্মনিমজ্জন ঘটেছে : 'ভোর হইয়া গেল নাকি? কই আকাশে ভুল্কো তারা কই? কিন্তু দীনুর যে এখনও অনেক পথ বাকি। এই তো ষোল মাইলের পাথর সে পার হইল। এখনও যে তিন মাইল তাহাকে বাইতে হইবে।'

তারাশঙ্করের লেখক সত্তার সবটুকুই আত্মীভূত রচনার গভীরে। এই বিবরণে তৈরী হয়েছে ঘটনা- স্পন্দিত নাটকীয়তার মিশেল।

সংলাপে বীরভূমী আঞ্চলিকতা সৃষ্টি করেছেন লেখক। আধিকাংশ ক্ষেত্রেই আঞ্চলিক ও শ্রেণী উপভাষা উভয়ই ব্যবহৃত। সনজে, ভোবন, লক্ষ্মী, লবাব, কেনে, নেতাই, করন শব্দ ব্যবহার করে তৎসম শব্দবহুল ধ্রুপদি বর্ণনার সমান্তরালে পৃথক ঝঙ্কার সৃষ্টিতে সক্ষম লেখক।

একই শব্দে একাধিকবার ব্যবহার করে কাঙ্ক্ষিত ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতেও লেখক সার্থক। 'থাকিতে থাকিতে অকস্মাৎ তাহার মনে হইল উঃ এমন সংবাদ এই দীর্ঘকাল ধরিয়ানি নিত্য কত কত সে বহিয়া আনিয়াছে। কত কত কত সংখ্যা হয় না'।

'কত' শব্দটির বহু প্রয়োগ নিষ্ঠুর সত্যের রোদনধ্বনিকেই শ্রুতিগোচর করে তুলেছে। এ গল্পের সমাপ্তি বিষয় স্তব্ধতার দীর্ঘায়িত অনুরণন সৃষ্টি করেছে। নিতাইয়ের মৃত্যু সংবাদ এবং তার অন্তিম নির্দেশ মতো, আফ্রিকার কোম্পানি সঞ্চিত অর্থ প্রেরণ করেছে

দীনুকে। ভাগ্যের পরিহাসে ডাকবাহক দীনুই সংবাদটি বহন করে এনেছে। তখনই অদ্ভুত নিষ্ঠুর সত্যটি দীর সম্মুখে উদঘাটিত :

'মনে হইল আজ পর্যন্ত যত রোদনধ্বনি সে শুনিয়াছে, সে সমস্ত দুঃসংবাদ সে-ই বহন করিয়া আনিয়াছে।

চোখের জল মুছিয়া সে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল আমি আর কাজ করব না। বাবু, কাজে জবাব দিলাম।

সমারসেট মম The Summing গ্রন্থে বলেছিলেন, 'I prefer to end my shorts stories with a full stop, rather than with a struggle of dots'

এ গল্পেও পরিণতি চূড়ান্ত মুহূর্তের নাটকীয় মন্থনের স্তব্ধতা সাধিত। আপন পুত্রের মৃত্যুসংবাদ বহন করার দায়ভাগ ক্রমশই দীর্ঘ গুরুভার হয়ে নিতাইয়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছ পৃথিবীর তাবৎ দুঃসংবাদের নিদারণ নিষ্ঠুরতাকেই বহন করার দোষে চিরদোষী সে। এই আত্মধিক্কার, চাকুরী সম্পর্কে আজীবনলালিত গৌরবের স্মারকটি চূর্ণ করেছে। এক অতল নিরলম্ব শূন্যতায় তলিয়ে যাওয়া থেকে বাঁচার প্রনান্তকর প্রচেষ্টায় তার অন্তঃস্থল বিদীন করে হাহাকারের জমাট কান্নার সংযত বহিঃপ্রকাশ :

'আমি তার কাজ করব না বাবু, কাজে জবাব দিলাম।'

এই বোধ অচৈতন্যের অন্ধকার থেকে চৈতন্যের দীপ্তিতে ফিরে আসার প্রভায় ভাস্বর। বিষন্ন মন্থর, কিন্তু নিতাই এবং পাঠকের পক্ষেও মুক্তির, স্বস্তির। হয়তো বাকি ভবিষ্যৎ শুধুই শোকগ্রস্ত পিতার অসহায় দিন যাপনের গ্লানিতে পরিপূর্ণ থাকবে, কিন্তু সে ছবি পাঠকদের দেখান নি লেখক, বাতার ইঙ্গিতেও দেননি।

আলোচনার সুবাদে ডাকহরকরা নামকরণটিকে যাচাই করা দরকার। সংবাদ বিলি করে যে, সেই ডাকহরকরা ও ডাকহরকরা দীনুর জীবনকাহিনীই তারাশঙ্করের উপজীব্য। নৈব্যক্তিব এবং বিশেষ উভয় দৃষ্টি কোন থেকেই নামকরণটি বিশ্লেষণ করা যায়। মেল রানার সমান বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। কথা বলিতে বলিতেই সে গাড়ি অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে। সাধারণভাবেই সংবাদবাহকের দায়িত্বশীলতা ক্ষিপ্রগতি, বিশ্বস্ততা পথের

বিপজ্জনক পরিস্থিতি প্রকৃতির বিমুখতার মধ্যেও অটল কর্তব্য নিষ্ঠা-এই সব বৈশিষ্ট্যগুলিই খন্ড বিক্ষিপ্ত চিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক।

'ডাকহরকরা তাহার অভস্ত নির্দিষ্ট গতিতে ছুটিতে ছুটিতে চলিতেছিল।...এই ছুটিয়া চলাটা তাহার বেশ অভ্যস হইয়া গিয়াছে, তাহার কাঁধে সরকারী ডাক, পথে তাহার এক মিনিট বিশ্রাম উপায় নাই- হুকুম নাই। গতি পর্যন্ত শিথিল করিতে পাইবে না।

ডাকবাবু বলেন, এক মিনিটের ফেরে হাজার হাজার লোকের সর্বনাশ হবে যাবে দীনু;

বর্ণনা নৈব্যক্তিক, রানারের কর্তব্যের গুরুত্ব বোঝাতে সচেষ্ট লেখক। দীনুর ক্ষেত্রে নিষ্ঠা শৈথিল্য একেবারেই অনুপস্থিত।

নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত খবর বহন করা, নিরাপদে ডাকরক্ষাই ডাক হরকারার ধর্ম, এই বোধই দীনকে আচ্ছন্ন করেছিল গৌরবান্বিতও। তাই অসৎপুত্র নিতাইয়ের ডাবলুণ্ঠনের হিংস্র প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়। আত্মিক সৎপ্রবৃত্তিরমূল থেকে উঠে আসা স্বীকারোক্তির তাগিদেই সে কবুল করে নিজ পুত্রের নাম।

নিতাই নিরুদ্দেশ হওয়ায় পরেও দুরন্ত কর্মজীবনে কোন ছেদ বা ক্লান্তি লক্ষ করা যায় নি। তারপর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইয়া গেল। এগারো বৎসর। দীনু আজও ডাক হরকরার কাজ করিতেছে। অন্ধকারে জ্যোৎস্নায় বাদলে বর্ষায় দুরন্ত শীতের রাতে এখনও সে তেমনি কোমরে পেটি বাঁধিয়া বল্লম আলো হাতে ডাক লইয়া যায় আসে। এখনও তাহার ঘড়ির কাঁটার মতো গতি। কিন্তু নিতাইয়ের মৃত্যুর খবরের বাহক সে, এই তীব্র সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দীনু ডোম উপলব্ধি করেছে তার চাকরির অন্যদিক, যা নিষ্ঠুর নিষ্করুণ। নীলকণ্ঠের মতো বহু শোক সংবাদের বিষ সে ধারণ করেছ, এই তথ্য একমুহূর্তে কর্মগতিপ্রবাহের সমস্ত গৌরব ধূলিসাৎ করে দাঁড় করিয়েছে বৈরাগ্যের গেরুয়াভূমিতে। নামকরণটিও দুঃখ মহিমার আলোকে অসাধারণ সার্থকতা পেয়ে যায়।

দীনুরপুত্র নিতাইএর কথা না বললে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকে। নিতাই দীনুর আত্মজ। মানুষ পুত্রের মধ্যে নিজ আত্মাকে প্রত্যক্ষ করে, তাই পুত্র তার প্রিয়। নিতাই কিন্তু দীনুর হুবহু প্রতিবিম্ব তো নয়ই, বরং বিপরীত। রুচি জীবনযাপন, চিন্তা ভাবনা সব

দিক থেকেই তার চরিত্র ছুরির ফলার মতোই পাঠককে বিদ্ধ করে। অলসতার পক্ষে তার নিজস্ব যুক্তি:

ধু-রো, মাঠে গিয়ে কি হবে? মাঠ গিয়ে কে কবে বড়লোক হয়েছে, শুনি? অসৎপন্থায় অর্থ রোজগারই তার কাম্য যাও যাও ব'কো না বেশি তুমি। বুদ্ধি থাকলে এতদিন বড়নোক হয়ে যেতে তুমি।

শুধুমাত্র আত্মচিন্তায় সে বিভোর জান্ত বতাগিদে পিতার উপর হিংস্র আক্রমণেও সে অকুণ্ঠ। এর অর্থ লুণ্ঠনের অসৎপ্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়েছে, কিন্তু পৈশাচিকতা হয়েছে অনাবৃত।

সেই নিতাই নিরুদ্দেশ। পুত্রশোকের জমাটপ্রস্তর কাঠিন্যকে আত্মীকৃত করেও পিতার কর্তব্যনিষ্ঠ রূপটাই অধিকার করে রাখে পাঠকের বোধকে।

তারাশঙ্কর নিতাইকে সংশোধন করেছেন। 'আমার সাহিত্য জীবন' গ্রন্থে নিজেই বলেছেন 'সাহিত্যিকের মধ্যে আমরা শুভবুদ্ধির আশা করব, অন্তত যখন তারা সমাজের পক্ষে ব্যক্তির পক্ষে বিপজ্জনক উপাদান নিজে সৃষ্টি করেন, তখন।'

নিতাই এর মধ্যেও শুভবুদ্ধির অস্তিক্য বোধ জেগে উঠেছিল। সুদূর আফ্রিকায় সে সৎপথেই খালাসির কাজ করে শ্রমের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করেছে। আত্মশুদ্ধির চরম নিদর্শন মৃত্যুকালীন ইচ্ছাটি, পিতাকেসঞ্চিত পাঁচশো টাকা প্রেরণ।
'বৃহদারণ্যকোপনিষৎ'এর অনতিচেনা এই ছত্রগুলি মৃত্যবিষয়ে ভারতীয় ভাবুকতার একটি অবিস্মরণীয় নিদর্শন :

হিরন্ময়ের পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।

তৎ ত্বং পূষন্নাপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।

.....

যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহহমস্মি।

বায়ুরনিমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীর।

—অর্থাৎ, সুবর্ণ পাত্রের দ্বারা তথা জ্যোতির্ময় সূর্যমণ্ডলের দ্বারা সত্যের স্বরূপটি আবৃত বা তিরোহিত অবস্থায় আছে। হে জগৎ পরিপোষক সূর্য, আমি সত্যনিষ্ঠ, সত্যের স্বরূপটি যাতে আমার দৃষ্টির তথা অনুভবের গোচরে আসে, সেজন্য আপনি ওই আবরণ উন্মোচন করুন। ...

আমিই সেই পুরুষ, আমিই সেই অমৃত। সত্যনিষ্ঠ আমার দেহ ত্যাগের পর আমার প্রাণবায়ু মহাবায়ুতে লীন হোক। তারপর আমার এই দেহের ভস্মাবশেষ পৃথিবীর হোক।

নিতাইয়ের মাধ্যমেই সেই অমৃত উৎসার ঘটিয়েছেন লেখক। দীনুর আত্মজ গল্পের সমাপ্তিতে পরিপূর্ণ শুদ্ধচেতনার উত্তরিত। মৃত্যুর পূর্বেই সে শুচিস্মিন্ধ সংশোধিত অমৃতের পুত্র। দীনুর যোগ্য উত্তরাধিকারের দায়িত্ব পালনে সেও পরোক্ষ সংবাদবাহক। সেই সংবাদ অনুশোচনা দগ্ধ পুত্রের আত্মনিবেদন, তার পিতার পদপ্রান্তে শেষ শ্রদ্ধার্ঘ্য। এইখানেই দুই-কালই মিলেছে সার্থক মাঙ্গলিক বিন্দুতে।

৭.২ ট্যারা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার সার্বভৌম জীবনশিল্পী হলেও তাঁর রচনায় বিশেষ করে সেছে সেই সব ব্রাত্য মানুষের কথা, যারা শিক্ষিত ও সভ্যতাভিমানী আর্য সমাজের সরজ্ঞাত অবহেলিত। ট্যারা ছোটগল্পটি লেখকের এই মনোভঙ্গির-ই প্রতিফলন। কিন্তু গল্প নিছক অন্ত্যজ শ্রেণি-সমাজের কথকতা নয়, শারীরিক ত্রুটির কারণেও মানুষ যে এই আজে ব্রাত্য হয়ে ওঠে – এ তার কাহিনি; আর এই সমাজের বক্রদৃষ্টিকে উপেক্ষা করেও এ যে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে - এ তার কাহিনি।

'ট্যারা' গল্পের শুরুতে লেখক এই কাহিনি - দৃশ্যের সম্পর্কে বলেছেন, "বর্ণ নাই, বৈচিত্র নাই, সমারোহ নাই, নিতান্ত নগণ্য পার্শ্বদৃশ্য।" তাহলে এই 'বিশেষত্বহীন' দৃশ্যপটের বিশেষত্ব কোথায়? বিশেষত্ব এ গল্পের গঠনে, চরিত্রায়ণ ও সমাজ প্রেক্ষিতে, ভাষাবৈশিষ্ট্যে। এ সমস্ত কিছুই লেখক পরিপাটি করে সাজিয়েছেন সামাজিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে উত্তরণের কাহিনিকে তুলে ধরার জন্য।

গঠনগত দিক থেকে 'ট্যারা' গল্পটিকে ছয়টি খন্ডে ভাগ করা যেতে পারে –

১. বাবা, মা ও ঠাকুরমার সঙ্গে ট্যারার স্বাভাবিক নিশ্চিন্ত বাল্য জীবনযাপন।

২. কলেরায় মাত্র দু-দিনের মধ্যে ট্যারার বাবা, মা ও ঠাকুরমার মৃত্যু।

৩. অনাথ ট্যারার গ্রামপ্রান্তের দেবায়তনে আশ্রয় লাভ।

৪. ট্যারার দেবায়নের গো-পালন; মন্দিরের মোহান্ত ও তার সহচরদের প্রকৃতি উন্মোচন।

৫. বড় হয়ে ওঠা ট্যারার প্রকৃতিগত রূপান্তর ও মানসিক রূপের পরিচয়, মোহান্তের ভয়ে দেবায়তন থেকে তার পলায়ন।

৬. সন্ন্যাসীবেশে ট্যারার দেবায়তনে পুনরাগমন, মোহান্তের পরামর্শে ট্যারার ঘর-বাঁধার আকাঙক্ষ নি:স্বার্থভাবে মহান্তের সেবা করা, মহান্তের মৃত্যুতে নির্জনে একাকী শোকপ্রকাশ, অতীত জীবনের রোমন্থন ও পরিশেষে প্রকৃতির কোলে ট্যারার অদৃশ্য হয়ে যাওয়া। গল্পের গঠনগত এই রূপের সঙ্গে লেখক নাটকের ছায়াপাত ঘটিয়ে এক অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীর এই রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যপট রচনায় ও আলোক সজ্জায় রয়েছেন কোন এক অদৃশ্য মঞ্চশিল্পী। তিনি-ই যেন লেখকের হাত দিয়ে এ গল্পের পটভূমি ও তার পরিবর্তনের কথা উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবেই উল্লেখ করেছেন –

১. "দরিদ্র পল্লীর মধ্যে একখানি কুড়েঘর। সেই পটভূমির সম্মুখে ছোট একটি পরিবার, শয়ানের বুড়ি মা, নয়ান, নয়ানের স্ত্রী আর নয়নের নয়-দশ বছরের ছোট ছেলে ট্যারাকে খা যায়। এই পটভূমিতেই ট্যারার বাল্য জীবন যাপন ও কলেরায় বাবা, মা, ঠাকুরমাকে হারিয়ে অনাথ হওয়া।

২. "অনাথ ট্যারার জীবনের পটভূমি বাড়িয়া গেল।" সে ঠাই পেল গ্রাম-প্রান্তের মহাপীঠ দেবায়তনে।

৩. "ট্যারার জীবনের পশ্চাতের পটভূমি আবার পরিবর্তিত হইয়া গেল। পটভূমিতে রহিল নিবিড় বন-বেষ্টনীর শান্ত উদাসীনতার মধ্যে সুউচ্চ দেবভবন, নাটমন্দির তাহার সম্মুখে পুষ্করিণী।" এই পটভূমিতেই গো-পালকরূপে তার বড় হয়ে ওঠা।

৪. তিন বছর পর "দৃশ্য পটের পরিবর্তন বিশেষ কিছু হয় নাই। একটা বড় শিরীষ মরিয়া শুকাইয়া গিয়াছে। তেঁতুল গাছগুলার ডাল কাটা হইয়াছে। নিবিড় বনশোভা যে ঈষৎ শীর্ন হইয়া আসিয়াছে।" এই পটভূমির মধ্যেই ট্যারার বাহ্যিক রূপের পরিবর্তন। চারিত্রিক রূপটি প্রকাশিত হয়েছে। মহান্তের শাস্তির ভয়ে দেবায়তন থেকে তার পালিয়ে যাওয়া। আবার তিন-চার বছর বাদে সন্ন্যাসীবেশে তার এই একই পটভূমিতে ফিরে আসা, মহান্তের সেবা করা, তাঁর কথায় বিয়ে করে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখা আর তার মৃত্যুতে আন্তরিকভাবে কষ্ট পাওয়া – এ সবই এই পটভূমিতেই ঘটেছে। কিন্তু এখানে আলাদাভাবে উল্লেখিত না হলেও ট্যারার গ্রামে প্রত্যাবর্তন এবং সেখানে। পুরোন ভিটেয় নতুন ঘরের বনিয়াদ নির্মাণ অবশ্যই ভিন্ন পটভূমির দাবী রাখে। যেহেতু গল্পটি মহাপীঠের জঙ্গলের প্রান্তে নির্জন প্রান্তরে মহান্তের প্রতি ট্যারার শোকপ্রকাশ, তার অতীত জীবনের রোমন্থন ও প্রকৃতির মধ্যে তার অদৃশ্য হয়ে যাবার মধ্যে দিয়ে শেষ হয়েছে তাই হয়তো লেখকের কাছে উল্লেখ্য পটপরিবর্তনটি গুরুত্ব পায়নি; এক শোকাবহ উদাস পরিবেশে গল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।

'ট্যারা' গল্পে দরিদ্র,অন্ত্যজ বাউরী সন্তান ট্যারা। তার বাবা নয়ান দিনমজুর খাটে, মা গৃহস্থ বাড়িতে ঝি-গিরি করে আর ঠাকুরমা গ্রামের গৃহস্থ - পরিবারের আত্মীয়তার সংবাদ গ্রামান্তরে আদান-প্রদান করে। ট্যারা চরিত্রটি সমাজের চোখে আরও অবজ্ঞা ও অবহেলার পাত্র হয়ে উঠেছে কারণ তার একটা চোখ ট্যারা আর অতি ক্ষুদ্র দেখিয়া মনে হয় কানা।" নিতান্ত দরিদ্র ও অন্ত্যজ বলেই হয়তো এই শারীরিক ত্রুটি-ই তার নাম ও পরিচয় বহন করে চলেছে। সামাজিক দৃষ্টিতে তাকে হীন ও করুণার পাত্র করে ভোলার তাগিদেই লেখক হয়তো তার অন্য কোন নামকরণ করেন নি। লেখকের এই উদ্দেশ্যের আরেক প্রতিফলন হলো ট্যারার জিহ্বার আড়ষ্টতা। অবশ্য এর আরেকটা উদ্দেশ্য হলো সমাজের ধান্দাবাজ, স্বার্থপর উচ্চকোটি শ্রেণির মানুষের প্রতি ট্যারার

ব্যঙ্গোক্তি ও বক্রোক্তি-কে অধিকতর তীব্র ও তীক্ষ্ম করে তোলা। ভোলার অভিশাপের বিরুদ্ধে সে যখন হেসে ব্যঙ্গ করে বলে, "টোর মট সাটটা বামুন জলপান করি আমি।" বা ভোলার চেলা হবার প্রসঙ্গে সে যখন ভেঙিয়ে বলে, "ডা ডা বেটা চোর বামুন, টোর চেয়ে আমি বড় সাটু। টোর চেলা কে হবে ডাঃ।" তখন বোঝা যায় লেখক অভিপ্রায় সার্থক হয়েছে। সমাজের উচ্চকোটি শ্রেণির প্রতি আক্রমন ও ব্যঙ্গ করার এই মানসিক শক্তি ট্যারা কীভাবে অর্জন করেছিল? সে কী শুধুই দেবায়তনের মুক্ত উদার পরিবেশে মহান্তের সাহস ও বীরত্বের গল্প শুনে না কী তার শারীরিক ত্রুটি ও তার প্রতি মানুষের অবজ্ঞা ও করুণার প্রতিস্পর্ধীরূপী বিবেকের তাড়নায়? লেখক সম্ভবত এসব কিছু মিশিয়েই ট্যারাকে একদিকে রূঢ় কঠোর অন্যদিকে সেবাপরায়ণ, কোমল শিশুসুলভ মানসিকতায় গড়ে তুলেছেন। তাই সে তার এই শারীরিক অক্ষমতাকে অতিক্রম করে নোটনের মেয়ে সুন্দরী পরীকে বিয়ে করার আশায় আহ্লাদিত হয়ে উঠেছে; আর নিজের সকতার কারণেই হয়তো আলাদাভাবে পরীকে 'খুব ছোন্দর' বলে অবিহিত করেছে। মনস্তত্ত্বের এই দিকটিও লেখক সচেতনভাবেই এ গল্পে তুলে ধরেছেন।

কেন্দ্রীয় চরিত্র ট্যারার পরেই মহান্ত-র চরিত্রটি এই গল্পে বিশেষত্বের দাবী রাখে। গ্রামের মহাপীঠ দেবায়নের মহান্ত পশ্চিমদেশীয় সন্ন্যাসী। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন সৈনিক, ভন দেশে গেছেন, বীরত্বের সঙ্গে শত্রুর মোকাবিলা করেছেন, তাই এই গ্রামীণ সামাজিক প্রতিবেশের সঙ্গে তাকে ঠিক মেলানো যায় না; না মানসিকতার দিক থেকে না ভাষাগত ক থেকে। তিনি যেন এক ভিন্ন সমাজের প্রতিনিধি। তাঁর পারিপার্শ্বিক আত্মকলহ, সরস্পরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ, নোংরা কুটনীতিকে আরও প্রকট করে তোলার জন্যই লেখক সচেতনভাবেই তাঁকে সৃষ্টি করেছেন। এই সাচ্চা মানুষটি ট্যারার মানষিক উত্তরণের জন্য অনেকখানি দায়ী। তিনিই ট্যারাকে আশ্রয় দিয়েছেন, স্নেহ দিয়েছেন, সুপারমর্শ দিয়েছেন আবার প্রয়োজনে শাসনও করেছেন। অবশ্য শাসন করলেও তিনি তার উপর রাগ করে থাকেন নি, আবার তাকে আপন ক্রোড়ে আশ্রয়ও দিয়েছেন। তাই তো তার প্রতি শ্রদ্ধায়। ভালোবাসায় ভক্তিতে একমাত্র ট্যারাই তার মৃত্যুতে নির্জন প্রান্তরে আকুলভাবে কেঁদে বলে উঠেছে, "গৌছাই-বাবা, গোঁছাই-বাবা

গো—"। এই নিষ্ঠুর, স্বার্থমগ্ন সমাজে প্রতিবাদ প্রতিরোধ ও নিঃস্বার্থ পরতার দিক থেকে ট্যারা তার এই 'গোঁছাই-বাবা'-র শুধু সেবক নয়, যথার্থ শিষ্য হয়ে উঠেছে।

মহাপীঠের মন্দির চত্বরে আরও কয়েকটি চরিত্র লক্ষ করা যায়—'ভক্ত লক্ষ্মীকান্ত, শূলপাণি, চন্দ্রনাথ। এছাড়াও রয়েছে মহান্তের ব্রাহ্মণ সেবক ভোলানাথ ও স্থানীয় ভদ্রলোকের প্রতিনিধি 'জমিদার বংশের সন্তান' ভবানীরঞ্জন রায়। দেবী ফুল্লরা ও বিশ্বেশ্বর ভৈরবের মন্দিরে ভক্তদের নামকরণে ঠাকুর দেবতার ছড়াছড়ি অথচ প্রধান দুই চরিত্র ট্যারা ও মহান্তের নামের উল্লেখ নেই! আসলে লেখক সমাজের স্বার্থপর, কলহলিপ্ত, সুবিধাভোগী মানুষগুলোকে ব্যঙ্গ করে তাদের প্রতি বক্রদৃষ্টি দিয়েছেন। তিনি সচেতনভাবেই পাঠকের কাছে। এই বার্তা পৌছে দিতে চেয়েছেন যে, মানুষের পরিচয় তার নামে নয়, কাজে।

'ভক্ত লক্ষ্মীকান্ত' দেবীর সামনে পর্যন্ত যায় না, ট্যারার জাত নিয়ে কটাক্ষ করে এবং সেই প্রসঙ্গেই মন্দিরের শুচিতা নিয়ে শঙ্কিত হয়, মহান্তকে 'শেয়াল-মারা' বলে বিদ্রুপ করে তাকে মন্দির থেকে তাড়াতে চায়, মাতুল জমিদার-বংশীয় দাবী করে আত্ম-অহংকারে শূলপানির সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হয়, আবার মন্দির প্রাঙ্গণে সে মাদুলি বিক্রি করে ও প্রণামী আদায় করে। শূলপাণি নিজেকে জমিদার বংশের সন্তান দাবি করে লক্ষ্মীকান্তের সঙ্গে কলহে লিপ্ত হয় ও মন্দিরচত্বরে লক্ষ্মীকান্তের অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তোলে। মহান্তের সেবক ব্রাহ্মণ। সন্তান ভোলানাথ বাবার ধুনির ভস্ম অম্বলশূলের ঔষুধ হিসাবে বিক্রি করে, ট্যারার জাত নিয়ে বিদ্রুপ করে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মনত্ব ফলিয়ে তাকে অভিশাপ দেয়, চোর বলে তাকে অপবাদ দেয়, আবার ট্যারার কান্ড কারখানায়, কথায় ও বাচনভঙ্গিতে সে শিহরিত ও শাঙ্কিত হয়ে তা মহান্তের আরেক একনিষ্ঠ সেবক অনুচর 'জটাধারী' চরিত্রটি ট্যারার মতোই দেবায়তনের আশ্রিত। ট্যারাকে শ্রেণি সমাজের প্রতিস্পর্ধী প্রতিনিধি বানাতে গিয়ে এ গল্পে জটার চরিত্রটিকে খর্ব করা হছে এবং সম্ভবত সেইজন্যেই তার অন্য কোন নামকরণও করা হয়নি। জমিদারবংশের সন্তান ভবানীরঞ্জন রায় স্বনামেই বৈকালিক মজলিস জাঁকিয়ে বসেন, জমিতে সুলভ গাম্ভীর্য ও উন্নসিকতাও তার মধ্যে লক্ষ করা যায়।

এই গল্পের এক অদৃশ্য মঞ্চশিল্পীর কথা এখানে না বললেই নয়। সে কী প্রকৃতির অনেক শক্তি নাকি বিধাতা, যার অঙ্গুলি হেলনে পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চের পট ও রূপের পরিবর্তন হয়? মঞ্চের অন্তরালে থেকে তার এই মঞ্চ পরিচালনার মতো লেখক পাঠকের হৃদয়বৃত্তির কাছে গল্পের অন্তরালে এই প্রশ্নই রেখে গেছেন।

ভাষাগত দিক থেকে 'ট্যারা' গল্পটি বৈচিত্র্যের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করেছে। গল্পটিতে লেকের নিজস্ব বক্তব্য ও বর্ণনাত্মক বিষয় সাধুভাষায় লিখিত হয়েছে আর চরিত্রগুলি বিভিন্ন ভাষা ও উপভাষার সংমিশ্রণে কথা বলেছে। কেন্দ্রীয় চরিত্র ট্যারার মুখের ভাষায় রাঢ়ি ও ঝাড়খন্ডি উপভাষার মিশ্রণ লক্ষ করা যায়। সন্ন্যাসী মহান্ত পশ্চিমদেশীয়, তাই তার কথায় বিহার ঝাড়খন্ড অঞ্চলে ব্যবহৃত হিন্দি ভাষা ও ঝাড়খডি উপভাষার মিশ্রণ লক্ষ করা যায়, আবার যেহেতু তিনি সৈনিকরূপে বিভিন্ন দেশ গুরেছেন তাই তাঁর মুখ থেকে ইংরাজীতে মিলেটারী কমান্ডও শোনা গেছে। মহান্তের সেবক ব্রাহ্মণ ভোলানাথের মুখের ব্যবহৃত ভাষা মূলত রাঢ়ি হলেও কখনও সে ঝাড়খন্ডি উপভাষাও ব্যবহার করেছে। মহান্তের অপর সেবক জন্টাধারীর মুখে কিন্তু আশ্চর্য ভাবেই গল্পে বর্ণিত তথাকথিত ভদ্রজনের ব্যবহৃত মুখের ভাষা তথা রাঢ়ি উপভাষা ব্যবহৃত হয়েছে - এর থেকে লেখক কী বোঝাতে চেয়েছেন? তারাশংকরের প্রতিভার প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা সম্মান ও আস্থা রেখেই বলা যেতে পারে ছোট্ট পরিসরে এই চরিত্রটির সার্বিক চিত্রায়ণে হয় লেখক অসতর্ক ছিলেন, নয় তিনি সম্পূর্ণ সচেতনভাবেই চরিত্রটিকে গুরুত্বহীন ছোট্ট পরিসরে আবদ্ধ রাখার জন্যেই তাকে কেবলমাত্র আশ্রিত সেবক রূপেই তুলে ধরেছেন, না তাকে স্বনামে পরিচয় করিয়েছেন, না অন্ত্যজ ও ব্রাত্য শ্রেণির প্রতিনিধি রূপে প্রকাশ করেছেন। গল্পের অন্য দুই চরিত্র লক্ষ্মীকান্ত ও শূলপানি রাঢ়ি উপভাষা ব্যবহার করলেও কলহের সময় উত্তেজিত হয়ে তারা হয়তো বা মহান্তের সংস্পর্শে থাকার জন্যেই তার মুখের ভাষা অর্থাৎ বিহার-ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের ব্যবহৃত হিন্দি ভাষা ব্যবহার করেছে। অন্যদিকে জমিদার বংশের সন্তান ভবানীরঞ্জন রায় স্বাভাবিকভাবেই পরিশীলিত রাঢ়ি উপভাষা ব্যবহার করেছে। তাই লেখক কাহিনি-ঘটনের স্থান সম্পকে।

নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না করলেও চরিত্রের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে অনুমান করা যায় যে। এটি রাঢ় অঞ্চলের পশ্চিন্তম সীমান্তে অবস্থিত।

'ট্যারা'-র অভিধানিক অর্থ 'বক্রদৃষ্টি'। ট্যারা তার শারীরিক ত্রুটি অতিক্রম করে মানুষের অপমান ও উপেক্ষার যোগ্য জবাব দিয়ে এ গল্পে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। মহান্তের সংস্পর্শে সে পেয়েছে সততা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার মনোবৃত্তি, যার দ্বারা সে সমাজের বক্রবৃষ্টির উপযুক্ত জবাব দিয়েছে; পেয়েছে কোমল হৃদয়বৃত্তি যা দিয়েই সে নিঃস্বার্থভাবে মহান্তের সেবা করেছে ও পরিশেষে তার মৃত্যুতে চোখের জল ফেলেছে। 'প্রকৃতির খেয়ালের সৃষ্টি' ট্যারা প্রকৃতির কোলেই মানুষ হয়েছে, গাইয়ের স্তন লেহন করে সে পেয়েছে শারীরিক পুষ্টি আর মানসিক পুষ্টি সে সংগ্রহ করেছে প্রকৃতি থেকেই। তাই গল্পের শেষে সে সেই প্রকৃতির গাঢ় ছায়ালোকে নিবিড়ভাবে মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে যায় আর ছাপ রেখে যায় পাঠকের মনে, সমাজের বুকে।

৭.৩ না : ক্ষমা সুন্দর প্রসন্নতা

তারাশঙ্কর জীবনের মহৎ শিল্পী এবং এই মহৎ শিল্পী জীবনের বিচিত্র দিক অবগত হয়ে মাণিক জীবনের চালচিত্রকে বিচিত্র রূপে উদ্ভাসিত করেছেন। এই অর্থে শিল্পী তারাশঙ্কর কবিও। মোহিতলাল তারাশঙ্করের শিল্পী মানসের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন - বাস্তবতাকে গ্রাহ্য করে তার রসরূপ আবিস্কার করাই মহৎ শিল্পীর কৃতিত্ব এবং সেইদিক থেকে তারাশঙ্কর সম্ভবত শ্রেষ্ঠ শিল্পী। তারাঙ্করের ছোটগল্পে অভিজ্ঞতার সীমা সদর প্রসারিত। সমাজের উচ্চমঞ্চে সংকীর্ণ বাতায়নে বসে তিনি মৃত্তিকালগ্ন মানুষের জীবনের অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভ করেননি। গ্রাম বাংলার পরিচিতি জীবনের নিকটতম বৃত্তে দণ্ডায়মান তারাশংকর মৃত্যুর অমোঘতাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, আবার বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন। মরণপীড়িত এই চিরজীবী 'প্রেম' সমস্ত সংসার আচ্ছন্ন করলেও তারাশঙ্করের মানসপটে কখনও কখনও ভেসে ওঠে মৃত্যুহীন জীবনকে অতিক্রম করার অমৃত পিপাসা। মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে অথবা কাউকে দাঁড়াতে দেখে চিত্তের আনন্দ অনুভবের শক্তি তিনি অর্জন করেছিলেন। সংযম নয়, ভয় সংবরণ নয়, আনন্দ অনুভব শক্তি তারাশঙ্করের ইঙ্গিত লক্ষ্য। এই আনন্দ অনুভব

বিকশিত ট্র্যাজেডির শতদলের আনন্দ। সেখানে জীবনের তুচ্ছতা বা বিবর্ণতা বড় নয়; প্রাণের জয়যাত্রা ক্ষমতার মহিমায় দীপ্যমান; আর এই অর্থে তারাশঙ্কর মানব জীবনের মহং কথাশিল্পী।

সংকলনে গৃহীত 'না' গল্পটি তারাশঙ্করের 'গল্প পঞ্চাশৎ' থেকে গৃহীত। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৪৫ সালের প্রবাসী পত্রিকায় আশ্বিন সংখ্যায়।

'না' গল্পের বিষয়বস্তু কোন নেতিবাচক জীবনদর্শনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠেনি। 'না' এখানে অন্যজীবনের নামান্তর, যে জীবন নৃশংস হত্যাকান্ডে ব্যাথিত, উৎপীড়িত অথবা মৃত্যুর দ্বারা সমাচ্ছন্ন। 'না'-এর মাধ্যমে জীবনের নেতিবাচক দিকটি উন্মোচিত হয়নি; তার পরিবর্তে আর একটি চরিত্র মৃত্যুর তুহিন শীতল স্পর্শ থেকে জীবনের আলোকিত রাজপথে দণ্ডায়মান হয়। গল্পের সামগ্রিক পটভূমিকায় অথবা বিষয়বস্তুতে কোথাও 'না' এর ব্যবহার নেই। গল্পের প্রায় শেষাংশে ব্রজরানী বেশ কয়েকবার 'না' উচ্চারণ করেছে। এবং একেবারে সমাপ্তিতে তার 'না'-এর উচ্চারণে সমস্ত জনতা স্তম্ভিত হয়েছে। ব্রজরানীর এই উচ্চারিত 'না' যেন মৃত্যুর কালিমাকে পর্যদুস্ত করে জীবনের অভিজ্ঞতায় মর্ত পৃথিবীর আসক্তিতে মমতামেদুর হয়ে উঠেছে। আর এইখানেই গল্প তার নামকরণের সার্থকতায় উন্নীত হয়।

"'না' গল্পটি তারাশঙ্করের সংহত শিল্প কুশলতার একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। পূর্বকাহিনী বর্ণনাই এখানে দীর্ঘস্থান অধিকার করেছে। ব্রজরানীর সাক্ষ্যের দিনটিতেই গল্পের সমস্ত বক্তব্য যেন একটি শব্দকে কেন্দ্র করে বিদ্যুৎ রেখার মতো প্রদীপ্ত হয়েছে। 'না'—ব্রজরানীর এই সংক্ষিপ্ত উত্তরমালার উপরেই গোটা গল্পটি অপরূপ ভারসাম্যে স্থাপিত হয়েছে। দীর্ঘ মন্থর গল্পটি ঐ একটি বিন্দুতে এসে যেন সংহত হয়েছে। সেই মুক্তা—নিটোল ভাববিন্দুর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে দুটি যন্ত্রণা জর্জরিত হৃদয়ের সবচেয়ে বড় সত্য ও সবচেয়ে অনুভব। এই অসাধারণ গল্পটিতে ব্রজরানীর কণ্ঠনিঃসৃত 'না'-এর তিনটি স্তর: প্রথম দৃঢ়তার ও সংকল্প কঠোর মনের। দ্বিতীয় স্তর—ক্ষমার। তৃতীয় স্তর—গভীর প্রশান্তির একটি মাত্র কথার অবিচলিত ভারসাম্যেই গল্পটির শিল্পমূর্তি রচিত হয়েছে।"

'না' গল্পের যদি কয়েকটি দৃশ্যপট কল্পিত হয় তাহলে দেখা যায় যে, প্রথম উন্মোচিত পটে অনন্ত এবং কালীনাথের বন্ধুত্বের সেতু বন্ধনে বাঁধা এক অপরূপ সংসার- সেখানে রিপিটার বন্দুক, পকেট বোঝাই কার্তুজ, উদবৃত্ত পাখীর মাংস; সিগারেট মিক্সচার প্রতি পরিচয়ে অনন্ত নিতান্ত অল্প শিক্ষিত মূর্খ; কালীনাথ শিক্ষিত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধিধারী; কিন্তু শিকারের নেশায় আসক্ত এবং সেই প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারে অনন্তের গুরু। অনন্ত লক্ষ্যে অব্যর্থ, অনন্তের আহত জন্তুকে নিহত করতে কালীনাথের দক্ষতা অবিস্মরণীয়। এই দুটি পরস্পর বিরোধী অথচ পরস্পরের অত্যন্ত কাছের মানুষের দ্বিতীয় পট উন্মোচিত হয় উভয়ের বিবাহের উদ্যোগে।

অনন্ত এবং কালীনাথের পারস্পরিক সদিচ্ছায় তারা পরস্পরের পাত্রী নির্বাচনে সম্মত হয়। সম্ভবত এখানেই উভয় চরিত্রের বেদনার অরন্তুদ চাবিকাঠি নিহিত এবং ফলশ্রুতি স্বরূপ কালীনাথের সঙ্গে ব্রজরানীর বিবাহ হয়। অনন্তর জীবনসঙ্গিনী যে হয় সে বোধ হয়। ভাগ্য-নির্দিষ্ট ছিল না; ফলে অকালে অনন্ত এবং তার নবপরিণীতা স্ত্রীর মধ্যে বিদ্যুৎ-বিচ্ছেদ দেখা দিল আর কালীনাথও বোধ হয় ব্রজরানীর জন্য নিয়তি নির্দিষ্ট ছিল না। ফলে শেষ পর্যন্ত অজাতপুত্র এবং বৈধব্যকে সম্বল করে ব্রজরানীর জীবন আবর্তিত হতে শুরু করে।

ফুলশয্যার রাত্রে নববধূর বিস্ময় সচকিত উক্তি, "তোমার পড়ার ঘর বুঝি বাহিরে— এ প্রশ্নের অনন্ত যে প্রত্যুত্তর দিল তাতে শিক্ষিতা নবপরিণীতা বধূ তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের পরিণতি উপলব্ধি করে ক্রন্দনশীলা হয়ে অচরিতার্থতার বেদনায় অভিষিক্ত হলো। অন্যদিকে কালীনাথ জীবনের ঐশ্বর্যে ব্রজরানীকে তার হৃদয়ে রাজ্যের রানী রূপে ফুলশয্যার রাত্রেই বরণ করেছে।

তৃতীয় উন্মোচিত পটে শিক্ষিতা নববধূর রুদ্ধ আক্রোশে পুঞ্জীভূত বেদনায় ফেটে পড়া, স্বামীর পরিচিতি প্রসঙ্গে গুণ্ডা শব্দের ব্যবহার, শ্যালিকা কর্তৃক ইংরাজী সংবাদপত্র পাঠের জন্য অনন্তকে হাস্যকর অনুরোধ, শ্বমাতা কর্তৃক কলকাতায় থেকে অনন্তর পড়াশুনার ব্যবস্থা ইত্যাদির ফলে "মুহূর্তে সমস্ত বিষয়টা অনন্তর চোখের সম্মুখে আলোকিত পৃথিবীর মত পরিস্ফুট হয়ে পড়ে। মাথার মধ্যে ক্রোধ জ্বলিয়া উঠিল

আগুনের শিখার মত।" অনন্তর কাছে পরবর্তী অংশে কালীনাথের সমস্ত চক্রান্ত উন্মোচিত হল। অনন্তর শ্বশুর বাড়াতে পাঠান কালীনাথের নামে বেনামী চিঠিতে। সেই বেনামী চিঠি নিয়ে কালীনাথের বাড়াতে উপস্থিত হয়ে পত্রটি অর্পণ করে অনন্তর সমস্ত বেদনায় দীর্ণ হয়ে আর্তনাদ করে ওঠে-- "অনন্ত লক্ষ্য করিল বাড়ির চারদিকে একটি লক্ষ্মীশ্রী, সুপ্রসন্ন, শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতা যেন উছলিয়া পড়িতেছে।" আর সেই উপলব্ধির পরম মুহূর্তে যখন ব্রজরানী খাওয়ার নিমন্ত্রণ জানালো তখন তা প্রত্যাখ্যান না করে সে মহতম উপলব্ধির দ্বিতীয় সত্যে উপনীত হল-" বৌদি আমার স্বর্গের দেবী তার হাতের জিনিস, এ যে অমৃত।" একদিকে চরমতম লাঞ্ছনা নার পরাভব মুহুর্ত সমাস, কালীনাথের উন্মোচিত চক্রান্তের শিকার অনন্ত; আর অন্যদিকে লক্ষ্মীশ্রী মণ্ডিত সংসার ও দেবীর ন্যায় স্ত্রীর জন্য অনন্তর অনন্ত তৃষা। কিন্তু এক জীবন যেন ট্রাজেডির সায়রে ব্যর্থতার কোরক-ভাগ্যচক্রের অনির্দেশ্য বিধানে ন যে শতদলে পরিণত হবে তা কেউ জানে না। এরপর গল্পাংশ দ্রুতগতিতে সুচীভেদ্য পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়—লক্ষ্যে প্রভাবিত আমার পুরমুহুর্তে অনঙ্গর উন্মত্ততা, বধুর ক্ষোভ ও রোষ, বধুর প্রতি মাতাল অনন্তর নিদারুণ অত্যাচার নির্জলা হলাহল বুকের মধ্যে অগ্নিশিখার মত জ্বালা ধরাইয়া দিল। নার জীবনের এই তিক্ততা আরও প্রবলতম হয় যখন সে শোনে তার নামেও কেউ বেনামী চিঠি পাঠিয়েছিল মাতাল, নেশাখোর চরিত্রহীন, গোয়ার ইত্যাদি বিশেষণে অভিহিত করে। অনন্তর মাথার ভিতরটা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। জীবনে সে প্রশংসা বা শান্তি পায়নি; অথচ এই শান্তির জন্যই সে লালায়িত। সেই শান্তির ও তুপ্তির জন্য আকাঙ্ক্ষিত অনন্তর অতর দ্বিগুণতর জ্বালায় প্রমত্ত আগ্নেয়গিরির অগ্নদগীরনে রূদ্ধ আক্রোশে ফেটে পড়তে চাইল যখন শ্বশুরের হান্টারের আস্ফালিত রজুশিখা বারবার তার দেহখানাকে জর্জরিত করে। দিল। প্রতীক্ষার অগ্নিশিখার মত দণ্ডায়মান অনন্ত নিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে রিভলবার ছারা দাম্ভিক জানোয়ারকে হত্যা করে সে নিজে আত্মহত্যা করবে—"কালীনাথ অনন্তর মস্তিস্কের অগ্নিশিখার উপর যেন মৃত্মহতি পড়িয়া গেল। সহস্র শিখায় লেলিহান হইয়া সে জুলিয়া উঠিল। কালীনাথ! তাহার জীবনের কুগ্রহ—তাহার সুখে পরম সুখী কালীনাথ! কালীনাথ! কালীনাথ—তাহার জীবনের সাথী কালীনাথ! একা সে কোথায় যাইবে।" এই সংলাপের পরই অনন্ত মৃত্যুর

সেই ভয়ংকর উদ্যত রূপের সামনে কালীনাথকে দাঁড় করিয়েছে। কালীনাথ ক্ষমার মধুরতায় নিজেকে আচ্ছাদিত করতে চেয়েছে। কিন্তু ক্ষমার ক্ষমতা, ব্রজরানীর আর্ত চিৎকার প্রভৃতিকে পরাভূত করে মৃত্যু তখন ভীষণ গর্জনে তার হঙ্কার প্রদান করেছে। কালীনাথের রক্তাপ্লুত দেহ নিস্পন্দ নিথর। কার্তুজের ঘর শূন্য, অনন্তর আত্মহত্যা অসমাপ্ত; মৃত্যুর হাত থেকে পলায়নের জন্য অনন্তর বিকৃত যাত্রা—"পেছনে মৃত্যুর ভয়ংকর মূর্তি ঐ যে রক্তাক্ত বিকৃত মূর্তি কালীনাথ ভাঙা হাতে ফাঁসির দড়ি লইয়া তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে।" গল্পের আয়োজন শেষ, পাঠকের জন্য বাকি থাকে পরিণতির রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা। একটি মৃত্যু ট্র্যাজেডির সমগ্রতায় পাঠক মনকে আচ্ছাদিত করে। লোকারন্য আদালতে ব্রজরানী কঠিন দৃঢ় পদক্ষেপে শুভ্রকেশ শীর্ণ নুজদেহ স্তিমিত বিহ্বল দৃষ্টি অনকে দেখতে পায়। কিন্তু তার দৃষ্টি তখন খুঁজছিল সেই দীপ্ত দাম্ভিক বলশালী যুবককে। আর বারবার মনে পড়ছিল অমৃতপূর্ণ সংলাপ—"বৌদি আমার স্বর্গের দেবী।" ব্রজরানী যেন সত্যই স্বর্গের দেবীতে রূপান্তরিত হলো। " 'না' গল্পটির নেতিবাচক নামকরণের আড়ালে মানবজীবনের একটি বৃহৎ ইতিবাচক সংকেত তারাশঙ্করের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। পুজীভূত হীনতায় জীর্ণ ঘৃণাহত হতভাগ্য অনন্তকে তার 'স্বর্গের দেবী' বউদি ব্রজরানী নহের সঞ্জীবন সুধারসে আপ্লুত হয়ে ক্ষমা করতে পেরেছে। গল্পের পরিণতি রীতিমতো নাটকীয় কিন্তু কাহিনির সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন নয়, পরন্তু সামঞ্জস্যপূর্ণ। অনন্তের বিবাহ সংক্রান্ত ঘটনায় কালীনাথের প্রবঞ্চনা এবং পরবর্তীকালে অনন্তের জীবনে তার বিষময় প্রতিক্রিয়া ব্রজরানীর অজানা ছিল না। এছাড়াও, ব্রজরানী জানত তার প্রতি অনন্তের প্রীতিমণ্ডিত মানসিকতার কথা। তাই, আদালতে যাবার আগে প্রতিহিংসাপরায়ণা ব্রজরানীর মনে যে দড় অঙ্গীকার ছিল, আদালতে হাজির হয়ে তার সুভ্রকেশ শীর্ণ নজদেহ স্তিমিত বিহ্বল-দষ্টি অনন্তের দিকে তাকিয়ে তার সেই সুদৃঢ় লালিত অঙ্গীকার অন্তরস্থিত একটা প্রবল আবেগে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। ব্রজরানীর সিদ্ধান্তের চমকপ্রদ পরিবর্তন এই কাহিনী প্রধান বিষয়বস্তুকে শেষ পর্যন্ত ছোটগল্পের একটি বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে।" [তারাশঙ্করের শিল্পিমানস : নিতাই বসু।] পুঞ্জীভূত দীনতা, হীনতায় জীর্ণ, ঘৃণাহত, হতভাগ্য যাকে একটি মাত্র উচ্চারণে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দেবার কথা, ব্রজরানী, সরকারী উকিলের "অনন্ত আপনার

স্বামীকে খুন করেছে কিনা?" প্রশ্নের উত্তরে অন্তরের অন্তস্থল থেকে 'না' ধ্বনির উচ্চারণে সমস্ত আদালত কক্ষ প্রতিধ্বনিত করল। ট্র্যাজেডি সম্পূর্ণ, ব্রজরানীর স্বরাচ্ছন্ন হৃদয়ে প্রগাঢ় প্রশান্তি। এমনকি ব্রজরানীর মা পর্যন্ত কন্যার বুদ্ধিহীনতার সমালোচনায় মুখর। ব্রজরানী তার ভবিষ্যৎকে, ছেলেকে মানুষ করার ব্যাপার প্রভৃতিকে জলাঞ্জলি দিয়েছে। রায় দানের শেষে সমস্ত অতৃপ্তির অনিমেষ শোচনীয়তাকে বিসর্জন দিয়ে নিদ্রার নিশ্চিত আশ্রয়ে পরম আনন্দের জ্যোতি লক্ষ করেছে। ব্রজরানীর চরিত্র গল্পের শেষাংশে যেন রহস্যময়ী। যে নারী সুযোগ পেয়েও তার স্বামী হন্তার কণ্ঠদেশ ফঁসির রজ্জু ঝোলাতে পারে না সেই নারী কি মহিয়সী অথবা স্বামীহন্তারকের প্রতি মমতা সম্পন্না? কোন এক অজানিত মুহূর্তে আপনার হৃদয় দান করেছে। এ প্রশ্ন পাঠকমনে জাগা সংগত ও স্বাভাবিক। কিন্তু সমস্ত প্রশ্ন উত্তীর্ণ হয়ে তারাশঙ্কর শিল্পপ্রতিভা যেখানে পাঠককে দাঁড় করিয়ে দেয় তা হল ট্র্যাজেডি দিগন্ত বিস্তৃত অশ্রুকারুণ্য পূর্ণ সীমাহীন মায়ার, যেখানে অন্ধকার থেকে আলাকে উত্তরণ, জীবসত্তা থেকে মানব সত্তায় উত্তরণের মর্মকথা ধ্বনিত হয় সেখানে শিল্পী তারাশঙ্করের দৃষ্টিতে যে জীবন ধরা পড়ে যে জীবন সত্যের রূপ তা বাস্তবের চেয়েও যেন মর্মস্পর্শী। জগদীশ ভট্টাচার্য মনে করেন : "অগ্রদানীতে নিয়তি নেমে এসেছে শান্তিরূপে, কিন্তু না' গল্পে তার আবির্ভাব পরম ক্ষমায়। * * * একটিমাত্র ধ্বনি। কিন্তু ওর মধ্য দিয়েই মানুষের সকল সজ্ঞান প্রচেষ্টাকে পরাভূত করে নিয়তির বিধান জীবনের উপর নেমে এসেছে।" 'প্রতিহিংসা গ্রহণে নয়, ক্ষমায় মানুষের সত্য উপলব্ধি' –'না' গল্পের মূল দর্শন এটাই।

৭.৪ অনুশীলনী

১। 'ডাকহরকরা' গল্পে ডাকহরকরার অবস্থা বর্ণনা করো।

২। 'ডাকহরকরা' গল্পটির নামকরণের সার্থকতা লেখো।

৩। 'ট্যারা' ছোটগল্পটি কতটা ব্রাত্য মানুষের কথা বলতে সক্ষম হয়েছে আলোচনা করো।

৪। 'না' ছোটগল্পটির নামকরণের সার্থকতা লেখ।

৫। 'না' গল্পে ব্রজরানী চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা।

৬। ছোটগল্প হিসেবে 'না' এর সার্থকতা বর্ণনা করো।

৭.৫ গ্রন্থপঞ্জী

১। তারাশঙ্করের গল্পপঞ্চাশৎ, ভূমিকা।

২। আমার সাহিত্যজীবন -তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩। পরিচয়, পুস্তক পরিচয়, পৌষ ১৩৫৪।

৪। বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ধারা, মার্কসবাদী, ১ম সংকলন, অক্টোবর ১৯৪৮।

৫। আমার কালের কথা; তারাশঙ্কর স্মৃতিকথা, প্রথম খণ্ড।

৬। বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার

৭। বাংলা গল্প-বিচিত্রা

৮। বাংলা উপন্যাসের ধারা, অচ্যুত গোস্বামী

৯। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বাংলা গল্পবিচিত্রা

১০। জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ, প্রথম খণ্ড,

১১। গল্পগুচ্ছ-এপ্রিল-জুন-১৯৯৮ সম্পাদক-অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়। তারাশঙ্করের ছোটগল্পে মানুষ,

১২। শিল্পরূপ তারাশঙ্করের ছোটগল্প-প্রবন্ধ-হীরেন চট্টোপাধ্যায়

১৩। সাহিত্যে ছোটগল্প নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ

১৪। তারাশঙ্কর দেশকাল সাহিত্য ও সম্পাদনা-উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, পুস্তক বিপনি।

১৫। সাহিত্য ও সংস্কৃতি-সঞ্জীব কুমার বসু, তারাশঙ্কর সংখ্যা, বৈশাখ-আশাঢ় -১৩৭৯।